হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

অ্যাডভেঞ্চার ভয়ংকর

অ্যাডভেঞ্চার ভয়ংকর

অ্যাডভেঞ্চার ভয়ংকর

হিমাদ্রিকিশোর দাসগুপ্ত

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

উৎসর্গ

পরম সুহূদ, বন্ধু, সাহিত্যপ্রেমী শ্রী গৌতম বসু

ও

ভালোবাসার ভাই সৌরভ চক্রবর্তীকে

ভূমিকা

দেব সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য আমার লেখা ভয়ংকর সিরিজের চতুর্থ বই এই 'অ্যাডভেঞ্চার ভয়ংকর।' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে 'ভয়ংকর স্বীকারোক্তি', 'এ ১২ ভয়ংকর' ও 'ভয় ভয়ংকর' ভয়ংকর সিরিজের তিনটি বই। যা পাঠক-পাঠিকারা ভালোবেসে গ্রহণ করাতে 'অ্যাডভেঞ্চার ভয়ংকর' এবার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেওয়া। নাম শুনে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে এ বইতে সংকলিত হয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি। হ্যাঁ, তিনটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস স্থান পেয়েছে এই বইতে। 'জম্ভলা দেবতার পুরোহিত', 'ড্রাগনের ডিম' ও 'মৎসকন্যার খোঁজে'। শেষ উপন্যাসটি কিছুটা সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয়া শুকতারার পাতাতে, যা এবার পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হচ্ছে এ বইতে। হিমালয়ের কোলে লুকিয়ে থাকা জম্ভলা দেবতার আশ্চর্য মন্দির থেকে শুরু করে, চিনের নিষিদ্ধ নগরী, সমুদ্রের কোলে বরফাচ্ছাদিত অজানা দ্বীপ, এ বইয়ের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির পটভূমি নানা রহস্যময় স্থানে বিস্তৃত। যা পাঠক-পাঠিকাদের নিয়ে যাবে এই পৃথিবীর ভিতরই লুকিয়ে থাকা অন্য এক পৃথিবীতে রোমাঞ্চের সঙ্গে।

শুধু তিনটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসই নয়, আরও একটি রহস্য উপন্যাস ও তিনটি রহস্য-ভৌতিক কাহিনিও স্থান পেয়েছে এ বইতে। যার মধ্যে দুটি কাহিনি জাদুকর সত্যচরণের অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা, আর অন্য কাহিনি দুটি গল্প হলেও শিহরন জাগানো গল্প। অ্যাডভেঞ্চারের পাশাপাশি অলৌকিক ভয়ংকরের হাতছানিও রয়েছে এই গল্পে। তাই এই বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে 'অ্যাডভেঞ্চার ভয়ংকর'। লেখকের পূর্বতন ভয়ংকর সিরিজের বই তিনটির মতো এ বইটি পাঠক-পাঠিকারা ভালোবেসে গ্রহণ করলে লেখক ও প্রকাশকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

কলকাতা বইমেলা ২০২০

সূচিপত্র

জাদুকর সত্যচরণ ও দাবার ছক

রাতের ট্রেনে ঘুম আসে না চন্দনের। একটা বিলাতি পেপারব্যাক পড়ছিল সে। ভূতের গল্পর বই। থ্রি টায়ার কুপেটা পুরো ফাঁকা। আগামীকাল সকাল থেকে কোনো এক রাজনৈতিক দল চব্বিশ ঘণ্টার বন্ধ ডেকেছে। ট্রেন ভোরবেলা পৌঁছবে কলকাতাতে। ট্রেন থেকে নেমে হরতালের মুখে পড়তে হবে দেখে অনেকেই ট্রেনের টিকিট ক্যানসেল করেছে। চন্দনের অবশ্য সে সমস্যা নেই। শিয়ালদার কাছে অক্রুর দত্ত লেনের একটা মেসে একলা ভাড়া থাকে সে। বন্ধ-হরতাল যাই হোক না কেন ট্রেন থেকে নেমে টুক করে বাড়ি পৌঁছে যাবে সে। তাই এ ট্রেনে চেপে বসেছে চন্দন।

শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ার পর থেকেই থেমে থেমে টিকির টিকির করে চলছিল ট্রেন। মালদাতে যখন ট্রেন এসে পৌঁছল তখন রাত দুটো। বইয়ের থেকে মুখ তুলে কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে জানলার বাইরে তাকাল চন্দন। শীতের রাত আর পরদিন হরতাল বলেই সম্ভবত স্টেশনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। বাইরের দিকে তাকিয়ে চন্দন মনোনিবেশ করল বইয়ের পড়াতে। বেশ অনেকটা সময় পর ট্রেনটা দুলে উঠল। যাক আবার চলতে শুরু করেছে ট্রেন। ঠিক এই সময় কুলির মাথায় বিরাট একটা টিনের বাক্স নিয়ে হুড়মুড় করে কুপের মধ্যে প্রবেশ করলেন এক ভদ্রলোক। কুলির মাথা থেকে টিনের বড়বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে ভদ্রলোকের হাত থেকে টাকা নিয়ে দৌড় লাগাল ট্রেন থেকে নামার জন্য। বাক্সটার ওপর চোখ পড়তে বেশ একটু অবাক হল চন্দন। কালো রঙের বাক্সটার ডালার ওপর সাদা রং দিয়ে একটা খুলি যার আড়াআড়ি ভাবে দুটো হাড় আঁকা আছে! অনেকটা বিপদ চিহ্নর মতো! বাক্সটার মধ্যে বিস্ফোরক বা বিপদজনক কিছু আছে নাকি? মনে মনে ভাবল চন্দন। সে এবার তাকাল তার ঠিক মুখোমুখি বসে থাকা লোকটার দিকে। শ্যামবর্ণ, ঢ্যাঙা-সিড়িঙ্গে চেহারা, তীক্ষ্ণ পাতলা নাকের নীচে যত্নে লালিত সরু গোঁফ। ভদ্রলোকের আঙুল ভর্তি নানা রঙের আংটি। পরনে সাদা ট্রাউজারের ওপর পুরোনো লাল কোট, গলাতে একটা কালো সিল্কের রুমাল বাঁধা। ভদ্রলোকের সাথে চোখাচোখি হতেই তিনি হেসে বললেন, 'কী ভাবছেন, আমার ওই বাক্সতে ডিনামাইট বা বিস্ফোরক আছে নাকি?'

চন্দন মৃদু হেসে বলল, 'কি ভাবে বুঝলেন আমি এ কথা ভাবছি?

ভদ্রলোক তার মাথার পেতে আঁচড়ানো চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'থট রিডিং মশাই, থট রিডিং। এটা আমার পেশার একটা অঙ্গ। পঁচিশ বছর এ লাইনে কেটে গেল মশাই।

চন্দন বলল, 'এ লাইন মানে?'

ভদ্রলোক চন্দনের প্রশ্ন শুনে কোটের পকেট হাতড়ে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে সেটা এগিয়ে দিলেন চন্দনের দিকে। চন্দন কার্ডটা হাতে নিয়ে দেখল তাতে ইংরাজি হরফে লেখা—

'এস পুতিতুন্ডি

দ্য গ্রেট ম্যাজিশিয়ান।

হুডিনি অব ইন্ডিয়া।'

কার্ডের পিছনে ভদ্রলোকের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লেখা। তা দেখে চন্দন বলল, 'ও আপনি ম্যাজিশিয়ান!' ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হ্যাঁ। আসল নাম, সত্যচরণ পুতিতুন্ডি। মালদার এক গ্রামে শো করতে গেছিলাম। শেষ হতে দশটা বাজল। ফেরার পথে গাড়ি পাংচার হল। ভাগ্যিস গাড়িটা লেট ছিল। নইলে মিস করতাম। ওই বাক্সে আমার ম্যাজিকের সাজসরঞ্জাম আছে। তা আপনার পরিচয়টা?'

চন্দন জবাব দিল, 'চন্দন মজুমদার। মেডিকাল রিপ্রেজেনটেটিভ। শিলিগুড়ি এসেছিলাম, কলকাতা ফিরছি।' জবাব দিয়ে চন্দন কার্ডটা ফেরত দিতে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা আপনার কাছেই থাক।'

'থ্যাংক্যু' বলে চন্দন আবার মনোনিবেশ করল বইয়ের পাতাতে। এবার বেশ জোরে ছুটতে শুরু করেছে ট্রেন।

।।২।।

বইটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আধঘণ্টার মধ্যে বইয়ের বাকি পাতাগুলো শেষ করে বইটা পাশে রাখল। এবার বাকি রাতটা এমনিই বসে কাটাতে হবে চন্দনকে। সে ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই তার মনে হল তিনিও কেমন যেন একটু উসখুস করছেন! এরপর জাদুকর সত্যচরণ চন্দনকে বললেন, বুঝলেন মশাই, 'আমার এই এক সমস্যা, রাতে ঘুম আসে না।'

চন্দন হেসে বলল, 'রাতের ট্রেনে আমারও ঘুম আসে না।'

ভদ্রলোক কথাটা শুনে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনি দাবা খেলতে পারেন?'

চন্দন বলল, 'ভালো না খেললেও, খেলাটা জানি।'

সত্যচরণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'খেলবেন? তাহলে বাকি রাতটা কেটে যাবে।'

চন্দন বলল, 'হ্যাঁ, খেলা যেতে পারে। ভোরের আলো ফুটতে এখনও ঘণ্টা তিনেক বাকি।'

কথাটা শুনে জাদুকর সত্যচরণ পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তালা খুললেন। তারপর বাক্স হাতড়ে রোল করা একটা মোটা কাগজের মতো জিনিস আর একটা ছোটো কার্ডের বাক্স বার করে চন্দনের বার্থে এসে বসলেন। গোটানো পার্চমেন্ট কাগজের মতো জিনিসটা খুলে তিনি সেটা পাতলেন তাঁদের দুজনের মাঝখানে। সেটা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা দাবার ছক। স্থানে স্থানে রং চটে ফেটে গেছে। এরপর কাঠের বাক্স থেকে ঘুঁটিগুলো বার করলেন তিনি। আকারে ছোট ঘুঁটিগুলো কেমন যেন ছিরিছাঁদহীন। মেশিনে নয় সম্ভবত হাতে বানানো। সাদা গুটিগুলো পুরোনো হয়ে হলদেটে হয়ে গেছে, আর কালো গুটিগুলোর রং চটে ভিতরের সাদা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। একটা গুটি হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে সেটা একটু অন্যরকম বুঝতে পেরে চন্দন জানতে চাইল, 'এটা কি দিয়ে বানানো?' সত্যচরণ জবাব দিলেন, 'হাড়ের। মানুষের হাড়ের। আর এই যে দাবার ছকটা দেখছেন এটা শিয়ালের চামড়ার তৈরি।' কথাটা শুনে চন্দন বিস্মিত ভাবে বলল, 'এই অদ্ভুত জিনিস আপনি পেলেন কোথায়?'

জাদুকর সত্যচরণ রহস্যপূর্ণ ভাবে হেসে বললেন, 'চলুন সে গল্প আপনাকে খেলতে খেলতে বলি। সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলব। সেবারও আমি প্রথম সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেছিলাম।'

ঘুঁটি সাজানো হয়ে গেল। দাবার ঘুঁটির প্রথম চালটা দিয়ে সত্যচরণ বলতে শুরু করলেন তাঁর কাহিনি—''তখন আমার বছর পঁচিশেক বয়স হবে। আমার গুরু হংসরাজের কাছে বছর তিনেক শিক্ষানবিশ হিসাবে কাটিয়ে তারই নির্দেশে একলা এ পেশায় নেমে পড়েছি। বেড়ে লোক ছিলেন হংসরাজ। তিনি ছিলেন 'স্ট্রিট ম্যাজিশিয়ান' ওই যাকে বলে বাজিকর। জানেন তো রাস্তাতে জাদু দেখানো সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। পিঠে একটা ঝোলা নিয়ে সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছেন তিনি। নেপাল বার্মাতেও গেছিলেন। তাঁর ঝুলিতে যে কত অভিজ্ঞতা ছিল তার ঠিক নেই। আর তেমনই ছিল তাঁর হাতসাফাইয়ের খেল। লোকে বলত, ইচ্ছা করলে তিনি নাকি দু-হাত দিয়ে আস্ত মানুষকে হাপিশ করে দিতে পারতেন। আর অসম্ভব ভালো 'থট রিডিং'-ও জানতেন হংসরাজ। কোনো মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি গড়গড় করে বলে দিতে পারতেন, তার মনের কথা। আমার গুরুর কথা বলে নিলাম এ কারণে, যে গল্প বলতে যাচ্ছি তার সাথে আমার গুরুর একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে।'

চন্দন একটা চাল দিল। সত্যচরণ পাল্টা চাল দেবার জন্য একটা ঘুঁটি তুলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন তাঁর কথা—

''হ্যাঁ, এবার আসল গল্প শুরু করি। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে তো আমি পথে নেমে পড়লাম। সম্বল বলতে একটা ছোটো টিনের বাক্স মাত্র। পূজা, পার্বণ, মেলা উপলক্ষে নানা গ্রামগঞ্জে-হাটেবাজারে খেলা দেখিয়ে বেড়াই। সামান্য যা কিছু রোজগার হয় তা পথেই শেষ হয়ে যায়। মাথা গোঁজার আশ্রয় বলতে হয়তো কখনও কোনো ক্লাব ঘর, মন্দিরের চাতাল, স্কুলবাড়ির বারান্দা এসব। এমন কি করবখানাতেও রাত কাটিয়েছি আমি। তা সেবার গেছিলাম শিকারপুর আষাঢ় অমাবস্যার মেলাতে''

'শিকারপুরটা কোথায়?' —একটা চাল দিয়ে জানতে চাইল চন্দন। টপ করে একটা ঘুঁটি খেয়ে সত্যচরণ বললেন—''নদিয়ার শেষ প্রান্তে বাংলাদেশের কাছে। মেলা যে মাঠে বসে তার পাশেই একটা শ্মশান। আসলে সেই শ্মশানকালীর পূজা উপলক্ষেই মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে গ্রামের মানুষরা আসে সেখানে। আমি তার আগে কোনোদিন ও মেলাতে যাইনি। একজনের থেকে খবর পেয়ে সেবারই প্রথম গেছিলাম সে মেলাতে। আমি যখন বেলা দশটা নাগাদ মেলার মাঠে পৌঁছলাম তার আগেই মাঠের আসল জায়গাগুলো দখল করে নিয়েছে অন্য ব্যবসায়ীরা। তাঁবু, ঘেরা এসব বসিয়ে ফেলেছে। মেলার কর্মকর্তাদের ধরাধরি করতে তারা আমাকে একটা স্থান দিল বটে কিন্তু সেটা মাঠের একেবারে শেষপ্রান্তে শ্মশান লাগোয়া একটা জায়গা। আমার পিছনেই কিছুটা তফাতে চিতার পোড়া কাঠ, মেটে হাঁড়ি, মৃতদেহের কাপড় এসব পড়ে আছে। শ্মশানের শেষ প্রান্তে শনের ছাউনি আর দরমার বেড়া দেওয়া একটা ঘর চোখে পড়ল আমার। স্থানীয় একজনের মুখে শুনলাম ও বাড়িতে নাকি এক 'ভৈরব' অর্থাৎ শ্মশানচারী তান্ত্রিক থাকেন, কালভৈরব তাঁর নাম। লোকে বলে তিনি নাকি মরা মানুষও বাঁচিয়ে দিতে পারেন!

যাই হোক আমাকে যে জায়গা দেখানো হল সেখানে একটা পাকুড় গাছের নীচে একটা শামিয়ানা টাঙিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে বসলাম। খেলার সরঞ্জাম যখন গোছাচ্ছি তখন দেখলাম একদল লোক একটা মড়া ঘাড়ে করে আনছে মাচানে শুইয়ে। শ্মশান যখন তখন মড়া আসতেই পারে। শববাহী লোকগুলো আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের আমি 'কার মড়া' জিজ্ঞেস করতে তারা বলল ওটা নাকি চালকলের মালিক রাধেশ্যাম সাহার ছেলের দেহ। গতকাল দুপুরে চালের গুদামে বস্তার আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটা খরিশ গোখরা। চালের বস্তা সরাতে যেতেই ছোবল মেরেছে। লোকগুলো পোড়াবার জন্য নয়,

কালভৈরবের কাছে ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে যদি তিনি শেষ পর্যন্ত ছেলেটার জীবন ফেরাতে পারেন সে জন্য। কথাটা শুনে আমি মনে মনে হাসলাম। একবার কেউ মারা গেলে কি তার জীবন ফেরে? তবে কুসংস্কারবশত গ্রামগঞ্জে সাপে কাটা মড়াকে এমনই অনেক সময় ওঝা-গুনিন-তান্ত্রিকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাণ ফেরানোর জন্য। যদিও আমি মুখে কিছু বললাম না তাদের।''

।।৩।।

ট্রেনটা বেশ জোরে ছুটছে। সম্ভবত লেট টাইমটা পুষিয়ে নেবার জন্য। খেলাও চলছে। বেশ কয়েকটা চাল দিয়ে সত্যচরণ আবার বলতে শুরু করলেন তাঁর কথা—'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ছেলেটার মড়া কাঁধে লোকগুলো চলে যাবার পর আমি আমার চোঙাটা ফুঁকতে শুরু করলাম। দুপুর হবার সঙ্গে সঙ্গে মেলায় লোক জমতে শুরু করেছে। চোঙার শব্দে একজন-দুজন করে আমার কাছেও লোক জমতে শুরু করল। আর আমিও খেলা দেখাতে শুরু করলাম। রুমালের খেলা, তাসের খেলা, হাতসাফাইয়ের খেলা। একসময় খেলা বেশ জমে উঠল। বেলা গড়াতে লাগল বিকালের দিকে। কিন্তু বিকাল চারটে নাগাদ হঠাৎই ধীরে ধীরে আকাশ কালো হতে শুরু করল। ভরা বিকালেই যেন নামতে শুরু করল রাত্রির অন্ধকার। খেলা ভেঙে গেল। লোকজন মাঠ ছেড়ে সব ছুটল আসন্ন বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য। আমিও আমার জিনিষপত্র গুটিয়ে কোথাও পালাব ভাবছিলাম। কিন্তু তার আগেই বৃষ্টি নেমে গেল। ও সে কী প্রচণ্ড বৃষ্টি আর তার সাথে কান ফাটানো বাজের গর্জন। পৃথিবী যেন রসাতলে যাবে। পাকুড় গাছটার গুঁড়ির নীচে খোদলের মতো এক জায়গাতে কোনোরকমে জিনিসপত্র আগলে ধরে বৃষ্টি থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। এক-ঘণ্টা-দু-ঘণ্টা-তিন-ঘণ্টা! বৃষ্টি থামার বিরাম নেই। অমন বৃষ্টি জীবনে কোনো দিন দেখিনি! সত্যিই অন্ধকার নেমে গেছে তখন। আমি গাছের তলাতে বসেই রইলাম। তখন আনুমানিক রাত আটটা বাজে। বৃষ্টিটা মৃদু ধরে এল। আমি ভেবে নিলাম এই সুযোগে আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। কাছাকাছি গ্রামে কারো বাড়িতে বা মন্দির চাতালে যদি আশ্রয় পাওয়া যায়? আমি ইতিমধ্যে জলের ছাঁটে প্রায় ভিজে গেছি। কর্তব্য স্থির করে আমি উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালো একটা লোক। বিদ্যুতের আলোতে আমি দেখলাম তাকে। রক্তাম্বর পরা, জটাজূটধারী একটা লোক। গলায়-হাতে অনেকগুলো তাবিজ-কবচ আছে। একটা কচুপাতা সে নিজের মাথায় হাতার মতো ধরে রেখেছে। আমার উদ্দেশে সে প্রশ্ন করল 'কোথা থেকে এসেছ তুমি?'

আমি তাকে আমার পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলাম, 'এখানে রাত কাটাবার জন্য কোনো আশ্রয় আছে?

আমার কথা শুনে লোকটা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, 'তুমি দাবা খেলতে জান?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, হ্যাঁ, অল্পস্বল্প জানি। কেন বলুন তো?'

লোকটা জবাব দিল, 'আমার নাম কালভৈরব। ওই যে শ্মশানের শেষ মাথায় আমার বাড়ি। আজ রাতে আমি দাবা খেলার জন্য একটা লোক খুঁজছি। আমার ঘরে গিয়ে দু-জনে দাবা খেলে রাতটা কাটানো যেতে পারে। এত রাতে কোথায় আশ্রয় খুঁজতে যাবে? অপরিচিত লোককে হয়তো কেউ আশ্রয় দেবে না। বর্ষার বৃষ্টি আবারও জোর হতে পারে।' এই তবে সেই শ্মশানচারী কালভৈরব তান্ত্রিক! আমি অবশ্য এদেরকে বিশেষ ভয়টয় পেতাম না। তা ছাড়া সামান্য কিছু খুচরো টাকাপয়সা ছাড়া এমন কিনেই যে সে

হাতিয়ে নিতে পারে। লোকটার কথায় বরং হাতে চাঁদ পেয়ে আমি বললাম, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। চলুন তবে।'

কোথায় যেন একপাল শিয়াল ডেকে উঠল। গাছের তলা ছেড়ে বাক্স কাঁধে শ্মশানের পোড়া কাঠ মাড়িয়ে আমি চললাম কালভৈরবের ডেরার দিকে।'' —এই বলে থেমে গেলেন সত্যচরণ।

জাদুকর সত্যচরণের গল্প শুনতে শুনতে একটু মনোসংযোগ নষ্ট হয়েছিল চন্দনের। একটা ভুল চাল দিয়েছিল সে। আর সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েই সত্যচরণ একটা গজ দিয়ে চন্দনের মন্ত্রীটাকে উড়িয়ে দিলেন। উভয় পক্ষকে কিছু সময় ধরে নিশ্চুপভাবে ঘুঁটি চালার পর আবার তাঁর অসমাপ্ত কাহিনি শুরু করলেন সত্যচরণ পুতিতুণ্ডি—

।।৪।।

''কালভৈরবের পিছন পিছন তাঁর ডেরাতে গিয়ে ঢুকলাম আমি। একটাই ঘর তবে ঘরের একপাশে দরমার বেড়া দিয়ে একটা পার্টিশান করা আছে। ঘরের মধ্যে একটা তেলের কুপি জ্বলছে, মাটির মেঝেতে একটা তালপাতার মাদুর বিছানো। ঘরের মধ্যে যেন কেমন একটা মৃদু পুতিগন্ধ আছে। মাদুরটা দেখিয়ে তান্ত্রিক আমাকে বললেন, 'তুমি ওখানে বসো। আমি দাবাটা আনি—এই বলে তিনি দরমার বেড়ার ওপাশে চলে গেলেন। বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে মাদুরে বসলাম আমি। আর তারপরই আমার চোখ পড়ল ঘরের একপাশে মাটিতে শোয়ানো একটা চাদর ঢাকা দেহের ওপর। কাপড়ের তলা থেকে তার পায়ের পাতা দুটো শুধু বেরিয়ে আছে। আর যেই ফোলা পায়ের পাতা দেখে আমার মনে হল ওটা কোনো মৃতদেহই হবে! আমি সাহসী, কিন্তু ওই মৃতদেহটা দেখে বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁত করে উঠল। ঠিক এই সময় বেড়ার ওপাশ থেকে দাবার ছক আর গুটির বাক্স নিয়ে বেরিয়ে এলেন কালভৈরব। সম্ভবত আমার মনের ভাব পাঠ করেই তিনি বললেন, 'ওটা একটা চোদ্দো বছরের কিশোরের সাপে কাটা দেহ। আমার কাছে দিয়ে গেছে। ওর বাবা বলেছে ওকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি তবে এখানে একটা শ্বেতপাথরের মন্দির বানিয়ে দেবে। বাবাকে নাকি বড় ভালোবাসত ছেলেটা।' বুঝলাম এই সেই দেহটা। সকালে যে দেহ বসে আনতে দেখেছিলাম আমি।

কথাটা জানিয়ে আমার সামনে মাদুরে বসে পড়লেন কালভৈরব। দাবার ছক আর গুটিগুলো দেখে আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম, 'ঘুঁটি আর ছকগুলো খুব অদ্ভুত তো!'

কালভৈরব মৃদু হেসে বললেন, 'এ হল আমার দাবার ছক। ছকটা দিয়ে ডামরীদের সাথে দাবা খেলি আমি। অর্থাৎ অপদেবীদের সাথে। তবে এখন তোমার সাথে খেলব। ছকটা কালো শিয়ালের চামড়ার। খুঁটিগুলো মানুষের হাড়ের। আমিই বানিয়েছি।'

অপদেবীদের সাথে তান্ত্রিক এ ছকে খেলেন কিনা সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ থাকলেও তবে শেয়ালের চামড়ার ছক, মানুষের হাড়ের ঘুঁটি, কিছুটা তফাতে কাপড় ঢাকা ছেলেটার লাশ সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা অস্বস্তি তৈরি হল আমার মনে। তবে তখন তো আর উঠে আসা যায় না। আর এই দাবার ছকের আর ঘুঁটিগুলোর কথা শুনে আমার যেন মনে হল আমার গুরুদেব হংসরাজ যেন আমাকে কী একটা গল্প করেছিলেন এমন একটা দাবার ছকের ব্যাপারে তবে ততক্ষণাৎ গল্পটা মাথায় এল না আমার। বাইরে আবার প্রবল মেঘ গর্জনের সাথে সাথে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হল। খেলা শুরু করলাম আমরা। ধীর গতিতে চাল দিতে শুরু করলাম দুজনেই।

কিছুক্ষণ পরই আমি বুঝতে পারলাম কালভৈরব পাকা দাবাড়ু। একটার পর একটা ঘুঁটি খাচ্ছেন তিনি। আর তারপরই কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছেন মড়াটার দিকে।

চাল দিতে দিতে আমার মনের ভিতর কেন জানি খালি এ প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতে লাগল, হংসরাজ যেন কী বলেছিলেন কী বলেছিলেন আমাকে? খেলা এগিয়ে চলল, বাইরে বেড়ে চলল রাত।

খেলা তখন প্রায় শেষের পথে, আমার অর্ধেক ঘুঁটি খেয়ে কালভৈরব চারপাশ থেকে চেপে ধরেছেন আমাকে। বাইরের শ্মশান থেকে একপাল শেয়াল হঠাৎ করুণ স্বরে ডেকে উঠল। আর তার সাথে সাথেই আমার মনে পড়ে গেল এই দাবার ছকের সম্বন্ধে গুরুদেবের কাছে শোনা কথা। মনের ভিতর চমকে উঠলাম আমি। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল আমার। বুঝতে পারলাম এ খেলাতে যে ভাবেই হোক আমাকে জিততেই হবে। নইলে সমূহ বিপদ! রাজাকে মারার আগে আমার একটা ঘোড়া মেরে যেই না মড়াটার দিকে তাকিয়েছেন, অমনি আমি হাতসাফাই করে দুটো মোক্ষম গুটি সরিয়ে দিলাম। কাজটা আমাকে তখন করতেই হত। এ ছাড়া কোনো পথ ছিলো না। কালভৈরব তন্ত্রসিদ্ধ হতে পারেন, ডামরীদের নিয়ে দাবা খেলতে পারেন ঠিকই, কিন্তু হাতসাফাইয়ে হংসরাজের শিষ্য আমি। হাতসাফাই আমার পেশা। কাজেই কালভৈরব ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না। আর এর পরের দানেই দুটো ঘুঁটি সদ্দিয়ে ফেলার সদব্যবহার করে আমি কিস্তিমাত করে দিলাম কালভৈরবকে।

কালভৈরব প্রথমে তাকালেন আমার দিকে। তাঁর দৃষ্টি বলে দিচ্ছে তিনি যে হেরে গেছেন তা যেন ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছেন না। বিস্ফোরিত তার চোখ। আর এরপরই তিনি নিজের বুকের বাঁ দিকটা খামচে ধরলেন। থরথর করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠল তাঁর শরীর। তার জিভটা যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একপাশে গড়িয়ে পড়লেন তিনি! আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে ওপর ঝুঁকে তাঁর বুকে হাত দিয়ে বলতে লাগলাম 'কালভৈরব আপনার কী হল? চোখ খুলুন। আর এরপরই তাঁর নাড়ি টিপে আমি বুঝতে পারলাম কালভৈরব তান্ত্রিক আর কোনো দিনই জাগবেন না। মারা গেছেন তিনি।

কালভৈরবের হাতটা আমি মাটিতে নামিয়ে রাখছি। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা খড়খড় শব্দ শুনে একপাশে তাকালাম আমি। যা দেখলাম তাতে আমার শরীর রক্তহীন হয়ে গেল। যেন পাথর হয়ে গেলাম আমি। দেখলাম কাপড় সরিয়ে উঠে বসেছে সেই ছেলেটা। বাসি মড়ার মতো তার ফোলাফোলা মুখ। সাপে কাটলে মুখ দিয়ে যে গেঁজা বেরোয় তা শুকিয়ে সাদা হয়ে লেপ্টে আছে ঠোঁটের কোণের দু-পাশে। চোখের মণির দৃষ্টি ফেরেনি তখনও। স্থির ঘোলাটে চোখ তার! দুলতে দুলতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে উঠে দাঁড়াল সেই বীভৎস মূর্তি। যেন অনেক দূরের ঘুমের দেশ থেকে সে ফিরে এসেছে! টলতে টলতে আমাদের পাশ কাটিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সেই মূর্তি। বাইরের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বাবা তুমি কোথায়? আমি তোমার কাছে যাব।'

তার সেই আর্তনাদ যেন কাঁপন ধরিয়ে দিল আমার শরীরে। এ তো কোনো কিশোরের কণ্ঠস্বর নয়! এ তো তান্ত্রিক কালভৈরবের ভরাট গলা! যে আমার সামনে মাটিতে পড়ে আছে! 'বাবা তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?' বলতে বলতে এরপর প্রবল বর্ষণের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। বিদ্যুৎ চমকে মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল তার চলমান দেহটা। তারপর সে হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। কালভৈরবের আত্মা নিয়ে

প্রাণ ফিরে পেল ছেলেটার দেহ। আমার ধাতস্থ হতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। আর আমিও এরপর সেই ঘরের মধ্যে কালভৈরবের মৃতদেহ ফেলে রেখে আমার বাক্স নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই সোজা ছুটলাম স্টেশনের দিকে। হ্যাঁ, ঘর থেকে বেরোবার আগে আমি বাক্সের মধ্যে ভরে নিয়েছিলাম এই দাবার ছক আর গুটিগুলো। এগুলো তো আর কোনো কাজে আসত না—গল্প শেষ করলেন সত্যচরণ।

চন্দন এতক্ষণ ধরে দাবা খেলতে খেলতে তাঁর এই অদ্ভুত, বিস্ময়কর গল্প শোনার পর বিস্মিতভাবে জানতে চাইল, 'কিন্তু আপনাদের দুজনের দাবা খেলার সাথে কালভৈরবের মৃত্যু বা ছেলেটার বেঁচে ওঠার সম্পর্ক কি?' জাদুকর সত্যচরণ বললেন, 'আছে, আছে। আমার গুরু হংসরাজের মুখ থেকেই আমি প্রথম শুনেছিলাম এই ছকের গল্প। তাঁর বলা এ ছকের গল্প কালভৈরবের সাথে খেলার সময় মনে পড়ে যাওয়াতেই দাবার ঘুঁটি হাতসাফাই করে সে যাত্রায় বেঁচে গেছিলাম আমি। নইলে হয়তো শিকারপুরে কোনো চালের আড়তে অন্যের শরীরে জীবন কাটাতে হত আমাকে। হংসরাজ আমাকে এই ছকের ব্যাপারে যা বলেছিলেন তা হল বিশেষভাবে প্রস্তুত এই দাবার অথবা পাশার ছককে বলে 'প্রেত ডামরী' ছক। তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে প্রস্তুত এই ছক নিয়ে মৃতদেহের পাশে খেলতে বসতে হয়। খেলাতে যে পরাজিত হয় তার আত্মা প্রবেশ করে মৃতদেহের শরীরে। জীবন ফিরে পায় দেহ। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমাকে নিয়ে কেন দাবা খেলতে বসেছিলেন কালভৈরব।' —কথাগুলো বলে দাবার শেষ চালে চন্দনকে কিস্তিমাত করে সত্যচরণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল গল্পটা?'

চন্দন বলল, 'বেশ ভালো। তবে এমনও তো হতে পারে যে কালভৈরব হার্ট অ্যাটাক করে হঠাৎ মারা গেছিল আর ছেলেটা হয়তো আসলে জীবিতই ছিল? পরে খোঁজ নিয়েছিলেন ছেলেটার?'

ছক আর দাবার গুটি গুছিয়ে বাক্সে ভরে জাদুকর সত্যচরণ পুতিতুন্ডি বললেন, 'পাগল নাকি? জীবনে আর শিকারপুরমুখো হইনি। যদি সে আমাকে চিনে ফেলে? পরে ঘুঁটি সরানোর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে থাকে? —এ ভয়ে সেদিকে যাইনি। —এই বলে চুপ করে গেলেন তিনি।

চন্দন আর কোনো তর্ক করল না তার সাথে। চুপ করে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। শেষ রাতের দিকে বর্ধমানের কাছে গাড়ি পৌঁছতেই সত্যচরণ উঠে দাঁড়িয়ে বাক্সটা তুলে নিয়ে হেসে বললেন, আমি বর্ধমানে নামব। আগামীকাল একটা শো আছে। কলকাতাতেই তো আমাদের দুজনের বাড়ি। কার্ডে ঠিকানা লেখা আছে। চলে আসুন একদিন আমার বাড়ি। আমার এ বাক্সে আরও এমন অনেক অদ্ভুত গল্প আছে।' চন্দন হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আসব।' তার জাদুকরী গল্পের বাক্স নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন সত্যচরণ পুতিতুন্ডি।

শিকারি শিকার

'নিয়ে যান দাদা, নিয়ে যান। কোত্থেকে যে হঠাৎ এই কুকুরটা এখানে হাজির হল কে জানে! মনে হয় কেউ ছেড়ে দিয়ে গেছে। কারো বাড়ির পোষা কুকুর ছিল। নইলে গলায় বকলস থাকবে কেন? পুষতে না পেরে হয়তো ধাবার সামনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, এখানে প্রাণীটা খাবার পাবে বলে। কিন্তু আমার হয়েছে জ্বালা। ও যেমন আপনার পায়ে পায়ে ঘুরছে তেমনই অন্য কাস্টমারদেরও পায়ে পায়ে ঘোরে। সবাই তো আর সমান হয় না। অনেকে কুকুর দেখলে ভয় পায়। এই তো সেদিন একদল লোক গাড়ি থেকে নেমেছিল এখানে খাবার খাবে বলে। কিন্তু কুকুরটা দেখে একজন মহিলা ভয় পেয়ে এমন চিৎকার করল যে সবাই আবার গাড়িতে উঠে চলে গেল। কত ক্ষতি হল আমার। আপনি নিয়ে গেলে আপদ যায়।'—একটানা কথাগুলো বলে শৌনকের পায়ের সামনে দাঁড়ানো কুকুরটার দিকে তাকাল মাঝবয়সি ধাবা-মালিক।

মাঝারি আকৃতির একটা পাহাড়ি কুকুর। দো-আঁশলা ধরনের। গায়ের লোমটা একটু বড়ো। পুরুষ। ঘাড় তুলে তাকিয়ে আছে শৌনকের দিকে। আসলে বাস থেকে নেমে ধাবায় ঢুকে কুকুরটাকে দেখেই শৌনকের মনে পড়ে গেছিল তার সদ্যপ্রয়াত আদরের কুকুর জিকোর কথা। যদিও জিকো পথকুকুর ছিল না, কলকাতার নিউমার্কেট থেকে কেনা জিকো বংশ-মর্যাদাতে বেশ কুলীন ছিল, তবুও এই সাদা-কালো ছোপ ছোপ কুকুরের বাচ্চাটাকে দেখেই প্রায় চমকে উঠেছিল শৌনক। কুকুরটা যেন প্রায় জিকোর মতোই দেখতে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কুকুরটার প্রেমে পড়ে গেছে শৌনক। অবশেষে সে প্রস্তাব দিয়ে ফেলল ধাবা- মালিককে—'কুকুরটা আমাকে দেবেন? আমি এটাকে কলকাতা নিয়ে যাব।'

আর তার কথা শুনেই ওই জবাব ধাবা-মালিকের।

শৌনক খুশি হয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার কাছে কোনো চেন হবে? এখানে কোনো দোকান থাকলে কিনে নিতাম। ওকে নিয়ে যেতে হবে তো। চেন থাকলে সুবিধা হবে। যা পয়সা লাগবে আমি দেব।'

লোকটা বলল, 'চেন তো আমার কাছে নেই। হাতখানেক লম্বা একটা নাইলনের দড়ি দিচ্ছি। সেটা গলায় বেঁধে আপাতত কাজ চালান।'

সেইমতোই ব্যবস্থা হল। লোকটা দড়ি আনল। শৌনক সেটা বেঁধে দিল মাঝারি আকৃতির কুকুরটার গলায়। দোকানের পাওনা আগেই মেটানো হয়ে গেছিল। এবার সে ধাবা-মালিককে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তো ফরেস্ট দেখার জন্য যাব। কীভাবে যাব? থাকার জায়গা পাব ওখানে?'

ধাবা-মালিক বলল, 'ফরেস্টের গেট এখান থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূর। যেভাবেই যান, পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ওখানে কিছু ছোট হোটেল আছে। রাতে থেকে সকালে পারমিট নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হবে। ওদিকে যাবার জন্য লোকাল বাস আছে ঠিকই, কিন্তু কুকুর নিয়ে বাসে উঠতে দেবে না বলেই মনে হয়। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান। যদি শেয়ারের কোনো ছোট গাড়ি পান বা ফাঁকা গাড়ি পান, তা ধরে চলে যাবেন।'

শৌনক কুকুরটার দিকে তাকিয়ে পিঠে কিটব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, 'চল জিকো। এবার আমরা রওনা হই।'

হ্যাঁ, এ নামেই সে ডাকবে কুকুরটাকে। জিকো কোনো আপত্তি করল না। বরং লেজ নেড়ে উঠে দাঁড়াল শৌনকের সঙ্গে বাইরে যাবার জন্য। শৌনকের মনে হল জিকো যেন আবার ফিরে এসেছে তার কাছে।

জিকোর গলায় নাইলনের দড়িটা ধরে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল শৌনক। কালো পিচরাস্তা একদিক থেকে এসে এঁকেবেঁকে চলে গেছে অন্যদিকে। পথের দু-পাশে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়শ্রেণি। জঙ্গল ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। বিকেল চারটে বাজে। শিলিগুড়ি থেকে বাসে চেপে এসে বেলা আড়াইটে নাগাদ খুব খিদে পেয়েছিল বলে নেমে পড়েছিল এখানে। সূর্যদেব এখন দিনশেষের রোদ ছড়াচ্ছেন পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলের ওপর। অনেক অনেক দূরে পাহাড়গুলোর মাথার ওপর দিয়ে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এ অঞ্চলটা ভারত-নেপাল সীমান্তের তরাই অঞ্চল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধাবমান গাড়িগুলো থামাবার জন্য হাত নাড়তে লাগল শৌনক। কিন্তু গাড়িগুলো থামছে না। হয় তাদের অপরিচিত পথচারীকে গাড়িতে তোলার ইচ্ছা নেই, অথবা শৌনকের সঙ্গে কুকুরটাকে দেখেই তারা থামছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা বেশ বড় প্রাইভেট গাড়ি শৌনক হাত দেখাবার পর তাকে অতিক্রম করে বেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়েও থেমে গেল। তারপর ধীরে ধীরে পিছনের দিকে আসতে শুরু করল। গাড়িটা কি তাকে নিতে চায়? জিকোর গলার দড়িটা ধরে গাড়িটার দিকে ছুটল শৌনক। কালো কাচ তোলা সাদা রঙের একটা এস. ইউ. ভি। শৌনক গাড়িটার কাছে পৌঁছতেই চালকের আসনের কাচটা একটু নেমে গেল। ভিতর থেকে উঁকি দিল একটা মুখ। তাকে দেখে শৌনকের মনে হল লোকটা নেপালি বা স্থানীয় কোনো পাহাড়ি মানুষ হবে। লোকটা তাকে প্রথমে প্রশ্ন করল, 'কিধার যানা হ্যায়? ইয়ে কুত্তা আপকা হ্যায়?' শৌনক বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে জবাব দিল, 'আমি ট্যুরিস্ট। কলকাতা থেকে আসছি। ফরেস্ট দেখতে যাব। হ্যাঁ, কুকুরটা আমারই। আপনি কি ফরেস্ট গেটে যাচ্ছেন? আমাকে পৌঁছে দেবেন? যা ভাড়া লাগবে দেব।'

গাড়ির মাঝখানের আসনে কালো কাচের আড়ালে কেউ একজন আছে। কারণ ড্রাইভার তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা স্বরে কী যেন কথাবার্তা বলল প্রথমে। তারপর শৌনককে বলল, 'গাড়িতে উঠে পড়ুন।'

গাড়ির মাঝের দরজাটা খুলে গেল। কুকুরটাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে শৌনক গাড়িতে উঠে পড়ল।

।।২।।

গাড়িতে উঠেই শৌনক দেখতে পেল যে ভিতরে বসে আছে তাকে। লোকটার পরনে দামি জ্যাকেট, গালে চাপদাড়ি, চোখে কালো চশমা, মাথায় একটা ক্যাপ। লোকটাকে প্রথম দর্শনেই কেমন যেন চেনা মনে হল শৌনকের। লোকটা তাকিয়ে আছে কুকুরটার দিকে। কুকুরটাকে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করতেই চলতে শুরু করল গাড়ি। লোকটাই প্রথমে ভরাট গলাতে প্রশ্ন করল, 'কুকুরটার গলাতে চেনের বদলে দড়ি কেন? রাস্তা থেকে ধরলেন নাকি? কুকুরটা তো এখানকারই মনে হচ্ছে!'

শৌনক হেসে জবাব দিল, 'না, ঠিক রাস্তা থেকে নয়। আমি কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছি। ধাবায় খেতে নেমেছিলাম। সেখান থেকেই সংগ্রহ করলাম। চেন তো পেলাম না। তাই তার বিকল্প হিসাবে দড়ির ব্যবস্থা করেছি আপাতত।'

লোকটা বলল, 'ভারী সুন্দর দেখতে কুকুরটা।'

শৌনক আবারও হেসে বলল, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। সেজন্যই তো নিলাম। কলকাতাতে ওকে নিয়ে ফিরতে একটু কষ্ট হবে ঠিকই। তবুও নিলাম। খুব বেশি বয়স হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না।'

লোকটাও এবার হেসে বলল, 'তবে আপনার কষ্টটা লাঘব হবে যদি কুকুরটা আমাকে দিয়ে দেন।'

শুধু লোকটার চেহারা নয়, তার কণ্ঠস্বরও যেন খুব বেশি চেনা মনে হল শৌনকের। তার প্রশ্নর উত্তর না দিয়ে শৌনক একটু ইতস্তত করে তাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনাকে কোথাও দেখেছি? কেন জানি না আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!'

শৌনকের কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর চশমা আর টুপি খুলে একটানে খুলে ফেলল তার নকল চাপদাড়ি। শৌনক এবার তাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এ ভদ্রলোকের সঙ্গে এর আগে সামনাসামনি পরিচয় না হলেও শৌনক তাকে সিনেমা আর টেলিভিশনের পর্দাতে বহুবার দেখেছে! বাংলা সিনেমার অ্যাকশন হিরো রাজা দেববর্মা। লোকে যাকে সংক্ষেপে রাজা বর্মা বলে। শৌনক যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না তার পাশেই বসে আছেন বিখ্যাত অভিনেতা রাজা বর্মা! যাকে লোকে টিকিট কেটে দেখতে যায়! শৌনকের চোখে-মুখে প্রচণ্ড বিস্ময়ের ভাব দেখে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই। এখানে এই উত্তরবঙ্গে একটা শুযটিং-এর কাজে এসেছিলাম। কাজ মেটার পর জঙ্গলে যাচ্ছি। আমরা যেখানেই যাই সেখানেই লোকজন আমাদের ঘিরে ধরে। তাই ছদ্মবেশ নিতে হয়েছিল। এখন অবশ্য সে প্রয়োজন নেই। ফাঁকা রাস্তা।'

প্রাথমিক বিস্ময়বোধ কাটিয়ে উঠে শৌনক বলল, 'আসলে আমি ভাবতেই পারছি না আমি আপনার পাশে বসে আছি! আপনাকে পর্দায় কত দেখেছি!'

রাজা বর্মা হাসলেন। তারপর বললেন, 'দেবেন আমাকে কুকুরটা? এমন একটা কুকুর পোষার শখ আমার।'

শৌনক তাকাল কুকুরটার দিকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার বড় মায়া পড়ে গেছে কুকুরটার ওপর। শৌনক হয়তো বলত, 'আচ্ছা নিন।' কিন্তু কুকুরটার দিকে তাকিয়ে শৌনকের মনে পড়ে গেল তার মৃত পোষ্য জিকোর কথা। কুকুরটা যেন অবিকল জিকোর মতো দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে শৌনকের দিকে। সে যেন তাকে বলছে—'আমাকে কাউকে দিয়ো না তুমি। আমি তো জিকোই। তোমার কাছে আবার ফিরে এলাম।'

'নিন' আর বলতে পারল না শৌনক। কিছুটা বিব্রত ভাবে বাধ্য হয়ে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলল, 'আমাকে মার্জনা করবেন। আসলে ওই ধাবা-মালিক আমার পরিচিত। তাঁর নিকটাত্মীয় আমার বাড়ির পাশেই থাকেন। ধাবা-মালিককে আমি কথা দিয়েছি কুকুরটা আমি কাউকে দেব না। তিনি যে আমাকে কুকুরটা দিচ্ছেন সেটা ওই আত্মীয়কেও ফোনে জানিয়েছেন। বিশ্বাসভঙ্গ হলে ব্যাপারটা খারাপ হবে। আমার প্রতিবেশী, ধাবা-মালিকের আত্মীয়ও অসন্তুষ্ট হবেন।'

শৌনকের কথা শুনে চুপ করে গেলেন রাজা বর্মা। আর নতুন জিকো যেন শৌনকের কথা শুনে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েই মুখ ঘষতে লাগল তার পায়ে। সামনের রাস্তা চিরে এগিয়ে চলতে লাগল গাড়ি।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার মুখ খুললেন রাজা বর্মা। তিনি বললেন, 'আপনার কি হোটেল বুক করা আছে?'

শৌনক বলল, 'না, নেই। আসলে আমি একা মানুষ, সংসার বা বন্ধুবান্ধব তেমন কেউ নেই। একটা ছোট ব্যবসা করি। আর ইচ্ছা হলেই বেরিয়ে পড়ি নানা জায়গায় ঘুরতে।'

কথাটা শুনে রাজা বর্মা বললেন, 'এটা ট্যুরিস্ট সিজন। ফরেস্ট গেটে সামান্য ক'টা হোটেল আছে। আগাম বুকিং না থাকলে ঘর পাবেন না। এই ঠান্ডার দেশে রাস্তায় কাটাবেন কীভাবে? কি তেজপ্রতাপ, তাই তো?'

ড্রাইভার বলল, 'সহি বাত সাব। ঘর নেহি মিলেগা।'

কথাটা শুনে শৌনক চিন্তিত ভাবে বলল, 'তবে কী করা যায় বলুন তো?'

অভিনেতা রাজা বর্মা একটু যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আপনি আপনার সারমেয় সমেত আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি জানেন কি না জানি না, এই তরাই অঞ্চলে একসময় আমাদের পূর্বপুরুষের একটা জমিদারি ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকার সম্পত্তি কেড়ে নিলেও জঙ্গলের মধ্যে এখনও একটা পুরোনো বাংলো আছে আমাদের। আমি নিজে সেলিব্রিটি, তা ছাড়া জমিদারের বংশধর হিসেবে সে বাংলোতে থাকার জন্য আমার কোনো অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আমি দু-রাত নিরুপদ্রবে সেখানে থাকার জন্যই যাচ্ছি। জঙ্গল ঘেরা নির্জন বাংলো। ওয়াইল্ড লাইফেরও দেখা মেলে। তবে আগেই বলে রাখছি সেখানে ইলেকট্রিসিটি বা আরামের ব্যবস্থা নেই।'

কথাটা শুনে উৎফুল্ল ভাবে শৌনক বলল, 'এ তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। আপনার সঙ্গে দুটো রাত কাটাব, এর থেকে বড় ব্যাপার কী হতে পারে? আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

রাজা বর্মা বললেন, 'ঠিক আছে, তবে চলুন আমার সঙ্গে।'

এরপর রাজা বর্মার সঙ্গে টুকটাক নানা কথা বলতে লাগল শৌনক। অধিকাংশ কথাই নানা সিনেমাতে রাজা বর্মার অভিনয়ের প্রশংসা করে।

পিচরাস্তা ছেড়ে একসময় কাঁচা পথ ধরল গাড়ি। দিনান্তের ঘরে ফেরা পাখির কলকাকলিতে দু-পাশের গভীর জঙ্গল মুখরিত। বেশ অনেকটা পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলার পর একটা ভাঙাচোরা একতলা কাঠের বনবাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। অনুচ্চ কাঠের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে দরজার কপাটহীন বাংলোটা। গাড়ি থেকে নেমে রাজা বর্মা বললেন, 'প্রায় দেড়শো বছর আগে আমার প্রপিতামহ এই বাংলোটা বানিয়েছিলেন। তিনি আর ব্রিটিশ রাজপুরুষরা তখন শিকার খেলতে আসতেন এখানে। এ তল্লাটে সেসময় প্রচুর বাঘ ছিল।' তাঁর কথা শেষ হতেই কুকুরটা চারপাশে একবার দেখে নিয়ে শৌনকের দিকে তাকিয়ে 'ভুক ভুক' শব্দে ডেকে উঠে যেন বলল, 'বেশ জায়গাতে আনলে তো তুমি!' শৌনক তার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিল। গাড়ি থেকে মালপত্র নামানো শুরু হল। তার মধ্যে একটা রাইফেলও দেখতে পেল শৌনক। রাজা বর্মা হেসে বললেন, 'এটা লাইসেন্সড আর্মস। তেজপ্রতাপ ক'দিন আগে এখানে এসেছিল

বাংলোটাকে সাফসুতরো করার জন্য। বাঘের ডাক শুনেছিল ও। তাই নিরাপত্তার কারণেই বন্দুকটা এনেছি।'

শৌনকের পিঠের কিটব্যাগ ছাড়া মালপত্র বলতে আর কিছু নেই। রাজা বর্মার মালপত্র নামার পর বাংলোটাতে উঠে এল শৌনকরা। সার বাঁধা চারটে ঘর আছে বাংলোতে। কিন্তু মাঝের ঘর দুটোর ছাদ ফুটো বলে দু-প্রান্তের ঘরে, একটাতে রাজা বর্মা আর তাঁর সঙ্গীর, আর অন্যটাতে শৌনকের থাকার ব্যবস্থা হল। তেজপ্রতাপ একটা পলিথিন শিট আর কয়েকটা মোমবাতি দিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল বাইরে। মোমবাতি জ্বালাবার পর জিকোর গলার দড়ি খুলে দিল শৌনক। ছাড়া পেয়ে সে ভুক ভুক শব্দ করে সারা ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল। সঙ্গে আনা শুকনো খাবার দিয়ে শৌনক এরপর খাওয়া সারল। জিকোকেও খেতে দিল। খাওয়ার পর দরজার সামনে গিয়ে শুয়ে পড়ল জিকো। শৌনকের দিকে তাকিয়ে চাপা ডাক ছেড়ে সে যেন বলল, 'শুয়ে পড়ো। কোনো চিন্তা নেই, আমি তো পাহারাতে রইলাম।' তার দিকে তাকিয়ে হেসে সত্যি শুয়ে পড়ল শৌনক। বাইরে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোতে বাংলোর চারপাশের বড় বড় গাছগুলো যেন কেমন একটা ভূতুড়ে অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে। অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁপোকার ডাক ভেসে আসছে সেখান থেকে। সে শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল শৌনক।

।।৩।।

পরদিন জিকোর ডাকেই ঘুম ভাঙল শৌনকের। ধড়মড় করে উঠে বসে ঘড়ি দেখেই শৌনক বুঝতে পারল তার ঘুম ভাঙতে অনেক দেরি হয়ে গেছে! বেলা প্রায় আটটা বাজে! আসলে কলকাতা থেকে আসার সময় রেলের জেনারেল বগিতে রাত জেগে আসতে হয়েছিল শৌনককে। তাই এদিন উঠতে দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু রাজা বর্মা কী ভাবছেন কে জানে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল শৌনক। সকালের আলোতে চারপাশ উদ্ভাসিত। পাখির ডাক ভেসে আসছে জঙ্গল থেকে। বারান্দাতে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তেজপ্রতাপের সঙ্গে কী যেন কথা বলছিলেন রাজা বর্মা। ছ-ফুট লম্বা, নির্মেদ ফর্সা দেহে সকালের আলোতে যেন জৌলুশ ঠিকরে পড়ছে। সত্যিই, পর্দার বাইরেও নায়কোচিত চেহারা রাজা বর্মার। শৌনক আর জিকো তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাঝবয়সি রাজা বর্মা বললেন, 'গুড মর্নিং ইয়ংম্যান। ভালো ঘুম হয়েছে তো?'

শৌনকও তাঁকে সুপ্রভাত জানিয়ে একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'আমার উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

রাজা বর্মা প্রথমে জিকোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্ট্রিট ডগ হলেও আপনার কুকুরটা কিন্তু বেশ। সারারাত এই বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে ও আমাদের পাহারা দিয়েছে। তেজপ্রতাপ গাড়িতে শুয়েছিল। ও দেখেছে।'

এ কথা বলার পর তিনি বললেন, 'আপনি তৈরি হয়ে নিন। একটু পর আমরা জঙ্গল দেখার জন্য রওনা হব। ফিরতে বিকেল হবে।'

শৌনক বলল, 'আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। কিন্তু জিকোকে সঙ্গে নেওয়া যাবে তো?'

রাজা বর্মা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। ও না গেলে আমাদের যাওয়াটাই যে মাটি হবে।'—কথাটা বলে হাসলেন তিনি।

বেলা ন'টা নাগাদ বাংলো ছেড়ে নেমে জঙ্গলের দিকে রওনা হল শৌনকরা। রাজা বর্মার পরনে এখন শিকারিদের মতোই খাকি রঙের পোশাক, মাথায় ক্যাপ, পায়ে রাবার

সোলের জুতো। তেজপ্রতাপের কাঁধে বন্দুক। আর তাদের সঙ্গে জিকোর গলার দড়ি হাতে শৌনক। জঙ্গলে প্রবেশ করার পর শৌনক জানতে চাইল, 'এ জঙ্গলে কী কী প্রাণী আছে?'

তেজপ্রতাপ জবাব দিল, 'হরিণ আছে, দাঁতাল শূকর আছে, নেকড়ে আছে আর চিতা আছে।'

শৌনক বলল, 'বাঃ, চিতাও আছে!'

রাজা বর্মা বললেন, 'চিতা, মানে চিতাবাঘ। ইংরিজিতে যাকে আমরা লেপার্ড বলি। এ দেশের শেষ দুটো চিতাশাবককে একশো বছর আগে শিকার করেছিলেন রেওয়ার মহারাজা। আপনার ভাগ্য ভালো থাকলে চিতার দর্শনও মিলে যেতে পারে। তবে ভয় নেই, সঙ্গে বন্দুক আছে। আর আমার বন্দুকের নিশানা মন্দ নয়। আফ্রিকার বেশ কয়েকটা দেশে আমি শিকার করেছি।'

শৌনক বিস্মিতভাবে বলল, 'আপনি শিকার করেন এ কথা কোথাও পড়িনি বা শুনিনি তো!'

রাজা বর্মা বললেন, 'সব কথা কি আর পাবলিক ইন্টারভিউতে বলা যায়, নাকি বলা উচিত? এ দেশে তো শিকার নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার বাপ-ঠাকুর্দা শিকার করতেন। রক্তে শিকারের নেশা আছে। তাই যেসব দেশে শিকার নিষিদ্ধ নয়, সেসব দেশে আমি শিকারের জন্য যাই।'

ক্রমশই গভীর বনে প্রবেশ করতে লাগল শৌনকরা। বেশ ফুর্তিতে আছে জিকো। মাঝে মাঝেই সে লাফিয়ে উঠে ধরতে যাচ্ছে রাস্তার পাশে ঝোপের গায়ে উড়ন্ত প্রজাপতিকে। কখনও আবার ভুক ভুক শব্দে ডেকে উঠছে। রাজা বর্মা বললেন, 'বেশ গলার জোর আছে তো কুকুরটার?'

তেজপ্রতাপ বলল, 'হ্যাঁ, এই তো চাই।'

আর এরপরই একদল চিতল হরিণকে দেখতে পেল শৌনকরা। আর তাদের দেখেই জিকোর কী লাফালাফি! দড়ি ছিঁড়ে যেন তাদের তাড়া করতে চায় সে।

ঘণ্টাখানেক চলার পর শৌনকরা জঙ্গলের ভিতর এমন একটা জায়গাতে উপস্থিত হল, যেখানে বড় গাছের আধিক্য কম হলেও চারপাশ বড় বড় ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ। জমিটা সেখানে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। রাজা বর্মা বললেন, 'আমরা এখন নেপালের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলাম। জঙ্গলের ওপ্রান্তে মাইলখানেক দূরে একটা নেপালি গ্রামও আছে। তেজপ্রতাপের বাড়ি ওখানেই।'

কথাটা শুনে শৌনক বিস্মিতভাবে বলল, 'তার মানে তো অন্য দেশ! আমাদের ঢুকতে কেউ বাধা দেবে না? আমরা কি এখন তেজপ্রতাপের বাড়ি যাব?'

রাজা বর্মা জবাব দিলেন, 'না, ওখানে যাব না। এদিকটাতে নেপালের পুলিশ বড় একটা আসে না। তা ছাড়া এখন...।'

কী যেন একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন রাজা বর্মা।

কিন্তু এরপরই একটা জিনিস খেয়াল করল শৌনক। সেই ঝোপঝাড়পূর্ণ জায়গাটাতে প্রবেশ করার পরই জিকোর উৎসাহ কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এল। বাতাসে ঘ্রাণ নিতে নিতে চারপাশের ঝোপগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পথ চলতে লাগল সে। রাজা বর্মা আর তেজপ্রতাপের মধ্যেও যেন একটা সতর্ক ভাব। আরও বেশ কিছুক্ষণ ঝোপঝাড়

ভেঙে চলার পর শৌনকরা একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। তাদের সামনে একটা ছোট উন্মুক্ত জমি। তাকে ঘিরে জঙ্গল। আর এরপরই শৌনক খেয়াল করল, যে গাছের নীচে এসে তারা দাঁড়িয়েছে তার গায়ে একটা মই লাগানো। আর শুকনো গাছের ডাল দিয়ে তৈরি মইটা গিয়ে শেষ হয়েছে মাটি থেকে হাত পনেরো উঁচুতে গাছের ডালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা মাচাতে! তেজপ্রতাপ তার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা নলের মতো জিনিস বের করে বন্দুকটাতে লাগাতে লাগল। রাজা বর্মা বললেন, 'শৌনকবাবু, আপনি মাচায় উঠে পড়ুন।'

বিস্মিত শৌনক বলল, 'তার মানে?'

রাজা বর্মা বললেন, 'মানে হল এখানে একটা চিতাবাঘ আছে। বাঘিনি আসলে। একটা মানুষও মেরেছে সে। সেটাকে মারতেই এসেছি। আপনি আগে উঠে পড়ুন। একটা ছোট কাজ সেরে আমরাও উঠছি।'

শৌনক বলল, 'আপনি শিকার করতে এসেছেন! কিন্তু শিকার তো নিষিদ্ধ!'

রাজা বর্মা বললেন, 'ওসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। তেজপ্রতাপ রাইফেলে সাইলেন্সার লাগাচ্ছে। কেউ কিছু জানবে না। তা ছাড়া চিতাটা মারা হয়ে গেলেই আমরা আবার ইন্ডিয়ার ভূখণ্ডে ফিরে যাব। নিন, মই বেয়ে মাচায় উঠুন।'

তাঁর কথার জবাবে কী বলবে তা বুঝে উঠতে পারল না শৌনক। রাজা বর্মা সেলিব্রিটি হলেও আগে এ ব্যাপারটা জানলে কিছুতেই সে এখানে আসত না। এখন যে শৌনক ফিরে যাবে তার উপায়ও নেই। পথ চিনে বাংলোতে ফিরতে পারবে না সে। সবচেয়ে বড় কথা, চিতাবাঘটা যদি সত্যিই কাছাকাছি থাকে তবে সে তো মারাত্মক ব্যাপার।

রাজা বর্মা আবার তাড়া দিলেন, 'নিন উঠুন। নীচে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।'

শৌনক তাকাল কুকুরটার দিকে। সে যেন কেমন একটু গুটিয়ে গেছে। শৌনক কুকুরটার দিকে চোখ রেখে অগত্যা বলল, 'কিন্তু ওকে কীভাবে ওপরে তুলব?'

তেজপ্রতাপের হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে রাজা বর্মা বললেন, 'ও নীচেই থাকবে। ওর দড়িটা তেজপ্রতাপকে দিন।'

শৌনক জানতে চাইল, 'নীচে কোথায়?'

রাজা বর্মা ফাঁকা জমিটা দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে ফাঁকা জমির মাঝখানে একটা খোঁটা পোঁতা আছে দেখুন। এই মাচা, ওই খোঁটা, সব ব্যবস্থা করে রেখেছে তেজপ্রতাপ। ওই খোঁটাতেই বাঁধা থাকবে কুকুরটা।'

শৌনক বলল, 'মানে?'

রাজা বর্মা বললেন, 'মানে আর কিছুই না, কুকুরটাই হল বাঘ শিকারের টোপ। তবে আপনার কুকুরের কোনো ক্ষতি হবে না কথা দিলাম। ওকে দেখে চিতাটা ফাঁকা জমিতে বেরোলেই আমি চিতাটাকে নিকেশ করে দেব।'

ব্যাপারটা শুনে প্রথমে যেন কথা আটকে গেল শৌনকের। সে কোনোরকমে বলল, 'বাঘ মারার জন্য তো ছাগলের টোপ দেওয়া হয় বলে জানতাম। কিন্তু কুকুরের টোপ!'

রাজা বর্মা বললেন, 'হ্যাঁ, কুকুরের টোপ। তবে তা চিতার খাবারের জন্য নয়। ঘৃণা তৈরির জন্য। চিতারা কিছুতেই কুকুরদের সহ্য করতে পারে না। বিশেষত গ্রাম লাগোয়া

জঙ্গলের চিতারা তো নয়ই। কারণ, খাবারের খোঁজে তারা রাতে গ্রামে ঢুকলেই কুকুরেরা চিৎকার করে জাগিয়ে দেয় গ্রামের লোককে। এই চিতাটার ক্ষেত্রেও বারকয়েক এ ঘটনা ঘটেছে। কুকুরের প্রতি চিতাবাঘের জাতক্রোধ আছে। ওর ডাক চিতাটাকে ঠিক টেনে আনবে।'

শৌনকের কাছে এবার স্পষ্ট হয়ে গেল তার মতো একজন সাধারণ মানুষকে রাজা বর্মার মতো বিখ্যাত মানুষ কেন সঙ্গী করে এনেছেন। এই কুকুরটার জন্যই তাকে সঙ্গী করা হয়েছে!

পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শৌনক বলে উঠল, 'না, কিছুতেই জিকোকে আমি টোপ হতে দেব না। চলুন, ফিরে চলুন।'

শৌনক কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা বর্মার সুন্দর মুখটা হঠাৎই যেন কেমন কঠিন হয়ে উঠল। রাইফেলের নলটা শৌনকের চিবুকে স্পর্শ করালেন তিনি। কী হিমশীতল সেই স্পর্শ! রাজা বর্মা চাপা ধমকের স্বরে বললেন, 'আর একটাও কথা নয়। অনেক সময় নষ্ট করেছেন। এ রাইফেল থেকে বাঘের দিকে গুলি বেরোলে যেমন শব্দ হয় না, তেমনই মানুষের দিকে বেরোলেও নয়। শেষবার বলছি, উঠে পড়ুন।'

হতভম্ব হয়ে গেল শৌনক। তার সামনে এ লোকটা কে? যাকে সিনেমার পর্দাতে দেখে তালি দেয় লোকে? হতভম্ব শৌনকের হাত থেকে এরপর এক ঝটকায় কুকুরের দড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে অনিচ্ছুক কুকুরটাকে টেনেহিঁচড়ে ফাঁকা জমিটার দিকে নিয়ে চলল তেজপ্রতাপ। আর রাইফেলের খোঁচা খেয়ে বাধ্য হয়ে মাচায় চড়ে বসল আতঙ্কিত বিহ্বল শৌনক। কুকুরটাকে ফাঁকা জমির মাঝখানে খোঁটায় বেঁধে তেজপ্রতাপ ফিরে আসার পর সে আর রাজা বর্মাও মাচায় চড়ে বসল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জমিটা। আর তার মাঝখানে বাঁধা আছে অসহায় কুকুরটা। চারপাশে কোথাও শৌনক বা কোনো মানুষকে দেখতে না পেয়ে কুকুরটা অনেকটা কান্নার স্বরে ডাকতে লাগল। রাজা বর্মা জমিটার দিকে বন্দুক তাক করে বললেন, 'বাঃ এই তো চাই। এ ডাকই ডেকে আনবে চিতাটাকে।'

অরণ্যের নিস্তব্ধ দুপুর। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটা পাখির ডাকও না। কোনো অজানা কারণে যেন নিঃশব্দ হয়ে আছে চারপাশের পৃথিবী। মাঝে মাঝে কুকুরটা কেঁদে উঠছে। সেই কান্না যেন চারপাশের নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে হতাশ, অপমানিত শৌনক তাকিয়ে আছে মাঠের মাঝখানে বাঁধা অসহায় অবলা প্রাণীটার দিকে। সে এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা। পর্দায় যে মানুষকে দেখে লোকে তালি দেয়, পর্দার বাইরে সে মানুষটা এমন হিংস্র হতে পারে! রাজা বর্মার দৃষ্টিও মাঠের দিকে নিবদ্ধ। নিশ্চুপ এক হিম দৃষ্টি!

ঘণ্টাখানেক সময় তখন অতিক্রান্ত হয়েছে। হঠাৎই যেন আতঙ্কে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করল কুকুরটা। ছটফট করে গলার দড়িটা ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে। রাজা বর্মা সোজা হয়ে বসে চাপাস্বরে বললেন, 'মনে হয় চিতাটা কাছে চলে এসেছে। বাতাসে ওর গন্ধ পেয়ে ছটফট করছে কুকুরটা।'

তেজপ্রতাপ বলল, 'হ্যাঁ, সাব। আমাদের বুদ্ধি কাজে লেগেছে।'

পাগলের মতো দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে কুকুরটা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তেজপ্রতাপ আঙুল তুলে দেখাল ফাঁকা জমিটার একটা দিকে। রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিলেন রাজা বর্মা। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে শৌনক দেখতে পেল ঝোপের আড়াল থেকে ফাঁকা

জমিতে এসে দাঁড়িয়েছে একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘিনি! সূর্যের আলোতে তার কালো ছোপ আঁকা হলুদ গা সোনার মতো উজ্জ্বল লাগছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে তাকিয়ে আছে ছটফট করতে থাকা কুকুরের বাচ্চাটার দিকে। কুকুরটার প্রতি বিজাতীয় হিংস্র ঘৃণাতে মাঝে মাঝে তার লেজটা চাবুকের মতো মাটিতে আছড়াচ্ছে!

বাঘিনি মনে হয় বুঝতে পারল কুকুরটা আটকে আছে। তাই ধীরেসুস্থে সে এরপর এগোতে থাকল তার জাতশত্রু নিধনের জন্য। এ তার ঘৃণার শিকার।

কুকুরটার হাত দশেক তফাতে গিয়ে থামল বাঘটা। এবার সে ঝাঁপ দেবে শিকারের ওপর। কামড়ে, থাবার আঘাতে চিরদিনের মতো থামিয়ে দেবে তার ছটফটানি। আর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই নিজের অজান্তেই যেন একটা চিৎকার বেরিয়ে এল শৌনকের গলা থেকে। এর পরমুহূর্তেই একসঙ্গে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটল। শৌনকের আতঙ্কিত চিৎকার শুনে চিতাবাঘটা গাছের দিকে তাকাল। আর রাজা বর্মাও চালিয়ে দিলেন গুলি। আর কুকুরটাও ঠিক সেই মুহূর্তেই কীভাবে যেন খোঁটা থেকে দড়ি ছিঁড়ে ফেলল। রাইফেলে সাইলেন্সার লাগানো আছে বলে কোনো শব্দ হল না। শুধু তার নলের মুখে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। গুলি বাঘের গায়ে লেগেছে কি না বোঝা গেল না। শুধু প্রচণ্ড গর্জন করে বাঘটা শূন্যে সাত-আট হাত লাফিয়ে উঠল। তারপর মাটিতে পড়ে বিরাট এক লাফে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর জিকোও ছুটে হারিয়ে গেল ঠিক তার উল্টোদিকের জঙ্গলের ভিতরে। বাঘটার রক্ত-জল-করা গর্জন কিছুক্ষণ আশেপাশে অনুরণিত হবার পর সব কিছু আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শৌনকদের সামনে ফাঁকা জমিতে শুধু পড়ে আছে খোঁটায় বাঁধা কুকুরটার দড়ির একটু অংশ।

বেশ কিছুক্ষণ পর গাছ থেকে নামল সবাই। রাজা বর্মা অসন্তুষ্টভাবে শৌনককে বললেন, 'আপনার চিৎকারের জন্য সব মাটি হল। তবু আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন এ গল্প কাউকে আপনি করলে সে তা বিশ্বাস করবে না। বরং আপনার বিপদ হবে। আমার অনেক ক্ষমতা।' এই বলে তিনি রাইফেলটা দেখালেন শৌনককে।

শৌনক তবুও একটু সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'কিন্তু আমার কুকুরটা?'

রাজা বর্মা বললেন, 'ওকে আর পাওয়া যাবে না। বাঘটা ওকে মারবেই। ওকে খুঁজতে যাওয়া মানে বাঘের মুখে পড়া। আপনি খুঁজতে চাইলে খুঁজুন। আমরা চললাম।'—এই বলে তিনি বন্দুক উঁচিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। অগত্যা শৌনককেও তাঁদের অনুসরণ করতে হল। বিকেল নাগাদ সেই ভাঙা বাংলোতে ফিরে এল তারা।

।। ৪।।

নিজের ঘরে যাবার আগে রাজা বর্মা বললেন, 'যা দেখলেন, যা শুনলেন সব ভুলে যাবেন। কাল সকালে আমরা এ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাব। বাইরে বেরিয়ে সুবিধাজনক কোনো জায়গাতে আপনাকে নামিয়ে দেব।' শৌনক তাঁর কথার কোনো জবাব দিল না। বাংলোর রেলিংহীন বারান্দাতে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন রাজা বর্মা। বাংলোর সামনে ফাঁকা জমিতে অনেকক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে রইল শৌনক। রাজা বর্মার সঙ্গী গাড়ির দরজা খুলে ভিতরের একটা সিটে বসে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পা দোলাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে যেন শৌনকের উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে ব্যঙ্গের হাসি। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল শৌনক। তার বারবার মনে পড়তে লাগল জিকোর কথা। এখন কী করছে কুকুরটা? সে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে শৌনককে? নাকি বাঘিনিটা তাকে এতক্ষণে মেরে ফেলেছে? সূর্য

ডুবে গিয়ে অন্ধকার নামল একসময়। অগত্যা বাধ্য হয়েই শৌনক বাংলোতে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সারাদিন খাওয়া হয়নি। কিন্তু তার খিদে পাচ্ছে না। এমনকি মোমবাতি জ্বালাতেও ইচ্ছা করল না। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে সে ভাবতে লাগল সারাদিনের ঘটনার কথা। রাজা বর্মার প্রতি তার সব শ্রদ্ধা মুছে গিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হলেও সে অসহায়। রাজা বর্মাকে কোনো শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই। বাইরের অন্ধকার একসময় গাঢ় হল। তারপর সেই অন্ধকার মুছে গিয়ে চাঁদ উঠতে শুরু করল। খোলা দরজা দিয়ে সেই চাঁদের আলো ঘরে ঢুকে ঘরের অন্ধকার খানিক মুছে দিল। রাত ন'টা নাগাদ একটু জল খেয়ে শৌনক শুয়ে পড়ল। ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া বাইরে কোনো শব্দ নেই। রাজা বর্মার ঘরের দিক থেকেও কোনো শব্দ এল না। তিনি কী করছেন তা জানার বিশেষ ইচ্ছাও নেই শৌনকের। কাল কখন এই মানুষটার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারবে, তার জন্যই এখন শৌনকের প্রতীক্ষা। শুধু একবার বাংলোর নীচ থেকে ভেসে আসা গাড়ির দরজা বন্ধ করার অস্পষ্ট শব্দ শুনল শৌনক। সম্ভবত গাড়ির ভিতর শুয়ে পড়ল ড্রাইভার তেজপ্রতাপ। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্তি আর অবসাদে ঘুম নেমে এল শৌনকের চোখেও।

শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল শৌনকের। মশার দল ছেঁকে ধরেছে তাকে। দু-চারবার চড়-চাপাটি দিয়ে মশা মারার পর সে বুঝল এ মশার ঝাঁক যাবার নয়। কাজেই সে উঠে বসল। তার হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের কাঁটায় রাত সাড়ে তিনটে বাজে। আর ঘণ্টাখানেক পর থেকেই তো ভোরের আলো ফুটবে। মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একসময় ঘরের সামনে বারান্দায় এসে দাঁড়াল শৌনক। চাঁদের আলোতে নীচের ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। বাংলোর চারপাশ ঘিরে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর আড়ালে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শৌনকের আবারও মনে হল, কুকুরটা এখন কী করছে? সে আদৌ বেঁচে আছে তো?

কিন্তু এরপরই হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল শৌনকের। বাংলোর যে অংশে রাজা বর্মার ঘর, সেদিকের জঙ্গলের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা প্রাণী। ফাঁকা জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার সে যেন ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল। এরপর দ্রুত ছুটে এসে লাফিয়ে উঠল বারান্দাতে, ঠিক যে ঘরে রাজা বর্মা শুয়ে আছেন, সে ঘরের সামনে। প্রথম দর্শনে তাকে শেয়াল ধরনের কোনো প্রাণী ভাবলেও এবার তাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল শৌনক। আরে এ যে তার কুকুরটা! জিকো! কুকুরটার মুখে কী যেন একটা ধরা আছে! কিন্তু সেটা কী তা বোঝার আগেই রাজা বর্মার ঘরে ঢুকে পড়ল কুকুরটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য আবার সে বাইরে বেরিয়ে এল। তখন তার মুখে কিছু নেই। সে একবার বারান্দা থেকে ঘাড় তুলে নীচে যে পথ দিয়ে এসেছে সেদিকে তাকাল। তারপর বারান্দার অন্যদিকে তাকিয়ে শৌনককে দেখতে পেয়ে সোজা ছুটে এল তার কাছে। শৌনক তাকে ধরে আদর করতে যাবার আগেই জিকো তার প্যান্ট কামড়ে ধরে তাকে ঘরের ভিতর দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কুকুরটা কি খেপে গেল নাকি? ও এমন করছে কেন? কিন্তু এরপরই জিকোর আচরণের কারণটা স্পষ্ট হয়ে গেল শৌনকের কাছে। একটা চাপা ঘড়ঘড় শব্দ জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে এল, তারপর জিকো যে পথে জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়েছিল, ঠিক সে পথেই ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করল একটা বিরাট চিতাবাঘ! তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে! তাকে দেখামাত্রই শৌনক কুকুরটার সঙ্গে পিছু হটে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতর কিছুটা ঢুকে গেল। আড়াল থেকে সে দেখতে লাগল বাঘটাকে। বাঘটা মাটি শুঁকতে লাগল আর তাকিয়ে দেখতে লাগল বারান্দার অপর প্রান্তে রাজা বর্মার ঘরের দিকে! কী যেন বোঝার বা খোঁজার চেষ্টা করছে চিতাবাঘটা।

ঘরের ভিতর থেকে বাঘটার দিকে আতঙ্কে তাকিয়ে রইল শৌনক। ছোট একটা লাফ দিয়ে কুকুরটা যে পথে বারান্দায় উঠেছিল, সে পথেই বাঘটাও বারান্দায় উঠে এল। আর মুহূর্তখানেকের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝটাপটির শব্দ ভেসে এল রাজা বর্মার ঘর থেকে। বাঘটাকে দেখতে না পেলেও শৌনক বুঝতে পারল রাজা বর্মার ঘরে ঢুকেছে সে। সাইলেন্সার খোলা ছিল। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে এল রাইফেলের প্রচণ্ড শব্দ। তা শুধু বাড়িটাকেই নয়, কাঁপিয়ে তুলল বাড়ির চারপাশের জঙ্গল। বন্দুকের শব্দের পরই ঘরের ভিতর থেকে রাজা বর্মার প্রচণ্ড আর্ত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু কয়েক মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল। শৌনক ঘরের ভিতর থেকেই এরপর দেখল, বাঘটা লাফিয়ে নামল বারান্দা থেকে। অর্থাৎ বাঘটার কিছু হয়নি। আর এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়ে ঘুমচোখে গাড়ি থেকে নেমে এল তেজপ্রতাপ। সে মনে হয় শুধু বন্দুকের শব্দই শুনেছে, বাঘটাকে খেয়াল করেনি। বাঘটার সামনে পড়ে গেল সে। বাঘটার মুখে কিছু একটা ধরা ছিল। সেটা সে মুখ থেকে নামিয়ে রেখে তীব্র একটা গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তেজপ্রতাপের ওপর। তেজপ্রতাপকে মাটিতে পেড়ে ফেলল বাঘটা। শৌনক যেন 'মট' করে একটা শব্দ শুনল। হয়তো বা ঘাড় ভাঙার শব্দ! একটা আর্তনাদ করার সুযোগও পেল না সে। তার নিথর দেহের ঘাড়টা কামড়ে ধরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বাঘটা। তারপর সে মুখের থেকে যে জিনিসটা নামিয়ে রেখেছিল সেটা তুলে নিতে গেল। সে জিনিসটা তখন গড়াতে গড়াতে উপস্থিত হয়েছে গাড়ির সামনে হেডলাইট যেখানে পড়েছে সেখানে। নড়ছে সেই বলের মতো ছোট্ট জিনিসটা। এবার আর সেটা কী তা বুঝতে অসুবিধা হল না শৌনকের। বাঘের বাচ্চা! সদ্যোজাত শাবকটাকে আবার মুখে তুলে নিল বাঘিনি। তারপর কয়েকটা লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের গভীরে। গাড়ির সামনে পড়ে রইল তেজপ্রতাপের নিথর দেহটা। আর একটা মোটা রক্ত ধারা তখন রাজা বর্মার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে চাঁদের আলোতে বাইরের বারান্দায় জমতে শুরু করেছে। ঘরের সামনের দেওয়াল ধরে পাথরের মূর্তির মতো বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থাতে দাঁড়িয়ে রইল শৌনক।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি নিয়ে সেখানে হাজির হল বনরক্ষী বাহিনীর লোকরা। গুলির শব্দ আর বাঘের ডাক শুনে আলো ফুটতেই উপস্থিত হয়েছে তারা। নীচের জমিতে তেজপ্রতাপের মৃতদেহ আর ঘরের ভিতর রাজা বর্মার মৃতদেহ আবিষ্কার করল তারা। রাজা বর্মার মুখ দেখে তাকে অবশ্য তখন চেনা যাচ্ছে না। শৌনককে দেখতে পেয়ে তাকে এসে ঘিরে ধরল বনরক্ষীরা। একজন বনরক্ষী শৌনককে বলল, 'আপনি সঙ্গে ছিলেন! এ তো বাঘের কাণ্ড দেখছি! দুজনকেই মেরে রেখেছে!'

শৌনক বলল, 'হ্যাঁ, একটা চিতাবাঘ হানা দিয়েছিল। মানে বাঘিনি।'

অপর এক বনকর্মী স্বগতোক্তি করল, 'বাঘিনি এখানে কীভাবে এল! একটা বড় চিতাবাঘিনি আছে ঠিকই, কিন্তু সে তো এদিকে আসে না।'

ঠিক এই সময় শৌনকের প্যান্টের নীচের অংশ ধরে কে যেন টান দিল। শৌনক দেখল তার প্যান্ট টেনে তার দিকে তাকিয়ে আছে জিকো। সে যেন শৌনককে বলছে, 'কাউকে কিছু বোলো না।'

শৌনকের চোখে ভেসে উঠল একটা ছোট্ট দৃশ্য। নীচ থেকে বারান্দায় উঠে মুখে কী যেন একটা ধরে রাজা বর্মার ঘরে ঢুকে পড়ল কুকুরটা! হয়তো বা তাকে টোপ বানাবার কারণে রাজা বর্মাকে শাস্তি দেবার জন্য শিকারিকে সে চিতাবাঘিনির শিকার বানাল।

শবসাধনা

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে করতে একটু মনে হয় ঝিমিয়েই পড়েছিলেন বিপদভঞ্জন। বড় রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চে বসেছিলেন তিনি। যেখানে বসে বাসের জন্য অপেক্ষা করে যাত্রীরা। এক ঘণ্টা আগে এ জায়গাতেই বাস থেকে নেমেছিলেন তিনি। রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিতে আর শীতের মিঠে রোদ পিঠে পড়াতে তন্দ্রা এসে গেছিল তাঁর। আর সেটা ভাঙল একটা বাসের হর্নের প্রচণ্ড শব্দে। বাসটা যেন তাঁর ঘাড়ের ওপর দিয়েই বেরিয়ে গেল। তন্দ্রামুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন বিপদভঞ্জন। না, তাঁর চারপাশে কেউ নেই। বাসরাস্তার দু-পাশে শুধু ধানের খেত। অনেক দূরে একটা গ্রাম মতো যেন দেখা যাচ্ছে। ভৈরব তান্ত্রিক কি তবে তাঁর আসার কথা ভুলে গেছেন? তিনি তো বলেছিলেন তাঁকে নিতে তিনি লোক পাঠাবেন। তিনি তো গতকাল সকালে নিজেই টেলিফোনে বললেন, 'কাল বিকালেই চলে আসুন। অমাবস্যার রাত। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাসস্ট্যান্ডে আমি বা আমার লোক অপেক্ষা করবে।' 'ওই গ্রামটাতে পৌঁছাতে পারলে নিশ্চই এখানকার শ্মশানে ভৈরব তান্ত্রিকের ডেরাটা গ্রামের লোকেরা বাতলে দিতে পারবে। শীতের বেলা, আর একটু পরই রোদ মরে যাবে। সন্ধ্যা নামার আগে ভৈরব তান্ত্রিকের ডেরাতে পৌঁছানো চাই।' —এই ভেবে বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের আলপথ ধরে বিপদভঞ্জন রওনা হলেন যেদিকে গ্রাম দেখা যাচ্ছে সেদিকে।

মাস ছয়েক আগে ভৈরব তান্ত্রিকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় বিপদভঞ্জনের। আসলে বিপদভঞ্জন নিজেও কিছুটা তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে চর্চা করেন। এ সব ব্যাপারে তার প্রবল আগ্রহ। আর এ সবের সন্ধানেই তিনি কখনও ছুটে বেড়ান কামাখ্যা-কালীঘাটের মতো নানা শক্তিপীঠ, নানা শ্মশান-মশানে তন্ত্র-সাধকদের সঙ্গলাভের জন্য, এ বিদ্যা করায়ত্ত করার জন্য। তবে তিনি ইতিমধ্যে যে সব তন্ত্রসাধকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন তারা হয় মিথ্যাচারী ভণ্ড অথবা বিপদভঞ্জনকে তন্ত্রসাধনার গুপ্ত বিদ্যা শেখাতে রাজি হননি। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন একজন। তাঁর নাম ছিল অঘোর তান্ত্রিক। মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিপদভঞ্জনের। তিনি তাঁকে বলেছিলেন 'বড় দেরি করে এলি তুই। আমি যে একটু পরই এ দেহ ছেড়ে চলে যাব। তবে এভাবে সাধু-সন্ন্যাসীদের পিছনে ঘুরে তোর কিছু হবে না। তোর কানে একটা মন্ত্র দিচ্ছি। এই বীজমন্ত্র জপ করে তুই শবসাধনা করিস। দেখ যদি কিছু দর্শন লাভ হয়? আদ্যাশক্তির দর্শন না হলেও যদি প্রেত দর্শন হয়? সেটাও কিন্তু একটা শক্তি।' —এ কথা বলার পর অঘোর সন্ন্যাসী তাঁর কানে কানে মন্ত্রটা বলে দিয়েছিলেন। মন্ত্র গ্রহণের পর বিপদভঞ্জন তাঁকে বলেছিলেন, 'এজন্য আপনাকে কী প্রণামী দেব?'

অঘোর তান্ত্রিক বলেছিলেন, 'বললাম না আমার খোলস ছাড়ার সময় হয়েছে। এবার তুই যা।'

বিপদভঞ্জন ভাবলেন তান্ত্রিক তো টাকা-পয়সা নিচ্ছেন না। যদি তাঁকে কিছু ফলাহার কিনে দেওয়া যায়? সে কথা ভেবে বিপদভঞ্জন আধঘণ্টা পর আবার শ্মশানঘাটে ফিরেছিলেন তখন সেই সাধুর দেহ ঘিরে জনতার ছোটখাটো ভিড়। সত্যিই তখন দেহ ছেড়ে গেছে তার আত্মা! এই একটা ক্ষেত্রেই শুধু বিপদভঞ্জনের মনে হয়েছিল সেই অঘোর তান্ত্রিক সত্যিই কোনো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন! নইলে তিনি তাঁর মৃত্যুর

ব্যাপারটা জানলেন কীভাবে? হয়তো তিনি বিপদভঞ্জনকে যা বলে গেলেন সেটাও সত্যি হতে পারে। শবসাধনা করলে কোনো শক্তির দর্শন হতে পারে। আর ঠিক এই কারণেই কলকাতার কালীঘাট মন্দিরের বাইরে এক চায়ের দোকানে ভৈরব তান্ত্রিকের সঙ্গে হঠাৎই চা খেতে গিয়ে পরিচিত হয়ে বিপদভঞ্জন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি তো আপনার নাম বলছেন ভৈরব তান্ত্রিক! আপনি কোনো দিন শবসাধনা করেছেন?'

ভৈরব তান্ত্রিক জবাব দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, অনেকবার শবের ওপর বসেছিলাম।'

কথাটা শুনে বিপদভঞ্জন আগ্রহভরে জানতে চেয়েছিলেন, কোনো শক্তিদর্শন হয়েছিল আপনার?'

ভৈরব তান্ত্রিক জবাব দিয়েছিলেন, 'না, তেমন কোনো শক্তিদর্শন বা শক্তিলাভ হয়নি আমার। হয়তো আমার মন্ত্রের জোর ছিল না, অথবা সেই শুভ বা অশুভ শক্তি দর্শনের উপযুক্ত নই আমি। তাই দর্শন হয়নি আমার। এমন কী অশুভ শক্তি অর্থাৎ প্রেতযোনি দর্শনের জন্যও তো মন্ত্রের জোর থাকা চাই।'

এ কথা বলার পর তিনি বিপদভঞ্জনকে পালটা প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন? আপনার এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা আছে নাকি?'

প্রশ্নটা শুনে বিপদভঞ্জন আপশোশ করে বলেছিলেন, 'সে সুযোগ আর হল কই? শবসাধনা, শব পাওয়া কী মুখের কথা?'—এ কথা বলার পরই তিনি সেই অঘোর বাবার কথা খুলে বলেছিলেন ভৈরব তান্ত্রিককে। কথাটা শুনে ভৈরব তান্ত্রিক আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, 'তাই নাকি? আমার এমন মাঝে মাঝে মনে হয় এ সব শবসাধনাটাধনার মধ্যে কোনো সত্যি নেই। শক্তি লাভ বা শক্তি দর্শন হয় না এতে। হয়তো আমার নিজের এ ব্যাপারে ব্যর্থতার কারণেই আমার এমন মনে হয়। তবে আপনার কথা শুনে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ বাড়ল।'

কথাটা শুনে বিপদভঞ্জন চাপা স্বরে বললেন, 'পারবেন? পারবেন মশাই আমাকে একটা মড়া জোগাড় করে দিতে। সেই অঘোর সাধুর বলা মন্ত্রটা আমার মাথার মধ্যে এখনও ঘুরপাক খায়। সত্যি মিথ্যা ব্যাপারটা একবার পরখ করে দেখতাম।'

বিপভঞ্জনের কথা শুনে ভৈরব তান্ত্রিক একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তো শ্মশানে থাকি। তেমন হলে একবার চেষ্টা করে দেখব শব জোগাড় করা যায় কিনা। আমি প্রতি মাসের শেষ শনিবার এই কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে আসি বীরভূম থেকে। আপনার কথাটা আমি মাথায় রাখলাম।'

সেদিনের সেই প্রথম সাক্ষাতের পর কালীঘাটেই বিপদভঞ্জনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার সাক্ষাত হয়েছে ভৈরব তান্ত্রিকের। তাঁর নিজের ফোন না থাকলেও পাবলিক বুথ থেকে তিনি বেশ কয়েকবার ফোনও করেছেন বিপদভঞ্জনকে। দু-জনের মধ্যে একটা সখ্যর্ত্ত গড়ে উঠেছে। ভৈরব তান্ত্রিককে বিশ্বাসযোগ্য লোক বলেই মনে হয়েছে বিপদভঞ্জনের। অবশেষে গতকাল বিপদভঞ্জন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বার্তাটা টেলিফোন মারফত পেয়েছিলেন। তার জন্য শবসাধনার ব্যবস্থা করতে চলেছেন ভৈরব তান্ত্রিক। তিনি নিজে শবসাধনায় সফল না হলেও দেখতে চান যে বিপদভঞ্জন সফল হন কিনা।

।। ২।।

আলপথ ধরে বেশিক্ষণ একলা হাঁটতে হল না বিপদভঞ্জনকে। কিছুটা এগোবার পরই তিনি দেখতে পেলেন উলটোদিক থেকে আলপথ ধরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে তার দিকেই আসছেন লাল আলখাল্লা আর জটাজুটধারী ভৈরব তান্ত্রিক। আর তার সঙ্গে ধুতি-চাদর পরা ছোকরা গোছের একজন লোক। বিপদভঞ্জনের কাছে এসে ভৈরব তান্ত্রিক বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনার কাজের জন্য জিনিসপত্র কিনতে একটু দেরি হয়ে গেল। এবার চলুন।'

বিপদভঞ্জন খেয়াল করলেন, ভৈরব তান্ত্রিকের সঙ্গীর হাতে একটা ব্যাগ থেকে উঁকি দিচ্ছে মাটির সরা, নতুন কাপড় ইত্যাদি জিনিসপত্র। বিপদভঞ্জন বললেন, 'আপনার জন্য অপেক্ষা করার পর আমি নিজেই আপনার ডেরা খুঁজতে যাচ্ছিলাম। চলুন।'

তবে সাধনার জিনিসপত্র ব্যাগের মধ্যে দেখতে পেলেও আসল জিনিসটা, অর্থাৎ 'শব' জোগাড় হয়েছে কিনা তা ভৈরব তান্ত্রিকের সঙ্গী সেই অপরিচিত লোকটার সামনে জিজ্ঞেস করা সমীচীন বোধ করলেন না বিপদভঞ্জন। হয়তো তার সঙ্গীকে আসল কথাটা জানাননি ভৈরব তান্ত্রিক। তিনি এগোলেন তাঁদের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামটার কাছে পৌঁছে গেলেন তারা। ভৈরব তান্ত্রিক, তার সঙ্গীর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে তাকে বললেন, 'বটেশ্বর, তুই কাশীনাথবাবুর বাড়ি যা। এতক্ষণে মনে হয় যা ঘটার ঘটে গেছে। এখন সবে বিকাল পাঁচটা। অনেক সময় আছে হাতে। কিছু যদি নাও ঘটে থাকে তবে ঘটে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে শ্মশানে চলে আসবি। বাড়ির লোককে সব বলা হয়েছে। তারা দিয়ে যাবে।'

ভৈরব তান্ত্রিকের কথা শুনে 'আচ্ছা' বলে লোকটা পা বাড়াল গ্রামের দিকে। আর ভৈরব তান্ত্রিক গ্রামে না ঢুকে বিপদভঞ্জনকে নিয়ে গ্রামটাকে বেড় দিয়ে এগোলেন শ্মশানের দিকে।

তারা যখন জায়গাটাতে পৌঁছোলেন তখনও সূর্যের আলো আছে। তবে জায়গাটা বড় নির্জন। বড় বড় গাছের ছায়া ঘেরা জায়গা। প্রাচীন সব গাছ। একটা গাছ থেকে বিরাট বিরাট সব বাদুড় ঝুলছে। আর এই গাছে ঘেরা জায়গার ঠিক পিছনেই একটা শুষ্ক নদীতট। পোড়া কাঠ, ভাঙা মেটে হাঁড়ি ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে সেখানে। ও জায়গাতেই দাহকার্য হয়।

বড় একটা গাছের নীচে, ভৈরব তান্ত্রিকের শনে ছাওয়া কুটির। তার সামনে একটা বাঁশের মাচা। বিপদভঞ্জনকে নিয়ে সেই মাচায় বসলেন ভৈরব তান্ত্রিক। মাচার ওপর হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'এই হল আমার ডেরা। প্রায় দশ বছর আমি আছি এখানে। ওই যে ওই মরা নদীর পাড়ে বহুবার শবসাধনা করেছি।'

বিপদভঞ্জন তাকে প্রশ্ন করলেন 'আপনার সঙ্গের লোকটা কে ছিল?'

ভৈরব তান্ত্রিক বললেন, 'বটেশ্বরকে আমার চেনা বলতে পারেন। আমার সঙ্গে এখানেই থাকে। ওর ধারণা আমি মস্তবড় তান্ত্রিক। আমার অনেক ক্ষমতা আছে। কতবার আমি তাকে বলেছি—আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুই চলে যা। ও বিশ্বাসই করে না। আমার থেকে তন্ত্রের ক্ষমতা লাভের আশায় এখানে পড়ে আছে। অবশ্য যাবেই বা কোথায়? ওর সাতকুলে কেউ নেই। পড়াশোনা কিছুই জানে না, আবার চাষবাসও জানে না। আমার সঙ্গে থাকলে তবু দুটো খেতে পায়। শ্মশানযাত্রীরা আর গ্রামের লোকরা নানা সময় নানা কিছু দিয়ে যায় আমাকে। আমিও খাই আর বটেশ্বরও খায়।'

বিপদভঞ্জন জানতে চাইলেন, 'ওকে কোথায় পাঠালেন?'

ভৈরব তান্ত্রিক বললেন, 'আসল জিনিসটা আনতে। অর্থাৎ লাশ আনতে। হয়তো সে এতক্ষণে লাশ হয়ে গেছে অথবা হব হব করছে।'

বিপদভঞ্জন বললেন, 'আপনার শেষ কথাটা বুঝলাম না।'

ভৈরব তান্ত্রিক বললেন, 'ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলি। গ্রামের কাশীনাথ মালাকারের মেজো ছেলে বিশ্বনাথের এখন-তখন অবস্থা। গতকালই অবনী কবরেজ বলে গেছে যে খুব বেশি হলে আজ বিকাল-সন্ধ্যা পর্যন্ত টিকবে ছেলেটা। সে মরলেই তার লাশটা বাড়ির লোকেরা দিয়ে যাবে। তার লাশের ওপরই বসবেন আপনি।'

কথাটা শুনে বিপদভঞ্জন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন, 'দাহকার্য না করে তারা সে লাশ আমাদের দেবে কেন?'

ভৈরব তান্ত্রিক আস্থাভরে প্রথমে বললেন, 'দেবে দেবে।'

তারপর বললেন, 'এর পিছনে একটা গল্প আছে। একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কাশীনাথের স্ত্রী। তার চোখ বন্ধ। শ্বাস পড়ছে না। দেখে এক হাতুড়ে ডাক্তার বলল যে কাশীনাথের স্ত্রী গত হয়েছেন। তাঁকে শ্মশানে আনা হল। কিন্তু তাঁকে দেখে আমার কেন জানি মনে হল যে মুমূর্ষ% হলেও তখনও তার ধড়ে প্রাণ আছে। নানা জায়গাতে সাধুসঙ্গ, ঘুরে বেড়াবার ফলে আমি কিছু টোটকা-জড়িবুটির ব্যবহার জানি। যদিও তার সঙ্গে তন্ত্র বা মন্ত্রের সম্পর্ক নেই। আমার জানাটা আমি প্রয়োগ করলাম তথাকথিত সেই মরদেহের ওপর। আর তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে ধীরে ধীরে চোখ মেলল সেই মহিলা। সেবারের মতো সে যাত্রায় বেঁচে গেল সে। এ ঘটনার ফলে তুমুল শোরগোল শুরু হল আমাকে নিয়ে। তারপর থেকে মালাকার পরিবারের বদ্ধ ধারণা আমি একজন সিদ্ধপুরুষ। আমি মড়া বাঁচাতে পারি। অবনী কবরেজের নিদান মিথ্যা হয় না। কাল কবরেজ নিদান হাঁকার পরই কাশীনাথ ছুটতে ছুটতে এসেছিল আমার কাছে। সে আমার কাছে করজোড়ে বলল, 'যদি তেমন কিছু হয় তবে তুমি আমার ছেলের প্রাণ ফিরিয়ো বাবা। যেমন আমার বউয়ের প্রাণ ফিরিয়েছিলে।'

আমি তাকে বলেছি, আমি কথা দিতে পারছি না তবে চেষ্টা করে দেখব। ছেলেটা মারা গেছে মনে হলে এক রাতের জন্য লাশটা এখানে এনে রাখতে হবে। যদি তার আয়ু থাকে তবে তা আমি তাকে ফিরিয়ে দেব।'

বিপদভঞ্জন এবার আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমার জন্য আপনি মিথ্যা বললেন?'

ভৈরব তান্ত্রিক বললেন, 'হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে বললাম। আসলে আমি শেষ একবার দেখে নিতে চাই এসবের কোনো সারবত্তা আছে কিনা? আপনি যদি সফল হন তবে আমি আবার নতুন করে সাধনা শুরু করব। নইলে এ সাধনা ছেড়ে দেব। এ ব্যাপারে আপনার যতটা আগ্রহ তার চেয়ে আমার আগ্রহ কোনো অংশে কম নয়, বরং বেশি হতে পারে।'

বিপদভঞ্জন বললেন, 'আমিও তো অনেক আশা নিয়ে এসেছি। দেখা যাক কী হয়।'

ভৈরব তান্ত্রিক হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখা যাক কী হয়। তবে শক্তির দর্শন না করলেও কিন্তু একটা জিনিস আপনি অবশ্যই লাভ করবেন। সেটা অবশ্য আমিও করেছি।'

বিপদভঞ্জন জানতে চাইলেন, 'সেটা কি?'

ভৈরব তান্ত্রিক জবাব দিলেন, 'সাহস। সারারাত একলা মড়ার ওপর বসে থাকা কম সাহসের কথা নয়! দেখবেন এরপর থেকে আপনার কোনো কিছুতেই তেমন ভয় করবে না।'

বিপদভঞ্জন বললেন, 'হ্যাঁ, তা বটে।'

ভৈরব তান্ত্রিক এরপর ব্যাগটা দেখিয়ে বললেন, 'ওর মধ্যে সব জিনিসপত্র আছে। নতুন কাপড়, চালভাজা, মাটির ভাঁড়, দেশি মদ, বড় মাটির সরা, ছোট সরা ইত্যাদি সব কিছু। বড় সরাটা চাপা দেওয়া থাকে শবের মুখে। ছোট সরাতে থাকে চালভাজা আর ভাঁড়ে থাকে মদ। মড়া যদি জেগে ওঠে তবে তার মুখে চাপা দেওয়া সরা খসে পড়বে।

তখন তার মুখে চালভাজা আর মদ ঢেলে দিতে হয়,—এ সব সাধারণ বিষয়গুলো জানেন নিশ্চই?'

বিপদভঞ্জন বললেন, 'হ্যাঁ, জানি।'

কথা বলতে বলতেই ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে গেল। তার চালাটার সামনে একটা ধুনি জ্বেলে তার পাশে বিপদভঞ্জনকে নিয়ে বসলেন ভৈরব তান্ত্রিক।

।। ৩ ।।

অমাবস্যার রাত। চাঁদ ওঠার কোনো বালাই নেই। আর চাঁদ উঠলেও বড় বড় গাছগুলোর জন্য চাঁদের আলো ও অন্ধকার কতটা দূর হত সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ধুনির পাশে বাসে লাশটা আসার প্রতীক্ষা করতে করতে তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে নানা কথা আলোচনা করতে লাগলেন দুজনে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর মাঝে মাঝে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য অন্ধকারের মধ্যে কখনও কখনও আলোক বিন্দু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। শিয়ালের চোখ। অন্ধকার নামতেই বেরিয়ে পড়েছে তারা। সন্ধ্যা রাত এগোতে থাকল মধ্য রাতের দিকে। প্রতীক্ষা করতে করতে একসময় বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন তাঁরা দুজনেই। কোথায় লাশ? একসময় বিপদভঞ্জন বলে উঠলেন, 'তারা এখনও লাশ নিয়ে এল না কেন?'

ভৈরব তান্ত্রিক বললেন, 'আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না । অবনী কবিরাজের নিদান তো মিথ্যা হয় না! তা ছাড়া আমি দুপুরবেলা ওখানে গেছিলাম। নিজের চোখে দেখে এসেছি খাবি খাচ্ছে ছেলেটা!' এই বলে চুপ করে গেলেন তিনি।

আরও বেশ অনেকটা সময় কেটে গেল। লাশের দেখা নেই। ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বিপদভঞ্জন। আরও বেশ কয়েকঘণ্টা কেটে যাবার পর তিনি একটু ক্ষুব্ধভাবেই বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছে। আপনার লাশ জোগাড় হয়েছে কিনা তা না জেনে আমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

ধুনির আলোতে স্পষ্ট অস্বস্তি ফুটে উঠেছে ভৈরব তান্ত্রিকের মুখে। তিনি বললেন 'হয়তো চলে আসবে। আর একটু অপেক্ষা করুন।'

আবারও বেশ অনেকটা সময় অপেক্ষা। বিপদভঞ্জন একসময় দেখলেন তাঁর হাতঘড়িতে রাত দশটা বাজে। এবার তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ কড়াভাবে বললেন, 'আমি যা বোঝার বুঝেছি। ও লাশ আর আসবে না। আপনার ওপর ভরসা করে আমার এখানে আসাই ভুল হয়েছে।'

ভৈরব তান্ত্রিক উঠে দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনাকে কিন্তু আমি প্রতারিত করতে চাইনি।'

বিপদভঞ্জন বললেন 'কী করতে চেয়েছেন তা আপনিই জানেন। তবে এ লাইনের অন্য অধিকাংশ লোকের মতো আপনার কথারও যে কোনো দাম নেই তা বুঝতে পারলাম।'

শবসাধনাতে বসবেন বলে সারাদিন নিরম্বু উপবাস করে আছেন বিপদভঞ্জন। জলটুকুও স্পর্শ করেননি। বায়ু চড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তিনি।

বিপদভঞ্জনের কথা শুনে হঠাৎই কঠিন হয়ে উঠল ভৈরব তান্ত্রিকের মুখ। তিনি প্রথমে বললেন, 'আজ অব্দি কেউ আমাকে এমন অপবাদ দিতে পারেনি।'

তারপর তিনি বললেন, 'ঠিক আছে আপনি আমাকে আর একটু সময়-সুযোগ দিন। আসি দেখে আসি ব্যাপারটা কী হল?' —এ কথা বলার পর তিনি বিপদভঞ্জনকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে মড়া খুঁজতে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। সেই অচেনা-অজানা শ্মশানে একলা দাঁড়িয়ে বিপদভঞ্জন মনে মনে নিজেকে নির্বোধ ভেবে তিরস্কার করতে লাগলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ভৈরব তান্ত্রিক যদি নাও ফেরেন তবে ভোরের আলো ফুটলেই তিনি রওনা হবেন বাসরাস্তার দিকে। সময় এগোতে লাগল। কোথায় যেন একপাল শিয়াল ডাকতে শুরু করল। বিপদভঞ্জনের মনে হল ওই শিয়ালের ডাক যেন বিদ্রুপ করছে তাঁকে! তারা বিপদভঞ্জনকে দেখে হাসছে!

বিপদভঞ্জন ধরেই নিয়েছিলেন ভৈরব তান্ত্রিক আর ফিরবেন না। আর ফিরলেও তিনি লাশ জোগাড় করতে পারবেন না। কিন্তু প্রায় একঘণ্টা পর যখন তিনি ফিরে এসে বিপদভঞ্জনের সামনে দাঁড়ালেন তখন ভৈরব তান্ত্রিকের ঠোঁটের কোণে হাসি। তিনি বিপদভঞ্জনকে বললেন, 'লাশ এসে গেছে। আমি সিদ্ধপুরুষ না হলেও আমার কথার দাম আছে। এবার দেখব আপনার শবসাধনার মন্ত্রের কত জোর।'

তার কথা শুনে বিপদভঞ্জন বিস্মিতভাবে বললেন, 'এসে গেছে? কীভাবে এল?'

ভৈরব তান্ত্রিক বললেন, 'এ সব আলোচনা করে এখন সময় নষ্ট করা যাবে না। পরে জানবেন সব কথা। রাত বয়ে যাচ্ছে। আপনি জামাকাপড় খুলে নতুন কাপড় পরে ফেলুন। ওই যে ওখানে গাছের আড়ালে নদীতটে লাশটা রাখা। আমি ওখানে গিয়ে সব উপাচার সাজিয়ে রাখছি। আপনি ঠিক আধঘণ্টা পর ওখানে যাবেন। তবে উপাচারগুলো ওখানে সাজিয়ে রাখার পর আমি ওখান থেকেই এ স্থান ত্যাগ করব। আপনি জানেন নিশ্চই এক সাধকের শবসাধনার সময় অন্য কোনো সাধকের কাছাকাছি থাকতে নেই? তবে আধঘণ্টার আগে ওখানে যাবেন না। যারা লাশটা দিতে এসেছিল তারা ততক্ষণে বাড়ি ফিরে যাবে। ওই যে দরজার বাইরে জলের জালা রাখা। ওতে স্নান সেরে কাপড় পরবেন।'

বিপদভঞ্জন বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

ভৈরব তান্ত্রিক এরপর ব্যাগ থেকে কাপড় বের করে বিপদভঞ্জনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্য জিনিসগুলো নিয়ে গাছের আড়ালে নদীতটের দিকে চলে গেলেন।

।। ৪।।

ভৈরব তান্ত্রিকের ঘরের বাইরে রাখা জালার জলে স্নান সেরে নতুন রক্তবস্ত্র পরে ঠিক আধঘণ্টা পর গাছের আড়ালে নদীতটের দিকে এগোলেন তিনি। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন তার কিছুটা তফাতে একটা মোমবাতির শিখা বাতাসে কাঁপছে। আর তার

কাছেই শোয়ানো আছে একটা উলঙ্গ শব। তার মুখের ওপর মাটির সরা চাপা দেওয়া। সেই দেহটার দু-পাশে সাজানো আছে শবসাধনার উপাচার। কথামতো সব সাজিয়েগুছিয়ে চলে গেছেন ভৈরব তান্ত্রিক। বিপদভঞ্জন লাশটার সামনে উপস্থিত হতেই বাতাসে মোমের শিখাটা নিভে গেল। অবশ্য বাতিটা তাকে এমনিতেও নেভাতে হত।

মহামায়ার নাম নিয়ে বিপদভঞ্জন চড়ে বসলেন শবের ওপর। তিনি অনুভব করলেন দেহটা তখনও বেশ গরম! অর্থাৎ বেশি আগে মৃত্যু হয়নি ছেলেটার। সেজন্যই হয়তো দেহটা আসতে দেরি হল।

শবের ওপর বসে ঘাড় সোজা করে সামনে তাকিয়ে অঘোর সন্ন্যাসীর বলে দেওয়া সেই মন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন বিপদভঞ্জন। শিয়ালের দল আবারও ডেকে উঠল। এবার তাদের ডাকের মধ্যে কেমন যেন একটা খুশির ধ্বনি! সামনে তাকিয়ে একমনে মন্ত্র জপে যেতে লাগলেন বিপদভঞ্জন। রাত এগিয়ে চলল। না, বিপদভঞ্জন যে শবের ওপর বসে আছেন সেটা নড়ে উঠে মুখের মালসাটা খসিয়ে ফেলল না। রাত শেষ হয়ে আকাশে শুকতারা ফুটে উঠতে চললেও শিয়ালের কয়েকটা জ্বলন্ত চোখ ছাড়া শুভ বা অশুভ কোনো শক্তিই দৃশ্যমান হল না বিপদভঞ্জনের চোখে।

শুকতারা তখন ফুটব ফুটব করছে, ঠিক সেই সময় বিপদভঞ্জন দেখলেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ভৈরব তান্ত্রিক! ভোর হতে চলেছে দেখেই নিশ্চই হাজির হয়েছেন তিনি। তাঁকে দেখে মন্ত্র থামালেন বিপদভঞ্জন। তারপর শব ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হতাশভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, কিছু হল না! শুভ বা অশুভ কোনো শক্তির দর্শনই পেলাম না আমি! সেই অঘোর তান্ত্রিকের মন্ত্রও মিথ্যা।'

অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা। ভৈরব তান্ত্রিকের মুখটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। বিপদভঞ্জনের মনে হল ভৈরব তান্ত্রিক যেন হাসলেন তাঁর কথা শুনে!

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর ভৈরব তান্ত্রিক বললেন, 'না, মিথ্যা নয়। অঘোর তান্ত্রিকের মন্ত্রে জোর ছিল। দর্শন তো পেয়েছেন আপনি।'

বিপদভঞ্জন বললেন, 'দূর মশাই! সব মিথ্যা। কোথায় পেলাম? সারারাত শিয়ালের চোখ ছাড়া কিছুই দেখলাম না। তবে আপনি মশাই আমার জন্য অনেক করলেন। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আলো ফুটলেই বাস ধরার জন্য রওনা দেব।'

ভৈরব তান্ত্রিক এবার বললেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছেন, পেয়েছেন। শক্তির দেখা পেয়েছেন। শবসাধনা সফল হয়েছে আপনার। তবে এখানে আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। শুভ না হোক অশুভ শক্তির দর্শন পেয়েছেন। আবার এখানে এলে সে আপনার ক্ষতি করতে পারে। আলো ফুটছে, এবার আমি যাচ্ছি।'

বিপদভঞ্জন বললেন, 'ও মশাই, কোথায় যাচ্ছেন?'

কিন্তু বিপদভঞ্জনের কথার জবাব মিলল না। ভৈরব তান্ত্রিক হঠাৎই যেন তাঁর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। শুকতারা ফুটে উঠল আকাশে। ভৈরব তান্ত্রিকের কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না বিপদভঞ্জন। তিনি সেখান থেকে ভৈরব তান্ত্রিকের কুটিরের সামনে ফিরে এসে ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ভোরের আলো ফুটল একসময়। পোশাক পরে নিলেন বিপদভঞ্জন। ভৈরব তান্ত্রিক সেখানে ফেরেননি। বিপদভঞ্জনের মনে হল তাঁর ফেরার জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করা উচিত। শবসাধনার উপকরণ কেনার টাকা ভৈরব তান্ত্রিককে দেওয়া উচিত তাঁর।

অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। ভোরের আলো ভালো করে ফোটার পরও ভৈরব তান্ত্রিক এলেন না। কিন্তু সেখানে এসে হাজির হল তাঁর সঙ্গী বটেশ্বর। বিপদভঞ্জনকে দেখে সে বলল, 'বুঝলেন, রাখে হরি, মারে কে! অবনী কবরেজের নিদান মিথ্যা হল। কলকাতা থেকে আরও বড় ডাক্তার এসে সুস্থ করে তুলেছে ছেলেটাকে। খাবি খেতে খেতেও এ যাত্রায় মনে হয় বেঁচে গেল সে। তা আমার গুরুদেব কই?'

বটেশ্বরের কথা শুনে বিপদভঞ্জন বললেন, 'তবে আমি কার শবে বসে সারারাত সাধনা করলাম? তোমার গুরুদেব কাল রাতে একটা লাশ জোগাড় করে আনলেন। ওই তো ওই নদীর পাড়ে ওটা আছে। হয়তো তোমার গুরুদেবও ওখানে আছেন।'

কথাটা শুনে বটেশ্বর বলল, 'লাশ! কার লাশ! চলুন তো দেখি?' বিস্মিত বটেশ্বর।

তারা দুজনে গিয়ে হাজির হল লাশের সামনে। বটেশ্বর লাশটার মুখের সরাটা উঠিয়েই আর্তনাদ করে উঠল! বিপদভঞ্জনের সামনে পড়ে আছে ভৈরব তান্ত্রিকের লাশ। কালচে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে তার ঠোঁটের দু-পাশ বেয়ে! চোখের কোনের থেকে মণি দুটো বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। সম্ভবত তীব্র বিষপানে মৃত্যু হয়েছে ভৈরব তান্ত্রিকের। সেই মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভৈরব তান্ত্রিকের শেষ কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে গেল বিপদভঞ্জনের কাছে। হ্যাঁ, অঘোর সন্ন্যাসীর মন্ত্র কাজ করেছে। ভৈরব তান্ত্রিক আত্মহত্যা করে সাধনার জন্য লাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। মন্ত্রের জোরে তাঁর আত্মাই আবার হাজির হয়েছিল বিপদভঞ্জনের সামনে! শবসাধনা সফল। শুভ শক্তি না হলেও অশুভ শক্তির দর্শন পেয়েছেন বিপদভঞ্জন। তাঁর সামনে রাত্রির শেষ মুহূর্তে দর্শন দিয়েছিল ভৈরব তান্ত্রিকের প্রেতাত্মা!

জাদুকর সত্যচরণের মলমাস তেলের শিশি

ওষুধের দোকান থেকে চন্দন তার মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়েই বুঝতে পারল আকাশের গতিক বড় সুবিধার নয়। বিকাল সবে সাড়ে চারটে, কিন্তু যেন সন্ধ্যা নামতে চলেছে! ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। কালবৈশাখীর পূর্বাভাস। আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে চন্দনকে তার বাসায় ফিরতে হবে। মিনিট পঁচিশের হাঁটা পথ। অন্য সময় হলে সে হেঁটেই ফিরত। কিন্তু আকাশের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, সব থেকে বড় কথা তার পায়ের ব্যথাটা সকাল থেকে শুরু হয়েছে। যে কারণে এখানে আসার সময়ও তাকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসতে হয়েছে। সে রকমই কোনো ট্যাক্সি, নিদেনপক্ষে যদি কোনো টানা রিকশা পাওয়া যায়, এই ভেবে মৃদু খোঁড়াতে খোঁড়াতে চন্দন এগোল রাস্তার মোড়ের দিকে।

কিন্তু মোড় পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হল না তার। ধুলোঝড় উঠতে শুরু করল। সে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য কাছেই একটা চায়ের দোকান দেখে সে তাড়াতাড়ি এগোল সেদিকে। একজনই খদ্দের ঝাঁপের নীচে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে। তার হাতের ছোটো ফ্লাস্কে কেটলি থেকে চা ঢেলে দিচ্ছিল দোকানি। তার পাশে গিয়েই দাঁড়াল চন্দন। লোকটা ফ্লাস্কে চা নিয়ে পিছন ফিরে রাস্তায় নামতে গিয়ে চন্দনের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'আরে আপনি এখানে!'

চন্দন প্রথম মুহূর্তে অবশ্য চিনতে পারেনি লোকটাকে। কারণ, এর আগেরবার লোকটাকে যখন সে দেখেছিল তখন তার পরনে ছিল সাদা প্যান্টের ওপর লাল কোট, গলায় বাঁধা ছিল সিল্কের রুমাল। আর এখন তার পরনে ছাপা লুঙ্গি আর ফতুয়ার মতো খাটো পাঞ্জাবি। যদিও তার হাতের আঙুলে রংচঙে পাথর বসানো আংটিগুলো তখনও ছিল, এখনও আছে। তবে লোকটার প্রশ্ন শুনে ভালো করে তার দিকে তাকাতেই তাকে চিনে ফেলল চন্দন। আরে এ যে যেই জাদুকর সত্যচরণ পুতিতুন্ডি! মাস ছয় আগে শিলিগুড়ি থেকে রাতের ট্রেনে কলকাতা ফেরার পথে যার সাথে চন্দনের পরিচয় হয়েছিল। ভদ্রলোকের সাথে ছিল তার ম্যাজিকের সরঞ্জামের একটা ঢাউস বাক্স। তার থেকে তিনি বার করেছিলেন শিয়ালের চামড়ার একটা দাবার ছক আর মানুষের হাড়ের তৈরি ঘাটি । চন্দনের সাথে সারারাত দাবা খেলতে খেলতে সেই অদ্ভুত দাবার ছক নিয়ে ভয়ংকর এক অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছিলেন ভদ্রলোক। নিজের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে চন্দনকে তাঁর বাড়িতে গল্প শুনতে আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন জাদুকর সত্যচরণ। যদিও তাদের দুজনের বাড়ি কলকাতাতেই কিন্তু হঠাৎ এভাবে এই কালবৈশাখীর বিকালে হঠাৎ সত্যচরণের সাথে দেখা হয়ে যাবে তারা ভাবতে পারেনি চন্দন।

সত্যচরণের কথার জবাবে চন্দন হেসে বলল, 'হ্যাঁ, একটা ওষুধের দোকানে এসেছিলাম ভিজিট করতে। আপনি এখানে!'

জাদুকর সত্যচরণ পাশের একটা গলি দেখিয়ে বললেন, 'এই গলিতেই তো আমার বাড়ি। মানে, ভাড়া থাকি উনিশ বছর ধরে। আপনাকে তো আসতে বলেছিলাম, আর এলেনই না। তা এখন কী কাজ?' ঠান্ডা বাতাসের বেগ বাড়ছে। রাস্তা থেকে ধুলো, কাগজের টুকরো উড়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে রুমালে মুখ চাপা দিয়ে চন্দন বলল, 'কাজ আজকের মতো শেষ। বাড়ি ফেরার জন্য ট্যাক্সি বা রিকসা খুঁজছিলাম। কিন্তু যা ঝড়

উঠল! কথাটা শুনেই সত্যচরণ বলে উঠলেন, 'চলুন মশাই, তবে আমার বাড়ি চলুন। এই তো সাত-পা দূরেই আমার বাড়ি। চা খেয়ে একটু গল্পগুজব করে ঝড়বৃষ্টি কমলে বাড়ি ফিরবেন।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু এভাবে হঠাৎ সত্যচরণের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হওয়া ঠিক হবে কিনা তা প্রাথমিক অবস্থাতে বুঝে উঠতে পারল না চন্দন। বিশেষত সত্যচরণের বাড়ির লোক হঠাৎ অতিথির আগমনে অপ্রস্তুত হতে পারেন। তাই প্রস্তাব শুনে ইতস্তত করতে লাগল চন্দন। চন্দনকে চুপ করে থাকতে দেখে জাদুকর সত্যচরণ তাঁর যত্নে লালিত সরু গোঁফের তলায় মুচকি হেসে বললেন, ''আমি যে 'থট রিডিং' জানি তা আপনি ভুলে গেছেন। কী ভাবছেন? আপনার আকস্মিক আগমনে আমার বৌ-বাচ্চা, বাড়ির লোক কী ভাববে? আরে মশাই আমি একলা মানুষ। বিয়ে-থা কিছুই করিনি। একটা চাকর পর্যন্ত বাড়িতে নেই। দেখছেন না দোকান থেকে চা কিনে নিয়ে যাচ্ছি?'

কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। বাতাসের ঝাপটা আরও বাড়ছে। ধুলোর ঘূর্ণিতে রাস্তার পাতা, কাগজের চায়ের কাপ পাক খাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে সত্যচরণ এরপর চন্দনকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'চলুন মশাই। আর দেরি করবেন না। এখনই প্রলয় শুরু হবে। তখন আর এখানে দাঁড়িয়ে ধুলো খাওয়া আর কাকভেজা ছাড়া উপায় থাকবে না। চলুন, চলুন।'

হ্যাঁ, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হল বলে! পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে চন্দন বলল, 'ঠিক আছে চলুন।'

ধুলোঝড়ের মধ্যেই রাস্তায় নেমে সত্যচরণের পিছু নিল চন্দন। সত্যচরণ গলিতে ঢুকে পড়লেন। পুরোনো কলকাতার গলি। দু-পাশে পুরোনো দিনের দোতলা-তিনতলা বাড়ি। বাইরের পলেস্তারা খসে পড়েছে, কোনো বাড়ির খড়খড়ি দেওয়া জানালার পাল্লা বাতাসের ঝাপটাতে ঝুলছে, কারো বাড়ির কার্নিশে বটগাছের চারা। পাঁচ-সাতটা বাড়ি পেরিয়ে তেমনই একটা বাড়ির দরজা ঠেলে তাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন সত্যচরণ। একটা ছোটো উঠোন ঘিরে চারপাশে অনেক ঘর। দেখে মনে হয় অনেক লোকজন থাকে সেখানে। ঝড়ের জন্য দরজা-জানলা বন্ধ করছে তারা। বাড়ির ভিতর দিয়ে একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি আধো অন্ধকারের মধ্যে ওপর দিকে উঠে গেছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে চন্দনকে নিয়ে ওপরে উঠে সত্যচরণ গিয়ে থামলেন সোজা তিনতলার ঘরের সামনে। আর কোনো ঘর নেই এখানে। কোমর থেকে চাবি বার করে দরজা খুলে ঘরের আলো জ্বাললেন তিনি। চন্দনের উদ্দেশে বললেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন। এ ঘরটা চিলেকোঠায় ঠিকই, কিন্তু সুবিধা হল এখানে কেউ বিরক্ত করতে আসে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারি।'

জুতো খুলে ঘরের ভিতর পা রাখল চন্দন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ শোনা গেল। কালবৈশাখী শুরু হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাল চন্দন। একটা লোহার ফোল্ডিং খাট, একটা কেঠো টেবিল ছাড়াও রাজ্যের জিনিস রয়েছে ঘরটাতে। যেমন দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে একটা টিনের পুরোনো সাইনবোর্ড। তার গায়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া লেখা—''এস পুতিতুন্ডি, দ্য গ্রেট ম্যাজিশিয়ান, অব ইন্ডিয়া।'' সাইনবোর্ডটা নিশ্চয়ই এককালে কোথাও টাঙানো ছিল এখন তা স্থান পেয়েছে এ ঘরে। তাছাড়া নানা ধরনের বাক্স, দড়িদড়া, এমন কি ক্যানভাসের তৈরি একটা পুরোনো তাবুও রয়েছে ঘরের এককোণে। দেওয়ালের গা থেকে ঝুলছে জাদুকর সত্যচরণের ছবি, মুখোশ, পালক লাগানো টুপি এসব জিনিস। ঘরের একপাশে একটু উঁচু মতো জায়গাতে সত্যচরণের সেই জাদুর বাক্সটাও দেখতে পেল চন্দন। কালো রঙের বেশ

বড় টিনের বাক্সটার ওপর মানুষের মাথার খুলি আর হাড় আঁকা আছে। টেবিলের গায়ে একটা নড়বড়ে কেঠো চেয়ারে চন্দনকে বসাল সত্যচরণ। চন্দন তার ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। দুটো চায়ের কাপ আর একটা লেড়ো বিস্কুটের কৌটো টেবিলে এনে রাখলেন তিনি। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে বিস্কুট সহযোগে চন্দনকে আপ্যায়ন করে নিজের কাপে চুমুক দিয়ে সত্যচরণ বললেন, ''হ্যাঁ, এই হল আমার ড্রইংরুম কাম বেডরুম কাম ওয়ার্কশপ। কেমন বুঝছেন?'

চন্দন হেসে জবাব দিল, 'বেশ ভালো। আমি তো এখন একলাই থাকি।'

চা খেতে খেতে দুজনের বেশ কিছু মামুলি কথাবার্তা হল। তারপর সত্যচরণ বললেন, 'আপনি একটু খোঁড়াচ্ছেন বলে মনে হল? কী হয়েছে পায়ে?'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চন্দন বলল 'না, তেমন কিছু বড় জিনিস নয়, ওই বাতের ব্যথা। এ ব্যথার জন্য তো আজকাল বয়স লাগে না। আমি নিজে ওষুধ নিয়ে কারবার করি। ওষুধ খেয়ে দেখেছি। তেমন কাজ হয়নি। মাসখানেক পরপর ইদানীং ঘুরেফিরে আসছে ব্যাথাটা। ক-দিন থাকছে, তারপর চলে যাচ্ছে, আবার থামছে।'

চন্দনের কথা শুনে জাদুকর সত্যচরণ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, 'ব্যথা যাচ্ছে না! এক মিনিট অপেক্ষা করুন। একটা জিনিস আছে আমার কাছে।'

চন্দনদের চা পান শেষ হয়ে গেছিল। টেবিল থেকে চায়ের কাপ, ফ্লাস্ক, বিস্কুটের কৌটো ঘরের অন্যত্র সরিয়ে রেখে তাঁর সেই খেলা দেখাবার বাক্সটার সামনে হাজির হলেন জাদুকর সত্যচরণ। বিরাট বাক্সটা খুলে তার ভিতরে হাতড়ে হাতড়ে কী যেন একটা বার করলেন। তারপর সে জিনিসটা টেবিলের ওপর ঠক করে নামিয়ে রাখলেন। কর্কের ছিপি আঁটা লাল রঙের একটা প্রায় ফাঁকা শিশি। ভালো করে শিশিটার দিকে তাকালে বোঝা যায় যে তলানি হিসাবে অতি সামান্য কিছু তরল অবশিষ্ট আছে শিশিটাতে। লেবেল ছাড়া শিশিটার দিকে তাকিয়ে জাদুকর সত্যচরণ বললেন, 'হ্যাঁ, এই হল সেই আশ্চর্য জিনিস। মহাঔষধ।'

চন্দন শিশিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী এটা?'

ঠিক সেই সময় ঝড়ের দাপটে জানলার বন্ধ পাল্লা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। আর আলোটাও নিভে গেল। লোডশেডিং!

সত্যচরণ অবশ্য টেবিলের একপাশে মোমদানিতে রাখা মোমবাতিটা দেশলাই দিয়ে চট করে জ্বালিয়ে ফেললেন। তারপর চন্দনের প্রশ্নর জবাবে বললেন, ''আপনি 'মলমাস তেলের' নাম জানেন?''

চন্দন হেসে বলল, 'মানে যে তেল ট্রেনে হকাররা বাত-ব্যথা-বেদনার উপশমের তেল বলে ফেরি করেন বা গ্রাম্য মেলাতে বিক্রি হয়, সেই মলমাস তেল তো?'

সত্যচরণ বললেন, 'সে তেলকে মলমাস তেল হিসাবে বিক্রি করা হলেও তা আসল মলমাস তেল হতে পারে না। এই হল আসল মলমাস তেল। এর এক ফোঁটা লাগালে মানুষের বাত তো কোন ছার বেতো হাতিও উঠে দাঁড়ায়, খোঁড়া ঘোড়াও রেসের মাঠে দৌড়ায়। এ শুধু গল্পকথা নয় একেবারে সত্যি। একমাত্র আমার কাছেই কয়েক ফোঁটা আছে।' চন্দন জানতে চাইল 'এমন খাঁটি তেল আপনি পেলেন কোথায়? শুধু আপনার

কাছেই এ তেল কেন?' সত্যচরণ বললেন, 'তাহলে আপনাকে গল্পটা বলি। আর তা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন এ তেল কীভাবে আমি পেয়েছিলাম, আর কেনই বা এ তেল অন্য কারো কাছে থাকা প্রায় অসম্ভব।'

ঝড়ের সাথে এবার বাইরে একটা ঝমঝম শব্দ শোনা যেতে লাগল। বৃষ্টি শুরু হল বোধহয়। জানলার পাখির ফাঁক দিয়ে ঢোকা বাতাসে মোমবাতির শিখাটা মাঝে মাঝে কাঁপছে। টেবিলের ওপর রাখা, সত্যচরণের কথা অনুসারে সেই খাঁটি মলমাস তেলের শিশির দিকে তাকিয়ে জাদুকর সত্যচরণ বলতে শুরু করলেন তাঁর কাহিনি—

।।২।।

''আমি তো খুব অল্প বয়সে ঘর ছেড়েছিলাম, তারপর আমার গুরু বাজিকর হংসরাজের থেকে হাতসাফাই আর ম্যাজিকের খেলা শিখে তাঁরই আশীর্বাদ নিয়ে পথে নেমেছিলাম ম্যাজিক দেখিয়ে ভাগ্যান্বেষণের জন্য। এ ঘটনা কুড়ি বছর আগের। জাদুকর হিসাবে তখন একটু পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছি। মানে, স্কুল, মেলা থেকে মাঝেমধ্যে ডাক পাই। তাতে ডালভাতের ব্যাপারটা মোটামুটি চলে যায় আর রাজাবাজারে কলিমুদ্দিনের ঘর ভাড়ার পঞ্চাশ টাকা মেটানো যায়। হ্যাঁ, তখন সেই টিনের চালঅলা বস্তি অঞ্চলেই থাকতাম আমি। মাথার ওপর একটা ছাউনি আছে তখন সেটাই আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে খেলা দেখাতে যাই, কখনও বা দু-চার দিনের জন্য ভ্যানিশও হয়ে যাই। তারপর ফিরে এসে আশ্রয় নিই কলিমুদ্দিনের বস্তিতে। যেমন চলার তেমনই চলছিল। কিন্তু জানেন তো আমাদের এ লাইনে নতুন নতুন খেলা দেখানোর প্রয়োজন হয়। কারণ, একবার কোনো জায়গাতে শো করে আসার পর দ্বিতীয়বার সে জায়গাতে গেলে লোকজন দ্বিতীয়বার সে খেলা দেখতে চায় না, তা ছাড়া বারবার একই খেলার কৌশল বুঝে ফেলার সম্ভাবনাও থাকে। কাজেই আমাদের নতুন খেলা শিখতে হয়, দেখাতে হয়, আর তার জন্য জিনিসপত্র জোগাড় করতে হয়, যন্ত্রপাতি বানাতে হয়। একটা নতুন খেলা সে সময় কিছুদিন ধরেই ঘুরছিল। কিন্তু তার জন্য যে সরঞ্জাম লাগবে তার দাম অন্তত হাজার তিনেক টাকা। ম্যাজিক দেখিয়ে আমার যা আয় হচ্ছিল তাতে খাওয়া আর ঘর ভাড়া দেবার পর হাতে আর কিছুই থাকছে না। অথচ খেলাটা বানানো দরকার। টাকাটা কীভাবে জোগাড় করা যায় তা নিয়ে রোজ ভাবি। ঠিক এমন সময় একদিন আমাদের বস্তিরই বাসিন্দা ঠেলাওলা শিউচরণ আমাকে কথা প্রসঙ্গে জানালো যে বড়বাজারে এক মাড়োয়ারির কাপড়ের গদিতে সে ঠেলা চালায় সেখানে নাকি একজন হিসাবপত্র জানা লোকের দরকার। আমি স্কুল-কলেজের পরীক্ষাতে তেমন পাশটাশ না করলেও হিসাবের ব্যাপারটা মোটামুটি জানতাম। যদি বাড়তি দু-পয়সা উপার্জন করে নতুন খেলাটা বানানো যায় সে জন্য কপাল ঠুকে শিউচরণের থেকে ঠিকানা নিয়ে পরদিনই হাজির হলাম বড়বাজারে লছমীলালের গদিতে। লছমীলালের বয়স ষাটের বেশি। বিশাল বপু। সামান্য কিছু কথাবার্তার পর কেন জানি আমাকে পছন্দ হয়ে গেল লছমীলাল আগরওয়ালের। ম্যাজিশিয়ানরা তো কথা বেচে খায়, হয়তো বা সে কারণেই আমি বিশ্বাস জাগাতে পেরেছিলাম প্রথম দর্শনেই। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, রোজ বিকাল পাঁচটাতে এসে স্টক মেলাতে হবে। মাসিক বেতন পাঁচশো টাকা। আগে যে লোকটা কাজ করত সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে, জায়গাটা তাই খালি হয়েছে। আমি লছমীলালজিকে জানালাম, আমাকে কিন্তু মাঝে মাঝে দু-এক দিনের জন্য বাইরে যেতে হয়, তবে ফিরে এসে আমি বকেয়া হিসাবের কাজ মিটিয়ে দেব। লছমীলাল ব্যবসায়ী হলেও মানুষ ভালো। আর ওই

যে বললাম প্রথম দর্শনেই কেন জানি আমাকে তার ভালো লেগে গেছিল। রাজি হয়ে গেলেন লছমীলাল। তাঁর কাছে কাজে লেগে গেলাম আমি। রোজ বিকাল পাঁচটাতে যাই, কোনো কোনো দিন কাজ না থাকলে আগেও যাই। এক মাস বাদেই লছমীলাল দেখলেন আমাকে কাজে রাখায় তাঁর মু%নাফা আরও বেড়েছে। আগের লোকটা হিসাবের গরমিল করে যে কাপড়ের গাটরি চুরি করত তা স্পষ্ট হয়ে গেল লছমীলালের কাছে। আমার ওপর বিশ্বাস বাড়ল তাঁর। লছমীলালের শরীরে সমস্যা ছিল। একেই তো তার হাতির মতো বিশাল বপু তার ওপর বাতের ব্যথায় তিনি হাঁটতেই পারেন না। ভাগ্য ভালো বাড়িটা তার কাছেই। শিউচরণ তাঁর কাপড়ের গাঁটরি বওয়ার ঠেলাগাড়িতে বালিশের ঠেকনা দিয়ে রোজ সকালে লছমীলালকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। তাকে ধরাধরি করে বাড়ি থেকে আনা হয়, আবার একই ভাবে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। স্ত্রী ছাড়া তাঁর বাড়িতে অন্য কেউ নেই। দিন দিন বাতের ব্যাথায় আরও বেশি বেশি করে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

মাস তিনেক পর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় আমাকে লছমীলাল বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে বাবু।'

হ্যাঁ, আমাকে তিনি 'বাবু' বলেই ডাকতেন। গদিঘরে তখন যে দু-তিনজন মুটে ছিল তাদের বাইরে বেরিয়ে যেতে বলে তার তক্তপোশের সামনে একটু টুলে বসালেন। আমি তো একটু ঘাবড়েই গেছিলাম প্রথমে। আমার কাজে আগের লোকটার মতো কোনো গলদ ধরা পড়ল নাকি?

না, সে সব কিছু নয়। লছমীলাল আমাকে প্রথমে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কোনোদিন 'কাশী' মানে বারাণসী গেছ?' আমি জবাব দিলাম, 'ওদিকে যাওয়া বলতে একবার কানপুর গেছিলাম একটা মেলায় খেলা দেখাতে। তবে আমার গুরু জাদুকর হংসরাজের মুখে কাশীর অনেক গল্প শুনেছি। ওখানকার বহু গঙ্গার ঘাটে তিনি খেলা দেখিয়েছেন। বিশ্বনাথের মন্দির আছে ওখানে। দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট এসব।'

লছমীলাল বললেন, 'বাঃ। তুমি সেখানে না গেলেও জায়গাটা সম্বন্ধে জানো দেখছি। আমি বহু বছর আগে একবার বিশ্বনাথ দর্শনে গেছিলাম সেখানে। আজ আমার সেখানে যাবার অত্যন্ত দরকার। কিন্তু যাবার উপায় নেই।'

এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'আমার শরীরের অবস্থা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ। বাতের ব্যথায় আমি হাঁটতে-চলতেই পারি না। আর ক'দিন পর থেকে হয়তো গদিতে আসাই বন্ধ হয়ে যাবে। কত বিলাত ফেরত ডাক্তার দেখালাম, হোমিওপ্যাথি করলাম। তাবিজ কবচ পরে জলের মতো টাকা খরচ করলাম। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হল না। ক'দিন আগে আমি একটা তেলের খোঁজ পেয়েছি। মলমাস তেল। বাতের যন্ত্রণায় মোক্ষম ওষুধ। মরা মানুষের পায়ে মালিশ করলেও নাকি সে উঠে দাঁড়ায়! ওই কাশীতেই নাকি একমাত্র একজনের কাছে ও তেল পাওয়া যায়।' এ পর্যন্ত কথা শুনে আমিও আপনারই মতো লছমীলালজিকে হেসে বললাম, 'মলমাস তেলের জন্য কাশীতে ছুটতে হবে কেন! ও তেল তো এখানেই ফেরিওলাদের কাছে পাওয়া যায়। প্রতি শিশির দাম মাত্র দু-টাকা। আপনার লাগলে আমি কাল আসার পথে কিনে আনতে পারি।'

আমার কথা শুনে লছমীলাল বললেন 'না, ওসব আজেবাজে তেল আমি বহু মেখে দেখেছি। কোনো কাজ হয় না। আমি যে তেলের কথা বলছি সে মলমাস তেলের একটা ঘেঁটো শিশির দাম কুড়ি হাজার টাকা। বললাম না, সে তেল মালিশ করলে মরা মানুষ দাঁড়িয়ে ওঠে, আমাদের শিউচরণ তার ঠেলা নিয়ে মোটর গাড়ির আগে ছুটতে পারবে।'

তেলের দাম শুনে আমি চমকে উঠে বললাম, 'এ তেলের এমন গুণ আপনি জানলেন কী ভাবে? এটা কোনো লোক ঠকাবার বিজ্ঞাপনে পড়েননি তো? মিথ্যা কথা বলে টাকা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা নয় তো?'

লছমীলাল বললেন, 'না, বিজ্ঞাপন দেখে এ খবর আমি পাইনি।'—এ কথা বলে তিনি আধশোয়া অবস্থাতেই তাঁর তোশকের নীচ থেকে ডাকে আসা একটা বড় খাম বার করলেন, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ফোটোগ্রাফ আর একটা চিঠি। ফটোগ্রাফটা তিনি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। ঘোড়ার ওপর বসে আছেন এক বয়স্ক ব্যক্তি। সাদা গোঁফদাড়ি তাঁর। মাথায় পাগড়ি। ছবিটা দেখে আমি সেটা লছমীলালকে ফিরিয়ে দেবার পর তিনি বললেন, 'এ ছবির মানুষ হচ্ছেন আমার জ্ঞাতিভাই চম্পকলাল। আসলে আমার থেকে সাত বছরের বড়। রাজস্থানের জয়সলমিরে থাকেন। আমার হাতের চিঠিটা তারই লেখা।

ছবির লোকটার পরিচয়দান করে তাঁর লেখা চিঠির রচনা তর্জমা আমাকে শোনালেন লছমীলাল। চিঠির বয়ানটা মোটামুটি এমন ছিল—''প্রিয় ভাই লছমী,

একটা ভালো খবর দেবার জন্য এই চিঠি। তুমি তো জানো যে গত পনেরো বছর ধরে আমি বাতের রোগী, এবং গত দশ বছর ধরে বাতের যন্ত্রণাতে কাতর হয়ে শয্যাশায়ীও ছিলাম। শেষ যেবার তুমি দেশে এসেছিলে সাত বছর আগে সেবার তুমি নিজের চোখেই আমার করুণ অবস্থা দেখে গেছিলে। কিছুকাল যাবৎ আমি যন্ত্রণাতে নিজের মৃত্যুকামনা করছিলাম। কিন্তু তিন মাস আগে আমার এক গুজরাটি বন্ধু কেশরীচাঁদ কর্মপোলক্ষ্যে জয়সলমিরে এসে আমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। তাঁর কাছে আমি খবর পাই তিনিও নাকি আমাদের মতো বাত ব্যাধিতে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। রোগ নিরাময়ের জন্য কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে এক বৈদ্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি চড়া মূল্যের বিনিময় 'মলমাস তেল' নামে এক তেল দেন। সেই তেল মর্দন করে একেবারে সুস্থ কেশরীচাঁদ। ছোট এক শিশি তেলের মূল্য কুড়ি হাজার টাকা। তবে একজন মানুষের পক্ষে ওই তেল নাকি কয়েকফোঁটাই যথেষ্ট। বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য জড়িবুটি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ওই মলমাস তেল প্রস্তুত করা হয়। কেশরীচাঁদের কাছে খবর পেয়ে তাঁর থেকে চিঠি নিয়ে ভাইপো পলমললালকে আমি কাশী পাঠিয়েছিলাম ওই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের কাছে। তিনি আমাকে নিরাশ করেননি। পলমল ওই তেল নিয়ে ফিরে আসার তিন দিনের মধ্যেই বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াই আমি। আর এক মাস মালিশ করার পর এখন ঘোড়ার পিঠে উঠতে পারি। যেন যৌবন ফিরে পেয়েছি। বাতের যন্ত্রণায় তোমার বর্তমান দুরবস্থার কথা আমি জানি। তুমি যদি ওই তেল সংগ্রহ করে একদিন মাত্র ব্যবহার করো তবে তার ফল বুঝতে পারবে। আমি নিশ্চিত তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে কোনো বিশেষ কারণবশত ওই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বেদনা উপশমকারী এই তেলের বিজ্ঞাপন করেন না। জনসমক্ষ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন ও একান্ত পরিচিত ব্যক্তি বা তার সুপারিশ ছাড়া তার তেল বিক্রি করেন না। এক্ষেত্রে তোমার তেল সংগ্রহে কোনো সমস্যা হবে না। আমার এই চিঠি তাঁর কাছে তোমার পরিচয় দান করবে। তুমি যদি আগ্রহী থাকো তবে আমাকে টেলিফোন করো। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের নাম, ঠিকানা আমি জানিয়ে দেব। আমি নিশ্চিত ওই মলমাস তেল মর্দন করলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবেই। আমার পরিবারের বর্তমান সব ভালোই। মলমাস তেলের প্রভাবে বার্ধক্যে আমি যৌবন ফিরে পাওয়ায় সবাই খুব খুশি।

চিতরেশ্বরী তোমার মঙ্গল করুন, সুস্থ হও,

ইতি

আশীর্বাদক চম্পকলাল,

জয়সলমির।''

চিঠির বক্তব্য আমাকে বাংলাতে তর্জমা করে শোনাবার পর লছমীলাল বললেন, 'ও চিঠি পাবার পর দাদা চম্পকলালের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে ওই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের নাম-ঠিকানা জানিয়েছেন। তবে সেই কবিরাজের কোনো টেলিফোন নম্বর নেই। চম্পকলালের এই চিঠি প্রমাণস্বরূপ নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি রাজি হলে তাঁকে টাকা দিয়ে মলমাস তেল আনতে হবে। আমি চাই, বাবু তুমি বেনারস গিয়ে আমাকে তেল এনে দাও।'

গদিমালিক লছমীলালের শেষ কথাটা শুনে আমি মৃদু বিস্মিতভাবে বললাম, 'আমাকেই পাঠাতে চাচ্ছেন কেন?'

লছমীলাল নরম স্বরে বললেন, 'এর পিছনে দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমি মানুষ চিনতে পারি। নইলে এই বড়বাজারে রাজস্থান থেকে এসে ব্যবসা করতে পারতাম না। এ কয়েক মাসে তোমাকে যতটুকু দেখেছি তাতে তুমি সৎ ও কর্মঠ বলে বুঝতে পেরেছি। কুড়ি হাজার কাঁচা টাকার ব্যাপার! অন্য কাউকে দিলাম, সে হয়তো টাকাটা মেরেই দিল। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তেমনটা হবে না আমি জানি। আর, দ্বিতীয় ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তুমি চালাক-চতুর ছেলে। নানা জায়গাতে ঘোরার অভ্যাস তোমার আছে। অচেনা জায়গাতে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে। সব থেকে বড় কথা তুমি ভালো কথা বলতে পারো। ওই আয়ুর্বেদিক যদি কোনো কারণে প্রথম অবস্থায় মলমাস তেল দিতে অস্বীকার করেন তবে সেক্ষেত্রে তুমি তাঁকে তোমার কথার জাদুতে রাজি করাতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

লছমীলালের কথা শুনে আমি ভাবতে লাগলাম কী করব? সামনে যদিও বর্ষাকাল আসছে। এ দু'মাস ম্যাজিক দেখাবার জন্য তেমন ডাক আসে না। এমনিতে সে ব্যাপারে আমি ফাঁকাই আছি। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে ব্যবসায়ী লছমীলাল এরপর একটা মোক্ষম চাল দিলেন। তিনি বললেন, 'যদিও তোমার অত টাকা লাগবে না। তবুও তোমার যাওয়া-আসা ইত্যাদির খরচ বাবদ তোমাকে আরও দু-হাজর টাকা দেব। আর ওই মলমাস তেল মাখার পর যেদিন আমি বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে গদিতে আসব সেদিন একেবারে নগদ পাঁচ হাজার টাকা উপহার দেব তোমাকে।'

লছমীলালের কথা শুনে এরপর আর 'না' বলার কোনো প্রশ্নই ছিল না। আমি বললাম, 'যাব। কবে যেতে হবে বলুন, আর কী ভাবে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে?'

লছমীলাল বললেন, 'ওই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের নাম 'সুশ্রুত মহারাজ'। কাশীতে হরিশচন্দ্র ঘাট নামের একটা ঘাট আছে। সেখানেই তাঁর বাড়ি। গিয়ে খুঁজে নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি তুমি বারাণসী যেতে পারো ততই ভালো। কাল রওনা হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।'

পরদিন নয়, ট্রেনের টিকিট ইত্যাদি জোগাড় করতে আর নিজের কিছু কাজ মেটাতে আরও দুটো দিন সময় লাগল। লছমীলালের সঙ্গে কথা বলার ঠিক তিন দিনের মাথায় তাঁর দেওয়া টাকা, সেই চিঠি, আর আমার একটা ছোট বাক্স নিয়ে কাশী বা বারাণসী যাবার ট্রেনে চেপে বসলাম।''

একটানা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে থামলেন জাদুকর সত্যচরণ। টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে একটা আধপোড়া চুরুট বার করে সেটা চন্দনকে দেখিয়ে হেসে বললেন, 'নেশা নয়, কখনও-সখনও খাই। আজ বাদলার দিন। তার ওপর অনেক পুরোনো ঘটনা বলছি তো। তাই বুদ্ধির গোড়াতে একটু ধোঁয়া দিয়ে নিই।'

ঝড়টা কমেছে, তবে বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। দেশলাই দিয়ে চুরুট ধরিয়ে, লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে টেবিলে রাখা সেই পুরোনো মলমাস তেলের দিকে তাকিয়ে জাদুকর সত্যচরণ বললেন, 'হ্যাঁ, গল্পের আসল অংশ শুরু হবে এবার—।'

।।৩।।

একদিন পর কাশী অর্থাৎ বেনারস বা বারাণসী গিয়ে পৌঁছোলাম। ট্রেন বেশ লেট ছিল পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেলা বারোটা বেজে গেল। ট্যুরিস্ট, পুণ্যার্থী, ভিখারি, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ে গিজগিজ করছে স্টেশন চত্বর। আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে ওই হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছেই কোনো ছোটোখাটো হোটেল বা ধর্মশালাতে থাকার চেষ্টা করব। তাতে কাজের সুবিধা হবে। প্ল্যাটফর্মের বাইরের ভিড়টা পাতলা হতেই আমি একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম হরিশচন্দ্র ঘাটের দিকে। শহরটা যেমন প্রাচীন তেমনই ঘিঞ্জিও বটে। কত পুরোনো মন্দির, সাধু-সন্ন্যাসী নানা ধরনের লোকজনের বাস। রাস্তার পাশে মন্দির থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে, কোথাও লঙ্গরখানার সামনে দুটো ভাতের আশাতে সার বেঁধে বসে আছে বৃদ্ধা ভিখারিনির দল, কোথাও রাস্তার ধারে বিরাট ভিয়ানে জিলিপি ভাজছে হালুইকরের দল। গন্ধ নাকে এসে লাগছে। মাইকে বাজছে শিবস্তুতি। কোথাও আবার কোনো গলির মুখ আটকে শুয়ে আছে মহাদেবের বাহন, বিরাট বিরাট ষাঁড়। এসব দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে কখনও বড় রাস্তা আবার কখনও কাশীর বিখ্যাত সরু সরু গলিপথ দিয়ে আমি একসময় পৌঁছে গেলাম হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে। রিকশাওলা জানাল কিছুটা তফাতে একটা গলির মধ্যে একটা ধর্মশালা আছে। গেলাম সেখানে। মাড়োয়ারিদের বেশ বড় একটা ধর্মশালা। তবে লোকজনের ভিড় তেমন একটা ছিল না। কাজেই জায়গা পেয়ে গেলাম। থাকা এবং দুপুরের নিরামিষ ভোজন মাত্র দু-টাকার বিনিময়ে। দোতলায় বেশ বড় ঘর। জানলা দিয়ে দূরে গঙ্গা, আর একটা ঘাট দেখা যাচ্ছে। ধর্মশালাতে আসার পথে খেয়াল করেছি বড় বড় ঘাটের পাশেই গঙ্গার পাড় বরাবর অনেক ছোটোখাটো ঘাটও আছে। হরিশচন্দ্র ঘাটের পাশেই ওটা তেমনই কোনো ঘাট হবে। যাই হোক প্রথমে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম আমি, তারপর ঘরে ফিরে টানা ঘুম দিলাম।

আমার ঘুম যখন ভাঙল এখন পাঁচটা বেজে গেছে। অনেকক্ষণ আগেই বিকাল হয়ে গেছে। তবে গ্রীষ্মকাল আর এ জায়গাটা উত্তর ভারত বলে অন্ধকার নামতে প্রায় সাতটা হয়। কাজেই ভাবলাম বাইরে গঙ্গার ঘাট থেকে একবার ঘুরে আসা যাক। সুশ্রুত মহারাজের বাড়িটা ঠিক কোথায় সেটাও জেনে নিতে হবে। পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পোশাক বদলে বাইরে যাব বলে নীচে নেমে এলাম। বাইরে বেরোবার আগে ধর্মশালার ম্যানেজার গোছের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির ঠিকানা জানে কিনা? বলতে পারল না। সে কাশীতে নতুন এসে কাজে ঢুকেছে। ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে সোজা হরিশচন্দ্র ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম আমি। দিনের শেষ হলেও প্রচুর লোকের ভিড় সে ঘাটে। যেন ছোটখাটো একটা মেলাই বসে গেছে! সিঁড়ির ধাপগুলোতে লোক দাঁড়ানোর প্রায় জায়গা নেই বললেই চলে। কেউ

গঙ্গাতে স্নান করছেন, স্নানের প্রস্তুতি করছেন, কেউ বা সুর্যাস্তের সময় গঙ্গার বুকে প্রদীপ ভাসানো বা সন্ধ্যারতির প্রস্তুতি করছেন। এ ছাড়া, সন্ন্যাসী, ভিখারি,পেঁড়াওলা, বেলুনওলা, পুরোহিত, নানা শ্রেণির নানা ধরনের মানুষ তো আছেই। ঘাটের একপাশে সামনে চাদর বিছিয়ে বলের জাগলিং-এর খেলা দেখাচ্ছে একজন টুপিপরা লোক। তাকে ঘিরে বাচ্চাদের ভিড়। লোকটাকে দেখে আমার গুরু হংসরাজের কথা মনে পড়ে গেল। স্ট্রিট ম্যাজিশিয়ান-বাজিকর হংসরাজ। তিনিও তো এখানে এসে খেলা দেখিয়েছেন। মনে মনে আমার গুরুদেব আর পুণ্যতোয়া গঙ্গা মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানালাম আমি। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর হাঁটতে শুরু করলাম। বিরাট বিরাট পুরোনো দিনের বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গাপাড়ের রাস্তা ঘেঁষে। গুরুদেবের মুখেই শুনেছিলাম একসময় নাকি রাজা-মহারাজা-জমিদার-পয়সাওলা লোকেরা এসে কাশীতে বড় বড় বাড়ি, ধর্মশালা, বৃদ্ধাবাস ইত্যাদি বানাতেন পুণ্যার্জনের জন্য। এসব বাড়িগুলো তাদেরই তৈরি আর ঘাটগুলোও। ছোটো ছোটো ঘাটগুলোতে হরিশচন্দ্র ঘাটের মতো ভিড় না থাকলেও দু-পাঁচজন মানুষ অবশ্যই আছে। কোথাও হয়তো বজরা বা নৌকা থেকে লোক নামছে, কোথাও কোনো সন্ন্যাসী ধ্যানে মগ্ন আবার কোথাও বা ঘাটের সিঁড়িতে বসে লাল শালু জড়ানো পুথি খুলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পুণ্যার্থীদের রাজা হরিশচন্দ্র মাহাত্ম্য শোনাচ্ছেন কথক ঠাকুরেরা। ধুতির ওপর সাদা উড়নি জড়ানো তাদের গায়ে। এসব দেখতে দেখতে গঙ্গার পাড় বরাবর হাঁটতে হাঁটতে হরিশচন্দ্র ঘাট থেকে বেশ কিছুটা তফাতে একটা ঘাটের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি। বেশ নির্জন ঘাট। কোথাও কোনো লোকজন নেই। বিরাট বিরাট প্রাচীন নিস্তব্ধ বাড়ি সেখানে গঙ্গার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মা গঙ্গার বুকে সূর্য ডুবছে। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। রাস্তা থেকে ধাপে ধাপে চওা সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর বুকে। মৃদু বাতাসে নদীর জল সিঁড়ির শেষ ধাপ ছুঁয়ে ছলাৎছল শব্দ তুলছে। ভারী মনোরম পরিবেশ। এই অচেনা নির্জন ঘাটটা বেশ পছন্দ হল আমার। সিঁড়ি বেয়ে বেশ কয়েকটা ধাপ নেমে জলের কাছাকাছি একটা ধাপে আমি বসলাম। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে পুরোনো দিনের কথা ভাবতে লাগলাম। সেই কোন ছেলেবেলাতে ঘর ছেড়েছিলাম, তারপর হংসরাজের পিছনে তার ম্যাজিকের থলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, এ সব পুরোনো দিনের কথাই ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ ঘণ্টার টুং টুং শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কাঁধে একটা টিনের বাক্স কাঁধে এক প্যাঁড়াওলা। এ পথে যাচ্ছিল, আমাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। শুনেছি কাশীর প্যাঁড়া নাকি খুব বিখ্যাত। ডাকলাম তাকে। চারটে প্যাঁড়া কিনলাম। শালপাতাতে প্যাঁড়া দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল সে। একটা প্যাঁড়া ভেঙে সবে মুখে দিয়েছি, ঠিক তখনই আমার চোখ গেল কিছুটা তফাতে ঘাটের শেষ ধাপের এককোণে। আট-দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে সেখানে বসে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে আমার দিকে। তার পরনে সস্তা ছিটের জামাপ্যান্ট, খালি পা। তবে বাচ্চার গড়নটা বেশ গোলগাল। তাকে হিন্দিতে প্রশ্ন করলাম, 'পেঁড়া লেওগে?'

সে কোনো জবাব না দিয়ে সম্ভবত একটু লজ্জা পেয়েই জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি আবার প্যাঁড়া খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম। সূর্য ডুবে গেল একসময়। আমাকে এবার উঠতে হবে। ধর্মশালাতে ফেরার আগে স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির ঠিকানা জানতে হবে। ধাপ ছেড়ে আমি উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে দেখি সিঁড়ি বেয়ে একজন লোক নামছে। মাঝারি উচ্চতার বেশ মোটা একজন লোক। পরনে ধুতি আর ফতুয়ার মতো জামা। সিঁড়ি বেয়ে তার নামার তালে লোকটার ভুঁড়িটা থলথল করে নাচছে। যেন ফতুয়ার নীচ থেকে এখনই তার ভুঁড়ি সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়বে। নামতে নামতেই লোকটার দৃষ্টি পড়ল ধাপে বসে থাকা বাচ্চা ছেলেটার ওপর। ছেলেটার উদ্দেশে

স্পষ্ট বাংলাতে লোকটা বলল, 'বনমালী তুমি এখানে বসে আছ! আমি তোমাকে কখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যা নামতে চলল। এবার ঘরে চলো বাবা।'

বনমালী নামের বাচ্চা ছেলেটা জবাব দিল, 'না, আমি যাব না। ওখানে থাকতে আমার মোটেও ভালো লাগে না।' মাঝবয়সি লোকটা আমার পাশ দিয়ে থপথপ করতে করতে নীচে নেমে গিয়ে বাচ্চাটার পাশে বসল। তারপর বাচ্চাটার মাথাতে হাত বুলিয়ে বলল, 'কেন বাবা? আমরা তো এখানে কত কিছু ভালো ভালো জিনিস খাই। দই, মাখন, ঘি, এসব।'

বাচ্চা ছেলেটা বলে উঠল, 'না, আমার ওসব খেতে আর ভালো লাগছে না। কতদিন হয়ে গেল আমরা এখানে আছি। মা'র জন্য মন খারাপ করছে। আমি বাড়ি যাব। তোমার অসুখ তো কবেই ভালো হয়ে গেছে।'

লোকটা তার ছেলের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বলল, 'যাব বাবা, এবার সত্যিই বাড়ি ফিরব।'

ছেলেটা বলল, 'সে তো তুমি কবে থেকেই বলছ। আমি কিন্তু এবার স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে বসব।'

কথাটা শুনে লোকটা মৃদু আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'অমন কাজ কখনও করতে যেও না। শেষে বাড়িতেই ফিরতে পারবে না। হারিয়ে যাবে।' —কথাগুলো বলে লোকটা জড়িয়ে ধরল ছেলেটাকে।

কিছুক্ষণ সেভাবেই বসে রইল তারা। বনমালীর মনে হয় মান ভাঙল। বাবা-ছেলে উঠে দাঁড়াল ঘরে ফেরার জন্য। এতক্ষণ আমি তাদের কথোপকথন শুনছিলাম। এবার আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আমাকেও ফিরতে হবে।

দেখবেন, বিদেশ-বিভুঁয়ে বাঙালি দেখতে পেলে যে কোনো বাঙালির মনেই আনন্দ হয়। তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছা হয়। আমারও তেমনই মনে হল। বাপ-বেটা সিঁড়ি বেয়ে আমার কাছাকাছি উঠে আসতেই আমি তাদের উদ্দেশে বললাম, 'বাঙালি দেখছি!'

কথাটা শুনে ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটো ভুঁড়ির কাছে জড়ো করে বলল, 'হ্যাঁ, বাঙালি। মাখনলাল চক্রবর্তী। আর এ আমার পুত্র বনমালী। আপনি কোথা থেকে আসছেন? বাবা বিশ্বনাথের দর্শনে এসেছেন?

আমি মাখনলালকে প্রতি-নমস্কার করে নিজের নাম জানিয়ে বললাম, 'না, ঠিক বিশ্বনাথ দর্শনে নয়। কলকাতা থেকে একটা কাজ নিয়ে আজই এসেছি আমি। উঠেছি ওই চরণদাস মাড়োয়ারি ধর্মশালাতে। আপনি কি এখানকারই বাসিন্দা?'

মাখনলাল জবাব দিল, 'না, ঠিক এখানকার বাসিন্দা নই। তবে পাঁচ-ছ'মাস ধরে এখানে আছি। আদতে আমি বর্ধমান জেলার লোক। বছর তিনেক হল ভাগ্যান্বেষণে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলাম। সেখানেই থাকি। বৃন্দাবন থেকে এখানে এসেছিলাম ব্রাহ্মণগিরি করে দুটো উপার্জনের আশাতে। অনেক বাঙালি আসে তো এখানে। আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম কাশীধাম দর্শন করতে যত লোক এখানে আসেন তার তুলনায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সংখ্যা সাতগুণ। তার ওপর নিজেদের মধ্যে তাদের নানা দলাদলি আছে। কেউ এ মন্দিরে যেতে পারবে না, কেউ ও ঘাটে বসতে পারবেনা এসব ব্যাপার। আমি নিরীহ মানুষ। সুবিধা করে উঠতে পারলাম না। তবে বিশেষ কারণবশত

একজনের আশ্রয়ে থেকে যেতে হয়েছিল আমাকে। এবার কাশী থেকে বাড়ি ফিরে যাব।' —এই বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল লোকটা। আর আমিও পা মেলালাম তাদের সঙ্গে। রাস্তায় উঠতে হলে বেশ কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ। ধীরে ধীরে শেষ ধাপ অতিক্রম করে ভুঁড়ি চেপে ধরে হাঁফাতে লাগল মাখনলাল। তাদের থেকে এবার বিদায় নেবার আগে আমিও দাঁড়িয়ে পড়ে তাকালাম মাখনলালের ভুঁড়ির দিকে। বুঝতে পারলাম ওই থলথলে ভুঁড়ি নিয়ে লোকটার বিরাট কষ্ট। মাখনলাল সম্ভবত আমার মনের ভাবনা বুঝতে পেরে বলল, 'আপনি বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার স্বাস্থ্য ভালো হলেও ছ'মাস আগে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন আমার এমন ভুঁড়ি ছিল না। তিনমাসের মধ্যেই বিশাল ভুঁড়ি গজিয়ে গেল!'

আমি হেসে বললাম, 'কী আর করা যাবে! শুনেছিলাম বটে কাশীর জল-হাওয়াতে অনেকের নাকি ভুঁড়ি গজায়! এবার তা প্রত্যক্ষ করলাম।'

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা ছেলেটা বলে উঠল, 'না না, জলবাতাস খেয়ে নয়, বাবার ভুঁড়ি হয়েছে ঘোল খেয়ে।'

কথাটা শুনে হেসে ফেললাম আমি। মাখনলাল কিন্তু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে আমি এবার আসি।'

হঠাৎ আমার মনে হল এ লোকটা সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির ঠিকানা জানে কিনা? তাই আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'সুশ্রুত মহারাজ এখানে কোথায় থাকে জানেন? আয়ুর্বেদ চিকিৎসক?'

প্রশ্ন শুনে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মাখনলাল বলল, 'হ্যাঁ, চিনি। কেন বলুন তো?

আমি ব্যাপারটা না ভেঙে বললাম, 'ওনার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন আছে। কোথায় বাড়িটা?'

মৃদু চুপ করে থেকে মাখনলাল গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ও বাড়ির দুটো বাড়ি পর। সদর দরজার মাথাতে ষাঁড়ের মূর্তি বসানো আছে দেখবেন।'

লোকটার জবাব শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে ফেরার পথ ধরলাম আমি।

।। ৪ ।।

পরদিন সকালবেলা ধর্মশালা ছেড়ে সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম আমি। সকাল সাতটা বাজে। হরিশচন্দ্র ঘাটে ইতিমধ্যে ভিড় জমতে শুরু করেছে। গঙ্গাস্নান সেরে ভেজা গামছা জড়িয়ে ঘরে ফিরছে কেউ কেউ। একটা দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে আমি গঙ্গার পাড় বরাবর হাঁটতে শুরু করলাম সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির দিকে। গতকাল বিকালের ঘাটটার কাছে পৌঁছে গেলাম আমি। সেখানে কয়েকজন লোক স্নান করছে তখন। সে ঘাট অতিক্রম করে সেই মাখনলালের দেখানো বাড়িটা টপকে দুটো বাড়ি ছেড়ে তিন নম্বর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়িটা যেমন বিশাল তেমনই পুরোনো। কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি গঙ্গার বাতাস খাবার জন্য বাড়িটা বানিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। অন্য বাড়িগুলোর থেকে কিছুটা তফাতে নদীর কোল ঘেঁষে বাড়িটা দাঁড়িয়ে। সামনেটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার ভিতর প্রবেশপথে দেউড়ির মতো জায়গাটার মাথায় একটা ষাঁড়ের মূর্তি বসানো আছে, তার গা থেকে পলেস্তরা খসে গেছে, কাঠের ভারী দরজাটাও রংচটা।

গুরুদেবের আর বাবা বিশ্বনাথের নাম নিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। শান বাঁধানো উঠোন ঘিরে চারপাশে থামওলা কড়িবরগার বারান্দা। তার গায়ের ঘরগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে একটু ইতস্তত করে আমি হাঁক দিলাম, 'কোই হ্যায়? কেউ আছেন?'

বারকয়েক হাঁক দেবার পর দোতলা থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল 'কৌন হ্যায়? আপনি কে?'

সামনের দোতলার বারান্দাতে এসে দাঁড়াল একজন। বয়স মনে হয় বছর পঞ্চাশ হবে। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় চেহারা। টিকালো নাক, কালো শশ্রুমণ্ডিত মুখ, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুল। পরনে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি আর লুঙ্গির মতো করে জড়ানো ধুতি। বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে আমার দিকে তাকিয়ে লোকটা প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই? কে আপনি?'

আমি জবাব দিলাম, 'আমার নাম সত্যচরণ। কলকাতার মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ী লছমীলালের গদি থেকে আসছি আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সুশ্রুত মহারাজের সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

আমার জবাব শুনে লোকটা তীক্ষ্ণ নজরে বেশ কয়েক মুহূর্ত দেখল আমাকে। তারপর বলল, 'আমিই সুশ্রুত মহারাজ। আপনার ডান দিকের বারান্দাতে সিঁড়ি আছে দেখুন। তা দিয়ে ওপরে উঠে আসুন।'

সুশ্রুত মহারাজের নির্দেশ মতো দোতলাতে উঠে এলাম আমি। ওপরে উঠে বুঝতে পারলাম এ সিঁড়ি আমাকে বাড়ির পিছন অংশে পৌঁছে দিয়েছে। কাঠের রেলিং দিয়ে একপাশ ঘেরা টানা বারান্দা। রেলিং-এর নীচেই গঙ্গা। পুরোনো বাড়িটা যেন হেলে আছে সেদিকেই। বারান্দার একপাশে সার সার বন্ধ ঘর। একটা ঘরের দরজার পাল্লাই শুধু খোলা। সে ঘর থেকে ডাক এল, 'ভিতরে চলে আসুন।'

আমি এগোলাম সেই ঘরের দিকে। ঘরের ভিতর যখন ঢুকতে যাচ্ছি ঠিক তখনই যেন আসেপাশের কোন একটা ঘর থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ মুহূর্তের জন্য কানে এল আমার। যাই হোক আমি পা রাখলাম ঘরের ভিতর। বেশ বড় একটা ঘর। মাঝখানে একটা টেবিল। নানা ধরনের খাতাপত্তর, লাল শালু জড়ানো পুথি রাখা আছে টেবিলে। ঘরের চারদিকের দেওয়ালে র‍্যাকের গায়ে রাখা আছে নানা আকারের শিশি-বোতল। নানা ধরনের তরল, জড়িবুটি রাখা আছে সেখানে। কেমন যেন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘরের ভিতর। টেবিলের ও-পাশে একটা গদি-আটা চেয়ারে বসে আছেন সুশ্রুত মহারাজ। ঘরে ঢুকে হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানাবার পর তিনি ইশারাতে তার মুখোমুখি চেয়ারটাতে বসতে বললেন আমাকে। বসলাম আমি। সুশ্রুত আবারও একবার ভালো করে আমাকে দেখে নিয়ে গম্ভীর ভাবে জানতে চাইলেন, 'বলুন, কেন এসেছেন আমার কাছে?'

আমি সংক্ষেপে আমার সাক্ষাতের কারণটা ব্যক্ত করে চম্পকলালের চিঠিটা এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে। চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আমাকে কিছু বলার আগে মুহূর্তের জন্য তিনি একবার তাকালেন ঘরের কোণে রাখা একটা দেরাজের দিকে। তাঁর সেই তাকানোতে আমার কেন জানি মনে হল ওই বন্ধ দেরাজের ভিতরেই হয়তো সে তেল আছে। যাই হোক সুশ্রুত চিঠিটা দেখার পর জানতে চাইলেন, 'আমার কাছে আপনি কী কারণে এসেছেন সে ব্যাপারে এখানকার কেউ কিছু জানে? কাউকে বলেছেন আপনি?'

আমি বললাম, 'না, কেউ কিছু জানে না এখানে। কলকাতাতেও আমি আর লছমীলালজি ছাড়া ব্যাপারটা কেউ জানে না।' সুশ্রুত বললেন, 'এখানে কাউকে জানাবেন না ব্যাপারটা। বাতের রুগির তো আর অভাব নেই। সবাই এসে উপস্থিত হবে আমার বাড়িতে। অথচ পয়সা দিতে পারবে না। এ তেল বানাতে অনেকে খরচ। চড়া দামে নানা জায়গা থেকে দুষ্প্রাপ্য জড়িবুটি, শেকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। তাই এ তেলের কথা সাধারণ মানুষদের আমি জানাই না।'

তার এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বাইরে কোনো একটা ঘর থেকে যেন গোঙানির শব্দ ভেসে এল সুশ্রুত মহারাজের ঘরে।

সে শব্দটা শুনে মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলেন সুশ্রুত। তারপর বললেন, 'সঙ্গে পুরো টাকা এনেছেন তো? আমি কিন্তু বাকিতে এই মলমাস তেল বিক্রি করি না। নগদ কুড়ি হাজার টাকাই চাই। তার এক পয়সা কম নয়। ধারও নয়।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ, টাকাটা আমার সঙ্গেই আছে। নগদ কুড়ি হাজার টাকা।'

সুশ্রুত মহারাজ বললেন, 'টাকাটা তবে দিয়ে দিন। তবে তেল আপনি আজ পাবেন না। আমার কাছে আর মাত্র এক শিশি তেল আছে। তার জন্য আগাম টাকা দিয়ে গেছে একজন। যে কোনো সময় সে তেলটা নিতে আসবে। আপনার জন্য তেল বানাতে হবে আমাকে। তার জন্য সময় দিতে হবে। তিন দিন লাগবে।'

আমি বললাম, 'তিনদিন! তার আগে হবে না?'

তিনি বললেন, 'না, হবে না। অনেক সময় অনেককে ছ-মাসও অপেক্ষা করতে হয়েছে তেল তৈরির জিনিস মেলেনি বলে। তবে টাকা যখন নিচ্ছি আর কথা যখন দিচ্ছি তখন আপনি তিনদিন পর ঠিক তেল পাবেন।'

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে আর্তনাদের শব্দটা আবার ভেসে এল!

একটু ইতস্তত করেই আমি কোমরের ভিতর থেকে লছমীলালজির দেওয়া একশো টাকার নোটের বান্ডিল দুটো বার করে এগিয়ে দিলাম সুশ্রুত মহারাজের দিকে। নোটের বান্ডিল দুটো একবার পরখ করে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রাখলেন তিনি। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কে? কে ওখানে?'

সুশ্রুত মহারাজের কথা শুনে যে ঘরের ভিতর পা রাখল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। আরে এ যে গতকালের সেই মাখনলাল! সেও দেখল আমাকে। ঘরে ঢুকে একটু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে মাখন চক্রবর্তী বলল, 'আজ্ঞে রামদাস কেমন যেন করছে। তাই ...।''

মাখনলালকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুশ্রুত মহারাজ বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি ওর ঘরে যাও। আমি এখনি আসছি।

মাখনলাল বড় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবার পর সুশ্রুত মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, 'কিছু গরিব মানুষকে আমি নিজের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করাই। এ তেমনই রোগী। এ বাড়িতেই রয়েছে। এবার তাহলে আপনি আসুন। নিশ্চিন্তে থাকুন। তিন দিন পর মলমাস তেল হাতে পেয়ে যাবেন। আর হ্যাঁ, আমার কাছে আপনি কেন ছুটে এসেছেন তা গোপন রাখবেন সবার কাছে। এ ব্যাপারটা কিন্তু বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখবেন।'

তাঁর কথা শুনে চেয়ার ছেড়ে 'আচ্ছা' বলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। তিনদিন পর জিনিসটা পেলেই হল। এ কথা ভেবে নিয়ে সুশ্রুত মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোতেই দেখলাম সুশ্রুত মহারাজের ঘরের একটা ঘর পরে একটা ঘরের দরজা খোলা। সে ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘরের ভিতর এক ঝলক তাকিয়ে দেখলাম ঘরের ভিতর একটা তক্তপোশে শুয়ে ছটফট করছে বেশ মোটাসোটা একটা লোক। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাখনলাল। খাটে শোয়া লোকটাই তবে যন্ত্রণাতে মাঝে মাঝে চিৎকার করছে আমি বুঝতে পারলাম। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। নীচের বারান্দা হয়ে শান বাঁধানো চত্বরটা পেরিয়ে আমি বাইরে বেরোতে যাচ্ছি ঠিক সেই সময় আমি দেখতে পেলাম মাখনলালের ছেলে বনমালীকে। উলটো দিকের বারান্দাতে বসে আছে সে। বিষণ্ণ দৃষ্টি। আমি তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে বললাম, 'তোমরা এ বাড়িতেই থাকো নাকি?'

সে গম্ভীর মুখে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'হ্যাঁ।' তারপর উঠে বারান্দার ভিতর দিকে চলে গেল। আমিও সুশ্রুত মহারাজের বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে ভাবলাম মাখনলাল চক্রবর্তী বেশ অদ্ভুত লোক তো! কাল যখন তাকে সুশ্রুতের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম তখন সে তো বলতেই পারত যে, সে একই বাড়িতে থাকে! যাই হোক সুশ্রুত মহারাজের বাড়ি থেকে সোজা ধর্মশালাতে ফিরে এলাম আমি। ভেবেছিলাম টিফিন সেরে বাইরে বেরোব। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন চড়া রোদ উঠল যে আর বাইরে বেরোতে ইচ্ছা হল না। তা ছাড়া আমার হাতে তিনদিন অফুরন্ত সময় আছে। ধীরেসুস্থে সব দেখা-ঘোরা যাবে।

সারাদিন আমি ধর্মশালাতেই শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। বিকালে রোদের তেজ একটু কমলে ধর্মশালা থেকে বাইরে বেরোলাম। একটা দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে কাছেই একটা টেলিফোন বুথে ঢুকলাম। কলকাতায় লছমীলালজিকে খবরটা জানানো দরকার। সুশ্রুত মহারাজের খবরটা শুনে খুব খুশি হলেন লছমীলাল। তিনি বললেন কাশীতে তিনদিন থাকার ব্যাপারে আমি যেন খরচের কার্পণ্য না করি। দরকার হলে আমি কলকাতাতে ফিরে আসার পর আমাকে আরও পয়সা দেবেন। আমিও খুশি হলাম তাঁর কথা শুনে। টেলিফোন বুথের কাজ মিটিয়ে গঙ্গার পাড়ে বড় রাস্তায় এলাম। জনস্রোতের আনাগোনা হরিশচন্দ্র ঘাটের দিকে। হঠাৎ 'রাম নাম সত্য হ্যায়' ধ্বনি শুনে দেখি শববাহকদের একটা ছোট দল আসছে। বাঁশ বাঁধা খাটিয়াতে শব বহন করে আসছে চারজন লোক। কাপড় ঢাকা বেশ মোটাসোটা কোনো পুরুষ মানুষের মৃতদেহ। আর তার পিছনে দু-তিনজন লোক। আমার পাশ দিয়ে শবযাত্রা ধ্বনি দিতে দিতে যাবার সময় আমি দেখলাম তাদের মধ্যে রয়েছে মাখনলাল। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কে মারা গেছেন?'

মাখনলাল জবাব দিল, 'রামদাস।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'রামদাস মানে সুশ্রুত মহারাজের বাড়িতে যে ছিল? কখন মারা গেল?'

মাখনলাল বলল, 'হ্যাঁ, সেই। এই বেলা বারোটা নাগাদ। ওর এখানে কেউ নেই। তাই আমি কজনকে জোগাড় করে ওকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কী হয়েছিল ওর?'

এ প্রশ্নর কোনো জবাব দিল না মাখনলাল। শবযাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছে। ভুঁড়ি দুলিয়ে তাদের পিছনে হাঁসফাঁস করে ছুটল মাখনলাল চক্রবর্তী।

তারা চলে যাবার পর আমি হরিশচন্দ্র ঘাটের ভিড়ভাট্টার দিকে না গিয়ে এগোলাম গতকালের সেই ঘাটে যাবার জন্য। ঘাটটা বেশ পছন্দ হয়েছে আমার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘাটে হাজির হলাম আমি। আগের দিনের মতোই নির্জন ঘাট। সূর্য ডুবছে নদীর বুকে। জল এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে ঘাটের শেষ সিঁড়িটাকে। আগের দিনের মতোই আমি জলের একটু ওপরে একটা ধাপ বেছে নিয়ে সূর্যাস্ত উপভোগ করতে করতে স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলাম। সূর্য ডুবে গেল একসময়। এবার আমাকে ফিরতে হবে। আমি উঠতে থাকি ঠিক সেই সময় একটা ছোট পাথরখণ্ড কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল একদম আমার সামনেই। আর একটু হলেই সেটা আমার মাথায় এসে পড়ত। কে ছুড়ল পাথরটা? উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে আমি অবশ্য কাউকে দেখতে পেলাম না। সিঁড়ি বেয়ে ঘাট থেকে উঠে ধর্মশালার পথ ধরলাম। কাশীতে দ্বিতীয় দিন আমার এভাবে কেটে গেল।

।।৫।।

তৃতীয় দিন সকালে আমি বেরিয়ে পড়লাম কাশী বিশ্বনাথ দর্শনে। তার বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না। শুধু বলি যে মন্দিরের কর্মকাণ্ড এক বিশাল ব্যাপার! কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করার জন্য কয়েক লক্ষ মানুষ আসেন। ফুল-বেলপাতার পাহাড় তৈরি হয়, টাকাপয়সা, সোনাদানাতে মুহূর্তের মধ্যে উপচে পড়ে প্রণামীর পাত্র। বেলচা দিয়ে পয়সা সরানো হয়। বিশ্বনাথ দর্শন শেষে হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন বিকাল হয়ে গেছে। রাতের খাবার ধর্মশালা থেকে দেয় না। সঙ্গে করে মুড়ি-বিস্কুট যা এনেছিলাম তা শেষ। ভাবলাম সন্ধ্যাবেলা গরম গরম পুরি, জিলাপি কিনে ধর্মশালাতে ফিরব। এ কথা ভেবে নিয়ে আমি ধর্মশালাতে না গিয়ে চলে গেলাম আমার সেই প্রিয় জায়গা সেই ঘাটে। আগের দিনের মতোই বসলাম সেখানে। সারাদিন হাঁটাহাঁটি করার পর পা'টা বেশ ব্যথা ব্যথা করছে। অন্য দিনের মতোই সূর্য ডুবছে। মগ্ন হয়ে দেখছি সেই দৃশ্য। হঠাৎই একটা পাথরখণ্ড এসে পড়ল কোণের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তবে গতকালের ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। পর পর দু'দিন পাথর এসে পড়তে পারে না। আমাকে লক্ষ্য করেই তবে পাথর ছোড়া হচ্ছে! ঘাটের ধাপ বেয়ে রাস্তায় উঠে এলাম কেউ কোথাও আছে কিনা তা দেখার জন্য। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আশেপাশে পুরোনো দিনের দোতলা, তিনতলা সব বাড়ি। তবে কি কেউ ছাদ থেকে মজা করার জন্য পাথর ছুড়ছে? বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছাদগুলো খেয়াল করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ছাদেও কাউকে দেখতে পেলাম না। গঙ্গার বুকে সূর্য ডুবল। আমিও ফেরার জন্য পা বাড়ালাম। হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে এসে একটা দোকান থেকে পুরি-জিলাপি কিনে আমি যখন ধর্মশালার গেটের মুখে পৌঁছলাম তখন অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। গেট খুলে ভিতরে ঢুকে সেটা যখন বন্ধ করতে যাচ্ছি ঠিক তখনই কপালের কাছে একটা জোর আঘাত পেলাম। পাথরের একটা ছোট টুকরো আমার কপালে লেগে ছিটকে পড়ল মাটিতে। এক হাতে কচুরির ঠোঙা আর অন্য হাতে কপাল চেপে আমি মাটিতে বসে পড়লাম। আর সেই অবস্থাতেই আমি দেখতে পেলাম একটা বাচ্চা ছেলে গলি থেকে ছুটে বড় রাস্তার দিকে পালাচ্ছে। আধো অন্ধকার হলেও আমি চিনে ফেললাম তাকে। এ যে বনমালী! মাখনলালের ছেলে! যাই হোক এরপর উঠে দাঁড়ালাম আমি। গেট বন্ধ করে এগোতে এগোতে ভাবলাম, 'ছেলেটা আমার দিকে এমন পাথর ছুড়ছে কেন! আমি তো তাকে কোনো বকাঝকা করিনি। বরং প্যাড়া দিতে চেয়েছিলাম। এটা কি ওর দুষ্টুমি নাকি ওর মাথার গণ্ডগোল আছে? যাই হোক

মাখনলালের সঙ্গে দেখা হলে ব্যাপারটা জানাতে হবে। ধর্মশালার ঘরে ঢুকে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। কাশীতে তৃতীয় দিনও কেটে গেল আমার।

চতুর্থ দিন সকালে ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিলাম কাশীর বিখ্যাত ঘাটগুলো দর্শনের জন্য। সুশ্রুত মহারাজের আগামীকাল তেলের শিশি দেবার কথা। সেটা হাতে পেলে ফেরার জন্য রাতের ট্রেন ধরে নেব। নইলে পরদিন সকালের কোনো ট্রেন। কাজেই ঘাটগুলো এদিনই দেখে ফেলতে হবে। সেইমতো আমি বেরিয়ে পড়লাম। দশাশ্বমেধ ঘাট! মণিকর্ণিকা ঘাট! অসি ঘাট! তুলসী ঘাট! কত প্রাচীন সব ঘাট! কত স্থানমাহাত্ম তাদের! কত মানুষের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে এ সব ঘাট। কত মানুষ জীবিকা অর্জন করে চলেছে এই ঘাটগুলোকে কেন্দ্র করে। নানা ধরনের দোকানি, ব্যবসায়ী তো আছেই জাগলার, বাজিকর অর্থাৎ আমাদের গোত্রের লোকরাও আছে। সারাটা দিন আমার ঘাট আর মানুষজনকে দেখেই কেটে গেল। দুপুরের খাওয়া বাইরেই খেয়ে নিলাম। বিকাল বেলা এসে নামলাম হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে। এদিন আর সেই শূন্য ঘাটটার দিকে যেতে ইচ্ছা করল না। রাতের খাবার কিনে বিকালেই ধর্মশালাতে ফিরব বলে একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ দেখি মাখনলাল আসছে। তার হাতে একটা নতুন লাঠি বা ছড়ি। সম্ভবত বাড়ি ফিরছে সে। আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। আমিই তার উদ্দেশে বললাম, 'মাখনবাবু কোথায় গেছিলেন?'

মাখনলাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'বাজারে।'

মাখনলালের হাতের পিতলের বাঁটঅলা ছড়িটার গায়ে এখনও দামের স্টিকার লাগানো আছে। তা খেয়াল করে আমি বললাম, 'ছড়িটা নতুন কিনলেন বুঝি? বেশ সুন্দর ছড়ি।'

সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, নতুন কিনলাম। হাঁটতে কষ্ট হয় তাই।'

এরপর একটু ইতস্তত করে আমি মোলায়েম কণ্ঠে তাকে বললাম, 'একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আপনার ছেলে আমার দিকে পাথরের টুকরো ছোড়ে। বাচ্চা ছেলে, হয়তো বা খেলার ছলেই মজা করে ছোড়ে। একটু বুঝিয়ে বলবেন ওকে। পাথর ছুড়লে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

কথাটা শুনে মাখনলাল গম্ভীর ভাবে বলল, 'না, আমার ছেলে কাউকে পাথর ছোড়ে না। বনমালী তেমন নয়।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'কাল সন্ধ্যায় আমি তাকে পাথর ছুড়ে পালাতে দেখেছি। এই দেখুন আমার কপালের কাছে এখনও একটু ফুলে আছে।'

আমার কথা শুনে মাখনলাল আমার কপালের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আপনি ভুল দেখেছেন।'

এ কথা বলে আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তার ব্যবহারে বেশ একটু অবাক হলাম আমি। অতঃপর খাবার কিনে দোকানে ছেড়ে ধর্মশালার দিকে এগোলাম। চতুর্থ দিনটা এভাবেই কেটে গেল।''

—এ পর্যন্ত গল্পটা বলে থেমে গেলেন জাদুকর সত্যচরণ। টেবিলের মোমবাতিটা পুড়তে পুড়তে একবার দপ করে আলো ছড়িয়ে নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। বাইরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। গল্প থামিয়ে সত্যচরণ বললেন, 'দাঁড়ান, আর একটা মোম জ্বালাই। নইলে আপনার অসুবিধা হবে।'

চন্দন বলল, 'দরকার নেই। অসুবিধা হবে না। আপনি বরং গল্পটা শেষ করুন।'

চন্দনের কথা শুনে সত্যচরণ বললেন, 'হ্যাঁ, গল্পটা শেষের পথে। তবে শেষ করি।'

এ কথা বলে তাঁর গল্পর শেষ অংশ সত্যচরণ শুরু করলেন—

''বেশ ভালো ঘুম হয়েছিল রাতে। উঠতে একটু বেলাই হয়েছিল। স্নান সেরে বেলা দশটা নাগাদ আমি তেল আনবার জন্য রওনা হলাম সুশ্রুত মহারাজের বাড়ি। আগের দিনের মতোই দরজা খুলে বারান্দা ঘেরা শান বাঁধানো উঠোনে প্রবেশ করলাম। তবে সেখানে বনমালী, মাখনলাল বা অন্য কোনো লোককে দেখতে পেলাম না। নীচ থেকে আমি হাঁক দেওয়াতে ওপর থেকে সুশ্রুত মহারাজের গলা ভেসে এল, 'ওপরে উঠে আসুন।'

ওপরে উঠে তাঁর ঘরের কাছে পৌঁছলাম আমি। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

আমাকে নিয়ে তিনি তাঁর ঘর পেরিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকলেন। সে ঘরে ঢুকেই আমি বুঝতে পারলাম সেটা তাঁর আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুত করার ঘর। সারা দেওয়াল জুড়ে নানা ধরনের শিশি-বোতল। ওষুধ তৈরির পাথরের খোল, তামার পাত্র, হামানদিস্তা, এসব নানা জিনিস রাখা আছে। ওষধির তীব্র গন্ধ খেলা করছে ঘরের বাতাসে। আমাকে একটা টেবিলের সামনে দাঁড় করালেন তিনি। সেখানে টেবিলের ওপর একটা স্ট্যান্ডে চোঙাকৃতি ছোট একটা পাত্র বসানো। চোঙের নীচের দিক থেকে একটা ধাতব নল গিয়ে মিশেছে একটা কাচের পাত্রে। স্ট্যান্ডের নীচে বসানো আছে একটা বুনসেন বার্নার। যা দিয়ে চোঙাকৃতি পাত্রটাকে গরম করা হয়। টেবিলে বেশ কয়েকটা ছোট পাত্রে নানা ধরনের শুকনো গাছ-গাছড়া-বীজ এসবও রাখা। সেগুলো দেখিয়ে সুশ্রুত মহারাজ বললেন, এই যে সব ভেষজ উপাদান দেখছেন এসব চোঙার মধ্যে আর একটা জিনিসের সঙ্গে ঢেলে পাত্রটা গরম করলেই তেল বেরিয়ে এসে জমা হবে কাচের পাত্রর মধ্যে। তারপর শিশিতে ভরে সেই আশ্চর্য মলমাস তেল আপনার হাতে দেব।'

তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, 'তেলটা তবে এখনও তৈরি হয়নি! কতক্ষণ লাগবে তৈরি হতে? আমি অপেক্ষা করব?' সুশ্রুত এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমার সব প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। শুধু একটা জিনিস সংগ্রহ করা বাকি। সেটাই আসল জিনিস। আশা করি সেটা আজ রাতের মধ্যেই সংগ্রহ করতে পারব। কাল আপনার হাতে তেলের শিশি তুলে দিতে পারব মনে হয়।'

'আবারও একটা দিন?' একটু মনোক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম আমি।

সুশ্রুত বললেন, 'এ সব জিনিষ চট করে হয় না। আপনাকে ব্যাপারটা বোঝানো যাবে না। কাল জিনিসটা হয়ে গেলে অথবা যদি আজকেই হয়ে যায় তবে সেটা নিতে আসার জন্য আপনাকে খবর পাঠাব আমি। তখন আসবেন। এবার আপনি আসুন।' সুশ্রুত মহারাজ এ কথা বলার পর অগত্যা তাঁর বাড়ি থেকে আমি ধর্মশালাতে ফিরে এলাম।

কাশীর দ্রষ্টব্যগুলো মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। কাজেই আর বাইরে ঘোরার প্রয়োজন নেই। সঙ্গে কয়েক প্যাকেট তাস নিয়ে গেছিলাম। ধর্মশালাতে ফিরে সেগুলো দিয়ে হাত সাফাইয়ের খেলা প্র্যাকটিস করে সময় কাটিয়ে দুপুরের খাওয়া খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার যখন ঘুম ভাঙল সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। ঘুম ভাঙার পর আমার মনে হল লছমীলালজিকে একবার ফোন করা দরকার। মলমাস তেল পেতে যে আরও অন্তত একটা দিন দেরি হবে সেটা তাঁকে জানানো দরকার। অর্থাৎ আমার ফিরতে আরও একটা দিন দেরি হবে।

সন্ধ্যা নাগাদ লছমীলালজিকে ফোন করার জন্য ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে টেলিফোন বুথে গেলাম। তবে এদিন লছমীলালজির বদলে ফোন ধরল লছমীজির গদিরই আমার পরিচিত একজন। তার থেকে ভয়ংকর একটা খবর পেলাম আমি, লছমীলালজি হঠাৎই মারাত্মক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে সংজ্ঞাহীন অবস্থা। ডাক্তাররা তিনি আর চোখ মেলবেন কিনা সে ব্যাপারে কোনো কথা দিতে পারছেন না! তবে জ্ঞান হারাবার আগে তিনি বারবার আমার নাম করছিলেন। আমি যেন যথাসম্ভব দ্রুত কলকাতাতে ফিরে আসি। সম্ভব হলে রাতের ট্রেন ধরি!

টেলিফোনে খবরটা পাবার পর ধর্মশালাতে ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম আমার কী করা উচিত? তেলটা হাতে পাবার জন্য অপেক্ষা করব? নাকি আজ রাতের গাড়ি ধরেই কলকাতায় রওনা হব? টাইমটেবিলে লেখা আছে রাত বারোটাতে একটা ট্রেন আছে। ভাবতে লাগলাম আমি। ঘড়ির কাটা এগিয়ে চলল। রাত আটটা নাগাদ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি সুশ্রুত মহারাজের বাড়ি যাব। তেলটা যদি বানানো হয়ে থাকে তবে সেটা নিয়ে রাতের গাড়ি ধরব। খুব বেশি দেরি করলে কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে সকালের প্রথম গাড়ি ধরব। আর সুশ্রুত মহারাজ যদি তেল দিতে না পারেন তবে টাকাটা ফেরত নেবার চেষ্টা করব। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেননি তিনি। এটা তাঁরই দোষ। আমার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সুটকেসে সব গুছিয়ে নিয়ে ধর্মশালার পাওনা মিটিয়ে সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির উদ্দেশে আমি রওনা হলাম।

।।৬।।

রাস্তা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে তখন। ঝাঁপ বন্ধ করতে শুরু করেছে দোকানিরা। সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির দিকের রাস্তা তো আরও নির্জন। একজন লোকও সেদিকের রাস্তায় নেই। শুধু কিছুটা তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টগুলো শুধু ক্ষয়াটে আলো ছড়াচ্ছে। তবে আকাশে চাঁদ উঠেছে। বেশ বড় গোল চাঁদ। সম্ভবত পূর্ণিমা। আমার বাক্সটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে সেই নির্জন ঘাটের কাছে পৌছলাম। চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে ঘাটের নিঃসঙ্গ সিঁড়িগুলোতে। ঘাট অতিক্রম করে সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির গলিতে ঢুকলাম। বিশাল বিশাল বাড়িগুলো কেমন যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে! কোনো আলো নেই, শব্দ নেই বাড়ির ভিতরগুলোতে। আমি এসে দাঁড়ালাম সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির সামনে। তার বাড়ি থেকেও কোনো শব্দ বা আলো আসছে না। সদর দরজা খুলতে গিয়ে বুঝতে পারলাম সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিতে দিতে আমি ডাকতে লাগলাম, 'সুশ্রুত মহারাজ আছেন?'

দরজা ধাক্কাবার শব্দ আর আমার কণ্ঠস্বর যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল প্রাচীন বাড়িগুলোর গায়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পর যেন দরজার ওপাশে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম। আর এরপরই দরজাটা খুললেন সুশ্রুত মহারাজ। আমাকে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এত রাতে কি ব্যাপার?' চাঁদের আলোতে বেশ অসন্তোষের ভাব তাঁর চোখে-মুখে।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তেলটা কি হয়েছে?'

তিনি এবার স্পষ্টত রুক্ষভাবেই বললেন, 'বলেছি তো সেটা তৈরি হলে আপনাকে খবর দেব, এ সব জিনিস পেতে হলে এত তাড়াহুড়ো করলে চলে না। এমনও হতে পারে আপনাকে আরও তিনদিন অপেক্ষা করতে হল। এখন আপনি আসুন।'

আমি তাঁর কথা শুনে বললাম, 'দেখুন আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। লছমীলালজী হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আমাকে আজ রাতের ট্রেন অথবা কাল ভোরের ট্রেন ধরতেই হবে।'

সুশ্রুত কথাটা শুনে বললেন, 'তা আমি কি করব?'

আমি বললাম, 'আমাকে তবে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিন। আমি চলে যাব।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'টাকা ফেরত দেব কেন? আমিতো বলিনি যে আপনাকে তেল দেব না। আপনি অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন না। টাকা ফেরত হবে না।'

এবার তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে আমার মেজাজটাও ভিতরে ভিতরে বেশ গরম হয়ে গেল। তবুও নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রেখে বললাম, 'দেখুন, আপনি নিজেই কথার খেলাপ করেছেন। তেলটা আজকেই আমাকে আপনার দেওয়ার কথা ছিল। সেইমতো আমি লছমীলালজীকে জানিয়েও ছিলাম যে তেল নিয়ে আজকের গাড়িতে কলকাতা রওনা হব। কাজেই দোষটা আপনার।'— এ পর্য্যন্ত বলে আমাকে একটু থামতে হল, কারণ রাস্তা দিয়ে একটা ঠকঠক শব্দ কানে এলো। আমি দেখতে পেলাম লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পুলিশের একজন পাহারাদার আসছে। আর তাকে দেখেই একটা মোক্ষম বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথাতে। আমি বললাম, 'দেখুন, আপনি যদি টাকাটা ফেরত না দেন তবে আমি মীমাংসার জন্য লোক ডাকতে বাধ্য হব।'

কথাটা শুনে যেন মৃদু চমকে উঠে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন সুশ্রুত মহারাজ। আমার চোয়ালও তখন কঠিন। আমিও স্থির দৃষ্টিতে তাঁর চোখে চোখ রাখলাম। লাঠির শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটা সুশ্রুত মহারাজও খেয়াল করলেন। তিনি এবার ঠান্ডা গলায় বললেন, 'ঠিক আছে ভিতরে আসুন। কাল সকালের মধ্যে আপনাকে তেলটা দেবার চেষ্টা করছি।'

ভিতরে ঢুকলাম আমি। সুশ্রুত মহারাজ ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে বললেন, 'একটু দাঁড়ান আমি আসছি।'

চাঁদের আলোতে শান বাঁধানো উঠানের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি সিড়ির উল্টোদিকে বারান্দার একটা ঘরের তালা চাবি দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকলেন। মিনিট খানেকের মধ্যেই তিনি সে ঘর থেকে বাইরে এসে বললেন, 'চলুন, ওপরে চলুন।'

তাঁর কথা শুনে আমি বারান্দাতে উঠে তাঁর পিছন পিছন সিঁড়ির দিকে এগোলাম। সিঁড়ির ঠিক মুখে পৌঁছে সুশ্রুত মহারাজ তখন সিঁড়িতে পা রাখতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা জিনিস ধরা দিল আমার সতর্ক চোখে। কোথা থেকে যেন ঠিক সেই সময়ই এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছিল সুশ্রুতের গায়ে। সেই আলোতেই সুশ্রুতের কোমরের কাছে পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক মুহূর্তের জন্য একটা জিনিসকে উঁকি দিতে দেখলাম। পকেটে রাখা একটা জিনিসের সামান্য অংশ। অন্য কেউ হলে হয়তো চিনতেই পারত না, কিন্তু আমি ঠিক চিনে ফেললাম। একটা পিস্তলের বাঁট! সুশ্রুত মহারাজের মতলবটা কী? আমার মনে হল এই পিস্তলটা আনার জন্যই তিনি ঘরটাতে ঢুকেছিলেন। সতর্ক হয়ে গেলাম আমি। আমার মন বলল, কিছু যেন একটা ঘটতে চলেছে! অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সুশ্রুত মহারাজের পিছনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম আমি। দোতলাতে উঠে এলাম। কেউ কোথাও নেই। কোনো আলো জ্বলছে না। তবে চাঁদের আলো খেলা করছে বারান্দাতে। সুশ্রুত তাঁর বসার ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দরজা খুলে বাতি জ্বালালেন। ক্ষয়াটে হলদেটে একটা বাতি। দু-একটা চেয়ার

রাখা আছে সে ঘরে। তিনি আমাকে বললেন, রাতটা আপনি এ ঘরে কাটান। ভোরবেলা আমি আসব। পুরোনো দিনের বাড়ি। রাতে সাপখোপের আনাগোনা হয় অনেক সময়। বাইরে বেরোবেন না। আর আমি মলমাস তেল তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকব। যা কথা হবে ভোরবেলা হবে। তেল যদি বানাতে না পারি আমার কাছে যে এক শিশি অন্যের জন্য বানানো আছে সেটাই আপনাকে দিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

সুশ্রুত মহারাজ দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। আমি ভাবতে লাগলাম সুশ্রুত মহারাজের আসল মতলবটা কী? তার পকেটে পিস্তল কেন? আমাকে মারার কোনো পরিকল্পনা নেই তো তাঁর? তিনি যে অবস্থা বেগতিক দেখে আমাকে তার বাড়ির ভিতরে আনলেন তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি আমার। তেলটা কি তিনি আমাকে সত্যি দেবেন, নাকি তার অন্য কোনো মতলব আছে? ঘড়িতে দেখলাম রাত ন'টা বাজে। সতর্ক থাকতে হবে। রাতে ঘুমালে চলবে না। সারারাত জেগে কাটাতে হবে আমাকে। পকেট থেকে তাস বার করে তাসের খেলা প্র্যাকটিস করতে লাগলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটল এভাবে। হঠাৎ আমার সতর্ক কানে দরজার বাইরে একটা অস্পষ্ট শব্দ ধরা দিল। আমি আড়চোখে তাকালাম সেদিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। সেখানে প্রথমে উদয় হল বনমালীর মুখ। তারপর তার দেহটা। বনমালীর হাতে এবার ছোটো নয়, বেশ বড় একটা পাথর। সেটা ছুঁড়লে নিশ্চয়ই আমার মাথা ফেটে যাবে! ছেলেটা সে কাজ করার জন্যই হাতটা তুলতে যাচ্ছিল। আর ঠিক তখনই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে দরজা ছেড়ে পালাবার জন্য ছুটল। আমি যখন দরজার বাইরে আসলাম তখন দেখতে পেলাম বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে সম্ভবত ছাদের দিকে উঠে গেল। ব্যাপারটা কী আমাকে বুঝতে হবে। আমিও বারান্দা দিয়ে এগোলাম ছেলেটাকে যদি ধরা যায় সে জন্য। খেয়াল করলাম সুশ্রুত মহারাজের বসার ঘর আর তার ওষুধ প্রস্তুত করার ঘর, দুটো ঘরের দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ। তিনতলার ছাদের দিকে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম আমি। ছাদের মুখে পৌঁছে আমি অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ পেয়ে ছাদের ঠিক মুখে দরজার পাল্লার আড়ালে থেকে ছাদে তাকালাম। বিরাট ছাদটাতে একটা চিলেকোঠা মতো ঘর আছে আমার সিঁড়ির মুখ থেকে কুড়ি-পঁচিশ হাত তফাতে। তার সামনে চাঁদের আলোতে নিজেদের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়ে আছেন সুশ্রুত মহারাজ ও মাখনলাল। মাখনের হাতে সেই ছড়িটা ধরা। কাঠ, পাথরের টুকরো ইত্যাদি নানা আবর্জনা ছড়িয়ে আছে ছাদময়। মাখনলাল বলল, 'আমার টাকাটা দিয়ে দিন আমি কালকেই ফিরে যাব। ছেলেটা আর মোটেও থাকতে চাচ্ছে না। আমি সুস্থ হয়ে ওঠার পর ওই টাকাটার জন্য দু-মাস ধরে আটকে আছি।'

সুশ্রুত মহারাজ বললেন, 'টাকা তো তোমাকে দেবই বলেছি। তার সঙ্গে আরও পাঁচ হাজার দেব এবারের জন্য।' আমি শুনতে লাগলাম তাদের কথোপকথন।

সুশ্রুতের কথার জবাবে মাখনলাল বলল, 'কেন আমাকে তিনদিন ধরে চাপ দিচ্ছেন? আমি তো বারবার করে বলছি ব্যাপারটাতে আমি রাজি নই। আমার টাকা মিটিয়ে দিন আমি চলে যাই।'

সুশ্রুত বললেন, 'আর একবার মাত্র। এক মাসের মধ্যেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। পুরো টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরবে।'

মাখনলাল বলল, 'যদি রামদাসের মতো আমার অবস্থা হয় তখন? আমি যদি মারা যাই?'

সুশ্রুত বললেন, 'রামদাস আমার কথা শুনে চলেনি। তাছাড়া ওর মধুমেহ রোগ ছিল সেটা সে আমাকে বলেনি। তুমি তো ঠিক সুস্থ হয়ে উঠেওছিলে, হওনি?'

মাখনলাল বলল, 'একবার হয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয়বার নাও হতে পারি। আমি আর ব্যাপারটাতে রাজি নই। টাকা মিটিয়ে দিন, বাড়ি ফিরে যাই।'

মাখনলালের কথা শুনে সুশ্রুত বললেন, 'পাগলামী কোরো না। রাত বয়ে যাচ্ছে। যে তেলটা নিতে এসেছে সে কাল ভোরের পর আর থাকতে রাজি নয়। নইলে অতগুলো টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে। তাতে তোমারও ক্ষতি আমারও ক্ষতি। নীচে চলো। আমার অন্য সব প্রস্তুতি সারা। সকালের মধ্যেই তবে তার হাতে তেলের শিশিটা তুলে দিতে পারব।'

মাখনলাল এবার বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'না, আমি আর কিছুতেই রাজি নই। লোকটার সাথে কী বোঝাপড়া করবেন সেটা আপনার ব্যাপার?'

সুশ্রুত মহারাজও উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, 'যেতে তোমাকে হবেই। নইলে বাপ-ছেলে দুজনের কেউ বাঁচবে না। আজ দুজনকে মেরে গঙ্গাতে ভাসিয়ে দেব।'

মাখনলাল বলল, 'তাই? দেখি আপনি কাজটা কেমনভাবে করেন। আপনি এমন কিছু করার চেষ্টা করতে পারেন তা আমি আন্দাজ করেছিলাম। তাই এই ছড়িটা এনেছিলাম। এই বলে মাখনলাল ছড়িটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে ছড়ির হাতল ধরে টান দিতেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল হাত দেড়েক লম্বা একটা তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা। চাঁদের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠল সেটা। গুপ্তি। লাঠির মধ্যে লুকানো গোপন অস্ত্র।

গুপ্তিটা বাগিয়ে ধরে মাখনলাল বলল, 'আপনি আমার টাকা এবার মিটিয়ে দিন, আমি এখনই ছেলে নিয়ে চলে যাব। টাকা দিন।'

গুপ্তিটা মাখনলাল বার করতে সুশ্রুত মহারাজ প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু এরপরই তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে মাখনলালের দিকে তাগ করে বললেন, ওটা হাত থেকে ফেলে দাও। নইলে এখনই গুলি করে মারব।'

মাখনলাল গুপ্তিটা বাগিয়ে ধরে বলল, 'না, ফেলব না।'

সুশ্রুত মহারাজ হিংস্রভাবে বললেন, 'শেষ বারের মতো বলছি ওটা ফেলবে কি না?'

মাখনলাল মৃদু কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'না, ফেলব না। আমার টাকা দিয়ে দিন।'

সুশ্রুত আর বাক্যব্যয় করলেন না তার সাথে। মাখনলালকে লক্ষ্য করে পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিলেন। খন করে একটা শব্দ হল। কিন্তু গুলি বেরোল না। আবারও মাখনলালকে লক্ষ্য করে পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিলেন সুশ্রুত। কিন্তু এবারও শুধু ধাতব একটা শব্দ হল। গুলি বেরোল না। মৃদু বিস্মিত ভাব ফুটে উঠল সুশ্রুত মহারাজের মুখে। তবে তিনি দমবার পাত্র নন। চাঁদের আলোতে তার চোখ মুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে তিনি মাটি থেকে একটা টুকরো তুলে নিয়ে এগোলেন মাখনলালের দিকে। মাখনলালের হাতে সেই গুপ্তি আর সুশ্রুত মহারাজের হাতে চেয়ার বা টেবিলের ভাঙা পায়ার মতো কাঠ। পরস্পরের দিকে চোখ রেখে দুজনেই দুজনকে আঘাত হানার জন্য পাক খেতে লাগলেন. তবে সুশ্রুত মহারাজের তুলনায় মোটাসোটা প্রচন্ড ভুঁড়িঅলা মাখনলালের নড়াচড়ার ভঙ্গি অনেকটা শ্লথ। আর সে ব্যাপারটাকেই কাজে লাগালেন

সুশ্রুত। হঠাৎই তিনি ক্ষিপ্র গতিতে মাখনলালের পিছনে চলে গিয়ে কাঠের টুকরোটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলেন মাখনলালের গুপ্তি ধরা বাহুতে। গুপ্তিটা মাখনলালের হাত থেকে খসে পড়ল। আর সেও তার ভারী শরীরটা নিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। সুশ্রুত সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে লৌহ শলাকাটা তুলে নিলেন। তারপর সেটা কিছুটা তফাতে মাটিতে পড়ে থাকা মাখনলালের শরীরে বিঁধিয়ে দেবার জন্য। মাখনলালের কাছে গিয়ে তিনি অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরলেন আঘাত হানার জন্য। উত্তেজনার বশে আমি কখন যে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে ছাদে নেমে পড়েছি তার খেয়াল নেই। সুশ্রুত মহারাজ মাটিতে পড়ে থাকা মাখনলালকে খুন করতে যাচ্ছেন দেখে নিজের অজান্তেই আমার গলা দিয়ে যেন একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। শলাকাটা মাখনলালের শরীরে বিঁধিয়ে দিতে গিয়েও সেই চিৎকার শুনে আমার দিকে ফিরে তাকালেন সুশ্রুত। তার চোখের দৃষ্টি যেন আরও হিংস্র হয়ে উঠল এবার। তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাকেও শেষ করব এরপর। তোমাকে ফিরতে দেওয়া যাবে না।'

কথাটা বলে তিনি প্রথমে মাখনলালের ওপর আঘাত হানতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সে সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে কী যেন একটা উড়ে এসে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল সুশ্রুত মহারাজের মাথায়। বেশ জোরে একটা শব্দ হল। আর তারপরই কাটা কলা গাছের মতো মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেলেন। তার স্থির হয়ে যাওয়া দেখে বুঝতে পারলাম তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। রক্ত বেরোচ্ছে তার মাথা থেকে। মাখনলাল এবার হামাগুড়ি দিয়ে এসে মহারাজের হাত থেকে খসে পড়া গুপ্তিটা তুলে নিয়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছাদের অন্ধকার একটা কোণা থেকে বনমালী ছুটে এসে বাবার পাশে দাঁড়াল। এবার তাদের দু-জনের দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। গুপ্তিটা তুলে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে মাখনলাল আমার উদ্দেশ্যে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'সরে যান। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে রক্তারক্তি হবে।'

আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম, 'আমি বাধা দেব কেন? আমি তো আপনার শত্রু নই।' ততক্ষণে যেন আমি সুশ্রুত মহারাজ আর মাখনলালের কথা শুনে তেল তৈরির রহস্যটা আবছা আবছা অনুমান করে ফেলেছি।'

মাখনলাল আমার কথাটা ঠিক বিশ্বাস না করতে পেরে বলল, 'চালাকি করবেন না। আপনি তো তেল নিতে এসেছেন।'

বনমালী মাটি থেকে সেই বড় পাথরের টুকরোটা আবার কুড়িয়ে নিল যা দিয়ে সে আঘাত হেনেছে সুশ্রুত মহারাজের মাথায়। আমি মাখনলালের কথার জবাবে বললাম, 'না। আমি আপনার শত্রু নই। আমি না থাকলে আপনি এতক্ষণে মারা পড়তেন।' এই বলে আমি পকেট থেকে পিস্তলের বুলেট দুটো বার করে হাতের তালুতে মেলে ধরলাম। সুশ্রুত মহারাজের পকেটে পিস্তল দেখে আমার মনে হয়েছিল তাঁর মতলব ভালো না। তাই আমার গুরু হংসরাজের শেখানো আমার হাতসাফাই বিদ্যা প্রয়োগ করেছিলাম। ম্যাজিশিয়ান সত্যচরণের হাত। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় সুশ্রুত মহারাজের পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে তার থেকে গুলি দুটো বার করে ফাঁকা পিস্তলটা আবার তার পকেটে পুরে দিয়েছিলাম। এ জন্যই গুলি বেরোয়নি পিস্তল থেকে।

গুলি দুটো দেখে এবার মাখনলাল আশ্বস্ত হল। মাটিতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন সুশ্রুত মহারাজ। সেদিকে তাকিয়ে মাখনলাল বলল 'আমাদের এখনই পালাতে হবে। ও জেগে উঠলে সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। আর আপনিও পালান। হয়তো আপনাকেও ও ছাড়বে না।

আমি বললাম, 'তবে একসঙ্গেই স্টেশনে যাই। তার আগে আমার বাক্সটা নিতে হবে।' ছাদ ছেড়ে সিঁড়ির দিকে এগোলাম আমরা তিনজন। নামতে নামতে আমি মাখনলালকে তেল তৈরির ব্যাপারে আমার অনুমানের কথাটা জানাতেই সে বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি। বনমালী আপনার আসার কারণটা আন্দাজ করেছিল। আমাকে যাতে দুরবস্থায় পড়তে না হয়, যাতে আমাদের এখানে আর থাকতে না হয় সে জন্য আপনাকেও পাথর ছুড়ে তাড়াবার চেষ্টা করত। আমি অবশ্য কাজটা ওকে করতে বলিনি। আপনি ওকে ক্ষমা করবেন।'

দোতলাতে নেমে আমি যে ঘরে বসেছিলাম সে ঘরে ঢুকে বাক্সটা নিয়ে বেরোবার সময় খেয়াল হল একবার দেখি যে আমার দেওয়া টাকাটা সুশ্রুত মহারাজের টেবিলের ড্রয়ারেই রাখা আছে কিনা?

আমি যখন সে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি তখন সে ঘর থেকে বেরোচ্ছে মাখনলাল আর বনমালী। সে আমাকে বলল, 'কিছু নেবার থাকলে তাড়াতাড়ি নিন।'

আমি ঘরে ঢুকে টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে টাকাটা পেয়ে গেলাম। ঘর থেকে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। তারপর নীচে নেমে সুশ্রুত মহারাজের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে তিনজন প্রায় ছুটতে শুরু করলাম স্টেশনের দিকে। এগোতে এগোতে মাখনলাল বলল, 'এখানে আসার পর টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেছিল। একদিন ওই নির্জন ঘাটটাতে বসে আছি তখনই সুশ্রুত মহারাজের খপ্পরে পড়লাম। তিনি প্রথমে কাছেই তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিলেন। ঘি, মাখন আর বিশেষ ধরনের ঘোল খাইয়ে আমাকে মোটা করলেন। তারপর আসল কথাটা পাড়লেন।

বোঝানো কথা আর টাকার লোভে আমিও রাজি হয়ে গেছিলাম সেই বীভৎস ব্যাপারটাতে। কিন্তু আমি সুস্থ হবার পরও তিনি টাকা মেটাচ্ছিলেন না। কাজেই রয়ে যেতে হয়েছিল আমাকে। কেন আমি রাজি হয়েছিলাম ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয় আমার। আমার অবস্থাও ওই রামদাসের মতো হতে পারত। দ্বিতীয়বারের জন্য আমি তাই কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না।'

কথা বলতে বলতে মণিকর্ণিকা ঘাটের সামনে পৌঁছলাম আমরা। ঘটনাচক্রে সেখানে একটা ট্রেকার পেয়ে গেলাম আমরা। সে গাড়ি ধরে সোজা স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। কোনোরকমে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। মাখনলাল আর তার ছেলের টিকিটও আমিই কেটে দিলাম। প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই দেখি কলকাতা ফেরার ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি জেনারেল কম্পার্টমেন্টের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্য এল মাখনলাল আর বনমালীও। এবার বিদায় নেবার পালা। মাখনলাল তার পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বার করল। তেল ভর্তি শিশি। সেটা সে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার মলমাস তেল। যেটা অন্য একজনকে দেবে বলে সুশ্রুত মহারাজ বানিয়ে রেখেছিলেন। অনেক আশা নিয়ে আপনি তেলটা নিতে এসেছিলেন। গুলি বার করে আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাই দিলাম। আসার সময় সুশ্রুত মহারাজের দেরাজ থেকে বার করে এনেছি।'

শিশিটা হাতে নিয়ে বেশ অবাক হয়ে গেলাম আমি। বুঝলাম এই গরিব বাঙালি ব্রাহ্মণকে ঠকানো উচিত হবে না। আমি লছমীলালের দেওয়া টাকার বান্ডিল দুটো বার করে এগিয়ে দিলাম তার দিকে। একটু ইতস্তত করে টাকাটা নিয়ে মাখনলাল বলল 'এ টাকাটা হয়তো রামদাসের প্রাপ্য ছিল। তবে আমার ব্যাপারেও কিন্তু মিথ্যা বলিনি। এই বলে মাখনলাল তার ফতুয়াটা কয়েক মুহূর্তের জন্য ওপরে তুলে ফেলল। আমি তাকালাম

সেদিকে। আর ঠিক তখনই মাখনলালের গাড়ির ঘোষণা হল মাইকে। অন্য একটা প্লাটফর্মে তার গাড়ি আসছে। আর সেই ঘোষণা শোনা মাত্রই মাখনলাল 'চলি' বলে ছেলের হাত ধরে ভুঁড়ি দুলিয়ে ছুটল টেন ধরার জন্য। আমিও ট্রেনে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ট্রেনও ছাড়ল। একদিন পর আমি কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। লছমীলালকে কিন্তু মলমাস তেলের শিশিটা আমার দেওয়া হল না। আমি যেদিন কলকাতা পৌঁছলাম তার আগের দিনই প্রয়াত হয়েছেন লছমীলাল। শিশিটা আমার কাছেই রয়ে গেল।''

গল্প শেষ হল জাদুকর সত্যচরণের। আলোটাও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। টেবিলের ওপর রাখা শিশিটার দিকে তাকিয়ে সত্যচরণ বললেন, 'এই হল সেই শিশি। সুশ্রুত মহারাজের মলমাস তেলের শিশি। জিনিসটা কিন্তু অব্যর্থ জিনিস মশাই। পরিচিত যাদের দিয়েছি, নিমেষে তাদের ব্যথা যন্ত্রণা ভ্যানিশ হয়েছে।'

শিশিটার দিকে তাকিয়ে চন্দন বলল, 'আপনার গল্পে একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট হল না। সুশ্রুত মহারাজ কোন ব্যাপারে দ্বিতীয় বারের জন্য মাখনলালকে জোর করে রাজি করবার চেষ্টা করছিলেন।'

প্রশ্ন শুনে একটু চুপ করে থেকে সত্যচরণ বললেন, 'মাখনলাল তার ফতুয়া তুলে আমাকে কি দেখিয়েছিল জানেন? তার থলথলে পেটের একপাশে একটা কাটা দাগ। চর্বি কেটে নেওয়ার দাগ। খাঁটি মলমাস তেল তৈরি হয় জ্যান্ত মানুষের টাটকা চর্বি দিয়ে। তার সঙ্গে আরও নানা জিনিস মিশিয়ে আগুনে গলানো যেটা বেরিয়ে আসে সেটাই খাঁটি মলমাস তেল। বাতের ব্যথা-বেদনার অব্যর্থ ওষুধ।'

কথাটা শুনে চন্দন শিশিটার দিকে তাকাল। শিশির নীচে যেটা রয়েছে সেটা তবে গলানো চর্বি! মানুষের তেল। চন্দন যেন কল্পনাতে দেখতে পেল সত্যচরণের দেখা সুশ্রুত মহারাজের সেই তেল বানানোর পাত্রটাকে। বুনসেন বার্নার দিয়ে পাত্রর মধ্যে লালচে একখণ্ড চর্বি গলানো হচ্ছে। মানুষের চর্বি! দৃশ্যটা কল্পনা করতেই চন্দনের শরীরের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল!

জাদুকর সত্যচরণ বললেন 'নিন, পায়ে কয়েকফোঁটা মলমাস তেল মেখে নিন।'

চেয়ার ছেড়ে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চন্দন বলল, 'না, থাক। ব্যথাটা এখন অনেক কম মনে হচ্ছে। এবার আমাকে যেতে হবে।'

জাদুকর সত্যচরণ একটু বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'তবে যান। আপনার ফোন নম্বরটা একটু দিয়ে যান। মাঝে মাঝে ফোন করব কিন্তু।'

চন্দন ফোন নম্বরটা বলল, 'একটা কাগজে যেটা লিখে নিলেন সত্যচরণ।

এরপর সে ঘর থেকে বাড়ির বাইরে পর্যন্ত চন্দনকে এগিয়ে দিলেন সত্যচরণ। রাস্তায় আলো জ্বলে গেছে। বৃষ্টিও নেই। রাস্তায় পা রেখে চন্দন হেসে বলল, 'এবার আসছি।'

জাদুকর সত্যচরণ বললেন, 'সাবধানে যাবেন। তবে তেলটা কয়েকফোঁটা লাগিয়ে যেতে পারতেন। মানুষের চর্বির খাঁটি মলমাস তেল। বেতো খোঁড়া এ তেল মেখে রেসের মাঠে নামে। আবার আসবেন। নতুন গল্প শোনাব।'

তার কথা শুনে 'আচ্ছা' বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বড় রাস্তার দিকে এগোল চন্দন।

ড্রাগনের ডিম

ঢেউতোলা ঢালু ছাদওয়ালা বিরাট তোরণটাই যেন নিজেই একটা প্রাসাদের মতো। তার আড়ালে রয়েছে প্রাকারবেষ্টিত এক প্রাচীন নগরী। তোরণের ঠিক মাথায় টাঙানো রয়েছে কমিউনিস্ট চীনের রূপকার 'মাও-জে-দং' বা 'মাও-সে-তুং'-এর ছবি। যদিও তোরণের ওপাশে যে প্রাচীন নগরী রয়েছে তা চৈনিক রাজতন্ত্রের ঐতিহ্যেরই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তোরণের বাইরে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে দীপাঞ্জনকে প্রফেসর জুয়ান বললেন, 'আমরা যে নগরীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, এ নগরীকে বলা হয় 'নিষিদ্ধ নগরী'। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ফরবিডন সিটি'—ভুলে-যাওয়া নগরী। প্রায় ছ'শো বছর আগে চীনের 'মিং' বংশের রাজারা প্রাকারবেষ্টিত এই নগরী নির্মাণ করেন তাদের নিজস্ব বাসস্থান হিসাবে। সম্রাট, রাজপুরুষ আর তাদের নিজস্ব লোকজন ছাড়া এ নগরীতে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল। বিনা অনুমতিতে কেউ এই তোরণ অতিক্রম করলে তার মৃত্যুদন্ড হতো। তাই এই নগরীর নাম হয় 'নিষিদ্ধ নগরী'। সাধারণ মানুষের লোকচক্ষুর আড়ালে প্রতিপালিত হতো এ-নগরীর জীবনযাত্রা। নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো প্রাকারবেষ্টিত এ নগরীর জীবনযাত্রার কথা একসময় লোকে ভুলেই গেছিল। তাই এর নাম 'ফরবিডন সিটি'—ভুলে যাওয়া নগরী। দীপাঞ্জন বলল, 'প্রাণচঞ্চল আধুনিক বেজিং শহরের মধ্যে এমন একটা প্রাচীন নগরীর আজও টিকে থাকা সত্যিই অদ্ভুত! চলুন এবার ভিতরে যাবার জন্য এগোনো যাক। শুনেছি এ নগরী নাকি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর অন্তর্গত অন্যতম প্রাচীন শহর, যেখানে স্থাপত্যগুলো মোটামুটি আজও অক্ষুন্ন আছে।'

চারটে প্রবেশ তোরণ আছে এই নিষিদ্ধ নগরীতে প্রবেশ করার জন্য। তার মধ্যে এই 'মেরিডিয়ান গেট' বা 'মাধ্যাহ্নিক তোরণ'-ই প্রধান। সূর্য যখন মধ্যাহ্নে অবস্থান করে তখন নগরীর দক্ষিণ-পূর্বের ওই তোরণের মাথার ওপর হলুদ বর্ণের বিশাল ঢালু ছাউনিটা সোনার বর্ণ ধারণ করে, আলোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই তোরণ।

ট্যুরিস্টদের দীর্ঘ লাইন তোরণের সামনে। তাতে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপাঞ্জন আর জুয়ান। নানা দেশের পর্যটকদের ভিড় লাইনে। যারা চীনে দীপাঞ্জনদের মতো বেড়াতে আসে তারা চীনের 'গ্রেট ওয়াল' দেখার পাশাপাশি এই নিষিদ্ধ নগরীও দেখতে আসে। বেশ কয়েক দশক আগে পর্যন্ত এই পুরোনো স্থাপত্য পর্যটকদের কাছেও নিষিদ্ধ ছিল।

একপ্রস্থ সিকিউরিটি চেকের পর প্রফেসর জুয়ান আর দীপাঞ্জন তোরণ অতিক্রম করে প্রাসাদনগরীর ভিতরে প্রবেশ করল। সামনে একটা বিশাল পাথুরে চত্বর। সেটা চলে গেছে বিশাল একটা প্রাসাদের দিকে। কাছে-দূরে যেদিকেই চোখ যায় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে কাঠ আর পাথরের তৈরি ছোট-বড় নানা স্থাপত্য। তাদের ঢেউ খেলানো হলুদ রঙের ঢালু ছাদে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যকিরণ। প্রতিটা স্তম্ভ, দেওয়াল আর কার্নিশের গায়ে উজ্জ্বল রঙে আঁকা আছে লাল অলংকরণ, কাঠ বা পাথরের অদ্ভুতদর্শন নানা প্রাণীর মূর্তি, বিশেষত ড্রাগনের মূর্তি। টিকিটের সাথে যে গাইড বুকলেটটা দেওয়া হয়েছে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল দীপাঞ্জনরা। তাতে লেখা আছে, ১৪০৬ থেকে ১৪২০ সালের মধ্যে তৈরি হয় ওই রহস্যময় নিষিদ্ধ নগরী। সাত লক্ষ কুড়ি হাজার বর্গ মিটার এর আয়তন। নয়শো আশিটা ভবন আছে পাঁচশো বছরের প্রাচীন এই শহরে। রাজপ্রাসাদে একটা সংগ্রহশালা

বা মিউজিয়াম আছে। সেই মিউজিয়াম আর অন্য ভবন মিলিয়ে প্রায় দশলক্ষ প্রাচীন বস্তুর সংগ্রহ আছে এখানে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'এত বড় জায়গা আমরা কীভাবে দেখা শুরু করব?'

বুকলেটের মধ্যে একটা গাইড ম্যাপও আছে। সেটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জুয়ান বললেন, 'আমাদের তো কোনও তাড়া নেই। ঘুরতে-ঘুরতে প্রথমেই রাজপ্রাসাদ আর মিউজিয়ামটা দেখি। তারপর নগরীর অন্য অংশগুলো ঘুরে দেখব।'

চারপাশ দেখতে-দেখতে দীপাঞ্জনরা এগোতে লাগল। অসংখ্য ট্যুরিস্টের ভিড়। কিন্তু তবুও চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা চীনা স্থাপত্যের ঘরবাড়িগুলোকে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। কত রহস্য যে ওই প্রাচীন স্থাপত্যের আড়ালে লুকোনো আছে কে জানে! ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্য এই প্রাচীন নগরীর প্রাচীন বেশে সজ্জিত হয়ে নানা জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু লোক। তাদের পরনে লম্বা ঝুলের রংচঙে সিল্কের পোশাক। পায়ে চ্যাপ্টা শুঁড়তোলা হাঁটু-পর্যন্ত ঢাকা পাদুকা। রেশমের কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে চামড়ার ওপর রুপো আর জরির কাজ-করা তলোয়ারের খাপ। মাথায় টুপি আর মুখমন্ডলে ছুঁচালো গোঁফ, যা এসে মিশেছে চিবুকের দাড়ির সাথে। যেন ছবির বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে এই মানুষগুলো।

রাজপ্রাসাদটা দেখা যাচ্ছিল দূর থেকেই। স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রাসাদ-নগরীর সবচেয়ে বড় প্রাসাদ যেটা তার সামনে শ্বেতপাথরে মোড়া, কারুকাজ-করা রেলিং আর মূর্তি-শোভিত ফুটবল মাঠের মতো বিরাট প্রাঙ্গণ। রাজাদের আমলে সেখানে নানা উৎসবে সমবেত হতো নগরীর বাসিন্দারা। ট্যুরিস্টদের ভিড় থিকথিক করছে যে জায়গাতে, সেই ভিড়ে মিশে দীপাঞ্জনরা হাজির হল প্রাসাদের সামনে। এই প্রাসাদ থেকেই একসময় সুবিশাল চীনা সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো। এ-প্রাসাদ আজ মিউজিয়াম। প্রাসাদের বহির্গাত্রে সোনারুপোর গিল্টি, অলংকরণ। তোরণের স্তম্ভের গায়ে রয়েছে চৈনিক রাজবংশের প্রতীক 'সোনার ড্রাগন'। সিকিউরিটির লোক ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। বহু অমূল্য অ্যান্টিক আছে এ প্রাসাদে। আরও একপ্রস্থ সিকিউরিটি চেকিং-এর পর অন্য ট্যুরিস্টদের সাথে তারা পা রাখল বিশাল প্রাসাদ মিউজিয়ামের অন্তঃপুরে। এক হাজার কক্ষ আছে এ-প্রাসাদে। ভূগর্ভস্থ কক্ষও নাকি আছে। তবে মাটির ওপরের কিছু কক্ষই শুধু ট্যুরিস্টদের জন্য উন্মুক্ত। এ-প্রাসাদ যেন সোনার তৈরি। চারপাশেই শুধু সোনা। তারা প্রথমে উপস্থিত হল দরবার কক্ষে। হল-ঘরের মতো বিশাল কক্ষটার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত পুরোটাই সোনা বা সোনার অলংকরণে মোড়া। আর অবশ্যম্ভাবীভাবে সেখানে রয়েছে মিং রাজবংশের প্রতীক সোনার ড্রাগন মূর্তি। জুয়ান দরবার-কক্ষটা দেখতে-দেখতে বললেন, 'আমি ইউরোপের অনেক দেশ ঘুরেছি, তুমিও ঘুরেছো। ইউরোপীয়রা তাদের যেসব সম্পদ নিয়ে গর্ব অনুভব করে তা অধিকাংশই প্রাচ্য থেকে লুণ্ঠিত। নিজস্ব সম্পদ বলতে যা বোঝায়, বৈভব বলতে যা বোঝায়, তা প্রাচ্যের সম্রাটদের তুলনায় ইউরোপীয়দের কিছুই ছিল না। বাকিংহাম প্যালেসের দরবার-কক্ষের জৌলুস ম্লান হয়ে যাবে এই দরবার কক্ষের কাছে। তাও তো অতি মূল্যবান সামগ্রীগুলো নিশ্চই এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সরকারি তোষাখানায় রাখা হয়েছে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'ঠিক তাই। আমার দেশের কোহিনূর মণি নিয়ে গিয়ে রানির মুকুটের শোভাবর্ধন করেছে ব্রিটিশরা। বলেছি হায়দরাবাদের নিজামের কোশাগারে এতো মুক্তো ছিল যে তা দিয়ে নাকি লন্ডনের পিকাডালি সার্কাস প্রাঙ্গণ ঢেকে দেওয়া যেত। পাশ্চাত্যের

বৈভব আসলে প্রাচ্যের দান। অথচ সাদা চামড়ার লোক দেখলেই এখনও অনেকে মাথা ঝোঁকায়।'

মিউজিয়ামের অন্য ঘরগুলো এবার এক এক করে দেখা শুরু করল দীপাঞ্জনরা। তার কোথাও রয়েছে চৈনিক সম্রাটের স্বর্ণখচিত সিংহাসন, সোনার কাজ-করা রাজপুরুষদের পরিধেয়, অস্ত্রশস্ত্র, কোথাও রয়েছে মিং আমলের বিখ্যাত পোর্সেলিনের ফুলদানি, বাসনপত্র, মূর্তি, আর নানা আকৃতির নানা ভঙ্গিমার সোনা-রুপোর ড্রাগন মূর্তির ছড়াছড়ি। প্রফেসর জুয়ান বললেন, 'খেয়াল করে দেখো যে, যেসব জিনিস সোনার নয়, তার মধ্যে কিন্তু হলুদ বর্ণের আধিপত্য আছে। আসলে সোনালি বর্ণ বা হলুদ রং ছিল চীনা রাজবংশের আভিজাত্যের প্রতীক। রাজা এবং অভিজাতরা স্বর্ণখচিত পোশাক পরে আসতেন রাজদরবারে। বাকিরা পরতেন হলুদ বর্ণের পোশাক। নইলে নাকি রাজদরবারে তো বটেই, এ-প্রাসাদেও প্রবেশের অনুমতি মিলতো না নগরবাসীদের। তাই সর্বত্র এই হলুদ রঙের ব্যবহার।'

ঘন্টাতিনেক সময় লাগল দীপাঞ্জনদের এই প্রাসাদ মিউজিয়াম খুঁটিয়ে দেখতে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল তারা। দীপাঞ্জন আর জুয়ান একে-একে অন্য স্থাপত্যগুলোও দেখা শুরু করল। দেখার যেন কোনও শেষ নেই। এ-নগরীর বাসিন্দারা সবাই রাজকার্যে নিয়োজিত থাকত। তাদের কেউ ছিলেন সভাসদ, সৈনাধ্যক্ষের মতো অভিজাত ব্যক্তি, আবার কেউ ছিলেন নর্তকী, রক্ষী বা ভৃত্য সম্প্রদায়ের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্য এ-নগরীতে গড়ে উঠেছিল তাদের পদমর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন আকারের বাসস্থান। তবে ছোট হোক বা বড় হোক, সব বাসস্থান বা গৃহগুলোই ছিল নগর স্থাপত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই ধরনের স্থাপত্য, দেওয়ালগুলোর বহির্গাত্রে নানা কারুকাজ, মাথার ওপর ঢেউ-খেলানো সোনালি বর্ণের ছাদ। রাজনির্দেশেই নির্মিত হয়েছিল এ-নগরীর প্রতিটা ভবন, উপাসনালয়। শুধু প্রাসাদই নয়, কৃত্রিম পাহাড় আর নদীও রচিত হয়েছিল নগরীতে।

ঘুরতে-ঘুরতে জুয়ান বললেন, 'কিছু অদ্ভুত মানুষও নাকি বাস করতেন এই নগরীতে। তাঁরা কেউ অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন সন্ন্যাসী, কেউ জাদুকর, কেউ-বা অ্যানফাসিস্ট। নানা গুপ্তবিদ্যার চর্চাও এই প্রাচীন নগরীতে হতো রাজ অনুগ্রহে। এমনকি সোনা তৈরির পদ্ধতিও নাকি জানা ছিল এ-শহরের কোনও কোনও লোকের। আর এসব ব্যাপারের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্যই নাকি আমজনতার প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ ছিল।'

বেশ অনেকক্ষণ ঘোরার পর একটা বেঞ্চে এসে বসল তারা। এ-জায়গাটাতে ট্যুরিস্টদের তেমন ভিড় নেই। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে ছোট-ছোট বাড়ি। এ-বাড়িগুলো প্রাচীন, এবং অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য স্থাপত্যগুলোর সঙ্গে। দীপাঞ্জন চারপাশের ঘরবাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ-জায়গাগুলোতে সম্ভবত রাজাদের ভৃত্যশ্রেণির লোকেরা বসবাস করত।'

জুয়ান বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

কথা বলছিল জুয়ানরা। এমন সময় একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। মাথায় টুপি, গলা থেকে একটা বেতের ঝুড়ি ঝুলছে। তাতে রাখা সেরামিকের তৈরি ছোট-ছোট খেলনা, ফুলদানি, মূর্তি ইত্যাদি। দীপাঞ্জনদের সামনে এসে সে বলল, 'খেলনা নেবে? মূর্তি নেবে? ভালো পুতুল নেবে? তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, মিং রাজাদের প্রতীক ছিল ড্রাগন? এ-মূর্তি বাড়ি নিয়ে যাও তোমাদের সৌভাগ্য বাড়বে। সৌভাগ্যের প্রতীক এই সোনার ড্রাগন।'

ট্যুরিস্টদের কাছে খেলনা বিক্রি করতে হয় বলে ইংরাজি জানে ছেলেটা। পেটের দায়ে খেলনা ফেরি করছে। এর মধ্যেই খেলনা বিক্রি করার জন্য পেশাদারী ঢং শিখে নিয়েছে।

এরপর সে বাস্কেট থেকে একটা ছোট ফুলদানি নিয়ে মাটিতে ফেলল। ঠং করে শব্দ হলেও সেটা ভাঙল না। মাটি থেকে ফুলদানিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে বলল, 'হার্ড সেরামিক। খুব শক্ত। নেবেন? যা নেবেন সব মাত্র পাঁচ ইয়েন করে।'

দীপাঞ্জন জুয়ানকে বলল, 'কিছু নেবেন নাকি?'

জুয়ান বললেন, 'একটা করে ড্রাগন-মূর্তি নেওয়া যেতে পারে। সৌভাগ্য ফেরানোর জন্য না-হলেও এ-জায়গার স্মৃতি হিসাবে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'দুটো ড্রাগন মূর্তি দাও।'

খুশি হল ছেলেটা। ইঞ্চি চারেক লম্বা দুটো ড্রাগন মূর্তি সে তুলে দিল জুয়ানের হাতে। খুব সুন্দর মূর্তিগুলো।

দীপাঞ্জন তাকে টাকা দেবার পর লম্বা বেঞ্চটার এক কোণে বসল ছেলেটা। ঝুড়িটা গলা থেকে নামিয়ে রেখে ঢোলা পাজামার পকেট থেকে একটা পাউরুটি বের করে খেতে শুরু করল।

দীপাঞ্জনরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল। জুয়ান বললেন, 'এসব জায়গাতে যদি রাতে থাকা যেত তবে বেশ একটা অন্যরকম অনুভূতি লাভ করা যেত।'

দীপাঞ্জন বলল, 'ঠিক তাই। আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু সিকিউরিটির লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের সে অনুমতি দেবে না। আর দিলেই-বা থাকতাম কোথায়।'

জুয়ান হেসে বললেন, 'সে না-হয় এখানেই কোনও প্রাসাদের ভিতর শুয়ে পড়া যেত।'

কথা বলতে লাগল তারা। বাচ্চা ছেলেটা এরপর তার জিনিসপত্র নিয়ে উঠে চলে গেল।

।।২।।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর জুয়ান বললেন, 'চলো এবার ওঠা যাক। নিষিদ্ধনগরীর বাকি প্রাসাদগুলো দেখি। তবে একদিনে মনে হয় পুরো শহরটা দেখা হবে না।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, চলুন। তবে আজ পুরোটা না দেখা হলে কাল আবার আসা যেতে পারে। আমরা তো এ দেশে বেড়াতেই এসেছি। অন্য কাজের চাপ তো নেই।'

কথাগুলো বলে বেঞ্চ থেকে উঠতে যাচ্ছিল দীপাঞ্জন। কিন্তু লম্বা কাঠের বেঞ্চের অন্য প্রান্ত থেকে একটা জিনিস গড়িয়ে এলো তার কাছে। একটা ডিমের মতো দেখতে জিনিস। দীপাঞ্জন তো প্রথমে সেটাকে রাজহাঁসের ডিম ভেবেছিল। একটু অবাক হয়ে জিনিসটা হাতে তুলে নিল সে। আর সেটা হাতে নিয়েই দীপাঞ্জন বুঝতে পারল সেটাও সেরামিকের তৈরি। ভালো করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেটা দেখল দীপাঞ্জন। না, সেটার মধ্যে কোনও প্যাঁচ বা ছিদ্র নেই। নিরেট বলে মনে হয়। তবে জিনিসটা মনে হয় বেশ পুরোনো। তবে ডিম্বাকৃতি সেই বস্তুর সাদা রঙের উজ্জ্বলতা আর তেমন নেই। দীপাঞ্জন জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখার পর প্রফেসর জুয়ানের হাতে দিল। তিনিও সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'জিনিসটা খুব অদ্ভুত, কিন্তু কী এটা?'

দীপাঞ্জন বলল, 'যাই হোক-না কেন, এটা মনে হয় ওই বাচ্চা ছেলেটার কাছেই ছিল। গড়িয়ে চলে এসেছে আমার কাছে।'

দীপাঞ্জনের কথা শেষ হতে-না-হতেই তারা দেখল সামনের বাড়িগুলোর গোলোকধাঁধা থেকে ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে আসছে ছেলেটা। সে আগে কী করে দেখার জন্য প্রফেসর তার কোটের পকেটে জিনিসটা পুরে হাত দিয়ে পকেটটা আড়াল করে ফেললেন। ছেলেটা সোজা ছুটে এল তাদের কাছে। প্রথমে সে বেঞ্চের যে প্রান্তে বসেছিল, সেখানে তাকিয়ে নীচু হয়ে বেঞ্চের তলাটা দেখতে লাগল। ডিমটা যে ছেলেটারই তা বুঝতে আর অসুবিধা হল না দীপাঞ্জনদের। প্রফেসর এবার তার পকেট থেকে অদ্ভুত জিনিসটা বার করে সেটা ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি কি এটা খুঁজছো?'

জিনিসটা দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ। সে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ এটাই খুঁজছি।' —এই বলে সে জুয়ানের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে সম্ভবত তা অক্ষত আছে কিনা দেখতে লাগল।

দীপাঞ্জন ছেলেটাকে প্রশ্ন করল, 'এটা কী?'

ছেলেটা জবাব দিল, 'ড্রাগনের ডিম।'

কথাটা শুনে দীপাঞ্জন হেসে বলল, 'তুমি ড্রাগনের ডিম বিক্রি করো বুঝি?'

ছেলেটা ডিমটাকে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে প্রথমে বলল, 'না, এটা বিক্রির জিনিস নয়। ভাগ্যিস তোমরা জিনিসটা ফিরিয়ে দিলে। নইলে অনর্থ হতো। ঠাকুর্দা আমাকে আস্ত রাখতো না।'

তারপর বলল সে, 'আচ্ছা তোমরা কি এখানে ঘর ভাড়া নেবে? তোমরা আলোচনা করছিলে। আর সেটাই কানে আসাতে আমি ঠাকুর্দাকে খবরটা দিতে গেছিলাম। কখন যে ডিমটা পকেট থেকে রুটি বার করার সময় বাইরে বেরিয়ে পড়েছে বুঝতে পারিনি। ঠাকুর্দার সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি ডিমটা নেই! সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম এখানে।'

ছেলেটার কথা শুনে জুয়ান জানতে চাইলেন, 'তোমার ঠাকুর্দা কি ঘর ভাড়া দেন? কোথায় তোমার বাড়ি?'

ছেলেটা প্রথমে জবাব দিল, 'না, দেয় না। কিন্তু তার একটু টাকার দরকার তাই লোক খুঁজছেন। অনেক সময় অনেক ট্যুরিস্ট এখানে থাকতে চায়। এই শহরের ভিতর যারা থাকে তারা অতিথি হিসাবে থাকতে দিলে তবেই থাকা যায়। দাদু রাজি আছেন। একশো ইয়েন করে ভাড়া লাগবে।'

তারপর সে কাছেই একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ওর পিছনেই আমাদের বাড়ি।'

একশো ইয়েন, যা ভারতীয় মুদ্রায় হাজার টাকার কিছু বেশি। দীপাঞ্জন জুয়ানকে বলল, 'একবার দেখবেন নাকি?'

জুয়ান বললেন, 'চলো, দেখা যেতে পারে। ভালো লাগলে থাকাও যেতে পারে।'

দীপাঞ্জনরা এরপর ছেলেটার সাথে পা বাড়ালেন বাড়িটা দেখতে যাওয়ার জন্য। হাঁটতে-হাঁটতে দীপাঞ্জন ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী? তুমি পড়াশোনা করো না?'

ছেলেটা জবাব দিল, ‘আমার নাম ওয়াং। হ্যাঁ পড়াশোনা করি। তবে দাদুর শরীরটা ক’দিন ভালো না। কাজে বেরোতে পারছিলেন না। তাই আমি ফেরি করতে বেরিয়েছিলাম।’

পাথর আর কাঠের তৈরি প্রাচীন বাড়িঘর সব। অনেক বাড়িঘরের দেওয়ালেই এখনও ড্রাগন-মূর্তি আঁকা আছে। যদিও সময়ের ভারে তার সোনালি উজ্জ্বলতা অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। যে বাড়িটা ছেলেটা চত্বর থেকে দেখিয়ে ছিল, সে-বাড়িটার গা ঘেঁষে একটা গলিতে ঢুকলো দীপাঞ্জনরা। চারপাশে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে আছে আরও অনেক ক’টা বাড়ি। কেমন যেন গোলকধাঁধার মতো জায়গাটা। তবে কোনও লোকজন আছে বলে মনে হয় না। বেশ কয়েকটা ছোট গলি এঁকেবেঁকে পেরিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওয়াং। মাঝারি আকৃতির একটা বাড়ি। ঢালু ঢেউখেলানো কাঠের ছাদ অন্য বাড়িগুলোর মতোই। বাড়ির বারান্দার এক কোণে একটা চিনা লণ্ঠন ঝুলছে। ওয়াং সেই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ডিমের ব্যাপারটা দাদুকে বোলো না কিন্তু। আমি তাকে ডাকছি।’ এই বলে চিনা ভাষায় হাঁক দিল ওয়াং।

একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন সেই হাঁক শুনে। মাথার চুল, দাড়ি সব সাদা। পরনে ফুলছাপ লম্বা ঝুলের শাটিনের পোশাক। হাতে লাঠি। দীপাঞ্জনের মনে হয় লোকটার বয়স অন্তত আশির ওপরে হবে।’

দীপাঞ্জনদের দেখার পর লোকটা বলল, ‘ওয়াং বলল আপনারা ঘর ভাড়া খুঁজছেন। থাকতে পারেন এখানে। তবে তার আগে আপনাদের পরিচয়টা জানা দরকার।’

প্রফেসর জুয়ান তার আর দীপাঞ্জনের পরিচয় দিলেন। লোকটা বলল, ‘আমার নাম ঝাং। দেখুন ঘর পছন্দ হয় কি না। তবে বাড়িতে কিন্তু বিদ্যুৎ নেই, লণ্ঠনই ভরসা।’

বৃদ্ধ ঝাং-এর সাথে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল দীপাঞ্জনরা। সঙ্গে ওয়াং-ও। বেশ কয়েকটা ঘর বাড়িতে। তবে মলিনতার ছাপ স্পষ্ট। বাড়িটাতে ঢুকেই ওয়াং অন্যদিকে চলে গেল। বৃদ্ধ ঝাং তাদের নিয়ে প্রবেশ করলেন একটা ঘরে। সাধারণ একটা ঘর। কাঠের চৌকির মতো একটা শোবার জায়গা। দুটো কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল। তার ওপর সেরামিকের তৈরি কিছু প্লেট-বাটি ইত্যাদি বাসন রাখা আছে। আর ঘরের কোণে রাখা আছে একটা কুঁজো। বিবর্ণ হলেও ঘর এবং বাড়িটা বেশ পরিচ্ছন্ন। ঝাং বললেন, ভাড়াটা নিশ্চয়ই ওয়াং আপনাদের বলেছে। একশো ইয়ান লাগবে। ভাড়াটা আপনাদের একটু বেশি মনে হলেও আপানাদের দায়িত্ব তো আমাদের নিতে হবে। ধরে নিন এই একশো ইয়েনের মধ্যে ওটা যোগ করা আছে।’

জুয়ান বললেন, ‘দায়িত্ব নিতে হবে মানে?’

ঝাং বললেন, ‘এখানে সরকারিভাবে ভাড়া দেবার নিয়ম নেই। যে কারণে ভাড়ার রশিদ দেওয়া হয় না। সরকারি খাতায় আপনারা এ-বাড়িতে আমার অতিথি হিসাবে থাকতে পারেন। তবে নাগাড়ে তিনদিনের বেশি নয়। শুধু আপনারা বিদেশি বলে নয়। আমরা যে, ক’জন এখন এই পুরানো শহরে বাস করছি তারা ছাড়া এ-দেশের অন্য লোকের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। আর অতিথি হিসাবে থাকার সময় আপনারা যদি এই পুরোনো শহরের কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেন, তার পুরো দায়িত্ব আমার থাকবে। কোথাও একটা টালিও যদি ভাঙেন বা দেওয়ালের গায়ে কিছু যদি লেখেনও, তার জন্য আপনাদের আগে আমাকে জেলে যেতে হবে। আপনাদের আচরণের সব দায়িত্বই আমার।’

জুয়ান বৃদ্ধের কথা শুনে হেসে বললেন, 'সে দায়িত্ব সম্ভবত আমাদের ক্ষেত্রে নিতে হবে না। এ-জায়গার মর্ম আমরা বুঝি।'

বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, 'তবে কি থাকবেন আপনারা?'

দীপাঞ্জনদের লাগেজ বেডিং-এর হোটেলে থাকলেও তাদের কিট ব্যাগে এক সেট করে জামাকাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস থাকে। কাজেই তাদের হোটেলে না ফিরলেও চলে। ঘরটা মোটামুটি পছন্দ হয়েছে তাদের। তাই নিজেদের মধ্যে সামান্য আলোচনা সেরে নিয়ে তারা বৃদ্ধকে জানালো যে তারা আগ্রহী।

ঝাং বললেন, 'তবে এখানকার সরকারি দপ্তরে অনুমতিপত্র নিতে যেতে হবে আমাদের। অবশ্য এখনও যাওয়া যায়। পরেও যাওয়া যায়। বিকাল চারটের মধ্যে গেলেই হল।'

ঘড়ি দেখল দীপাঞ্জনরা। দুপুর একটা বাজে। জুয়ান বললেন, 'কাজটা বরং এখনই মিটিয়ে দেওয়া যাক। তারপর এখানে ফিরে এসে বিশ্রাম নিয়ে বিকালে আবার বাইরে যাব।'

বৃদ্ধ বলল, 'তাহলে একটু দাঁড়ান। আমি আমার কাগজপত্র বার করি। সেগুলো নিয়ে আমাকে আপনাদের সাথে যেতে হবে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, আসুন। আমরা বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছি।'

ঝাং অন্য ঘরে চলে গেলেন। আর দীপাঞ্জনরা বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঝাং ছেলেটাকে চিনা ভাষায় বকাবকি করতে-করতে বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। তার হাতে রোল-করা একতাড়া কাগজ। বকুনি খেয়ে ছেলেটা বারান্দার এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল। আর বৃদ্ধ লাঠি ভর দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল। দীপাঞ্জনরা এগোল তার সাথে-সাথে। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বৃদ্ধ গজগজ করতে-করতে বললেন, 'একদম মানুষ হল না ছেলেটা। কোনও কথা শোনে না আমার। আমি যখন থাকবো না তখন মজা টের পাবে।'

হাঁটতে-হাঁটতে জুয়ান জানতে চাইল, 'এ-বাড়িতে আপনি আর ওয়াং ছাড়া আর কে কে থাকেন?'

ঝাং বললেন, 'কে আর থাকবে! ওয়াং-এর বাবা-মা তো তাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দুজনেই চোখ বুজলো। আমি যেদিন চোখ বুজবো সেদিন ও জানবে এ-পৃথিবী কেমন!'

দীপাঞ্জনরা বুঝতে পারল, 'কোনও কারণে ওয়াং-এর ওপর চটে গেছেন বৃদ্ধ।'

এ-প্রসঙ্গে আর কোনও কথা না-বলে দীপাঞ্জন জানতে চাইল, 'আপনি এখানে কবে থেকে আছেন?'

ঝাং জবাব দিল, 'আমার জন্ম তো এ-জায়গাতেই। অন্তত বারো-চোদ্দো পুরুষ ধরে আমরা এখানে আছি। বলতে গেলে এই শহর তৈরি হবার কিছুকাল পর থেকেই।'

জুয়ান জানতে চাইলেন, 'আপনার পূর্বপুরুষরা কী করতেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'সম্রাটদের ভৃত্যের কাজ করতেন। প্রথমে মিং সম্রাটদের? তারপর বাইং সম্রাটদের। তখন সম্রাটদের ভৃত্য মানে বিরাট ব্যাপার ছিল। সবাই সমাদর করতো। তারপর ধীরে-ধীরে একদিন সব শেষ হয়ে গেল...।'

দীপাঞ্জন প্রশ্ন করল, 'আপনি কী করেন?'

ঝাং জবাব দিলেন, 'এক সময় সেরামিকের খেলনা-পুতুল ইত্যাদি বানাতাম। এখন বয়স হয়েছে। বানাতে পারি না। কিনে ফেরি করি।'

নানা কথা বলতে-বলতে তারা পৌঁছে গেল একটা বাড়িতে। সরকারি দপ্তর সেটা। সেখানে ঢোকার আগে ঝাং বললেন, 'ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে আমি ভাড়া দিচ্ছি কি না? আপনারা বলবেন এখানে বেড়াতে-বেড়াতে আমার সাথে আপনাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমার অনুরোধে আপনারা থাকবেন আমার এখানে।'

বাড়িটার ভিতর ঢুকে সরকারি কর্মীদের সামনে হাজির হল সবাই। প্রথমে ঝাং-এর সাথে চিনা ভাষায় কী সব কথাবার্তা হল সে লোকগুলোর। ঝাং-এর অনুমান মতোই সরকারি কর্মীরা জানতে চাইল যে ঘর ভাড়া নেওয়া হচ্ছে কি না। দীপাঞ্জন তাদের জানালো যে, না, তেমন কোনও ব্যাপার নয়। এরপর দীপাঞ্জনদের পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি কাগজপত্র পরীক্ষা করা হল, বেশ কয়েকটা ছাপানো কাগজে তিনজনকে সইও করতে হল। তারপর তাদের হাতে নিষিদ্ধ নগরীতে থাকার অনুমতিপত্র দেওয়া হল। এরপর টেলিফোন বুথ থেকে হোটেলে ফোন করে দীপাঞ্জনরা জানিয়ে দিল যে তারা আর হোটেলে ফিরছে না।

কাজকর্ম মিটিয়ে তারা যখন বাড়ি ফিরল তখন বেলা দু'টো বাজে।

।।৩।।

ঘণ্টা দুয়েকের বিশ্রাম নিয়ে আবার বাইরে বেরোনোর জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল তারা। বারান্দায় এসে তারা দেখতে পেল ওয়াং দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে দীপাঞ্জন হেসে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু তোমাকে বকছিলেন কেন?'

ওয়াং বলল, 'তাড়াহুড়োতে ডিমটা ঠিকমতো রাখতে পারিনি যে বেতের ঝুড়ির মধ্যে সেটা রাখা থাকে। তাছাড়া ঝুড়ির ডালাটাও ঠিকমতো বন্ধ করতে পারিনি। দাদু ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। তাই বকাবকি করছিলেন।'

দীপাঞ্জন বলল, 'দাদু যখন বারণ করেন, তখন দাদুর জিনিস নাও কেন?'

ওয়াং বলল, 'বা রে! দাদুই তো বলল ডিম থেকে ড্রাগনের ছানা ফোটার সময় হয়েছে। ড্রাগন নাকি তার ডিম ফেরত নিতে আসবে। কিন্তু তার আগেই যদি ছানা ফুটে যায়? পালিয়ে যায়? তাই ডিমটা নিয়ে আমি ঘুরছিলাম। এই যেমন তখন দাদু ঘুমাচ্ছেন, আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছি। ড্রাগনের ছানা বাইরে বেরোতে গেলেই খপ করে চেপে ধরব।'

দীপাঞ্জন হেসে বলল, 'আচ্ছা তুমি পাহারা দাও, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।'

বারান্দা থেকে নেমে গলিগুলো অতিক্রম করে আবার প্রাসাদ চত্বরে উপস্থিত হল দীপাঞ্জনরা। এই নিষিদ্ধনগরী দুটো অংশে ভাগ করা। রাজপ্রাসাদ আর তার চারপাশের কিছু অংশ নিয়েই 'ইনার কোর্ট'। বড় প্রাসাদগুলো সেখানেই, আর বাকি অংশটা 'আউটার কোর্ট'।

জুয়ান বললেন, 'গাইডবুকে লেখা আছে যে প্রাসাদ চত্বরে মিউজিয়ামগুলো চারটের সময় বন্ধ হয়ে যায়। এগুলো আবার কাল সকালে দেখব। চলো, আমরা আউটার

কোর্টটাই দেখি।'

সেইমতো অন্যদিকে হাঁটতে লাগল দীপাঞ্জনরা। যেদিকে তারা এগোল, সেদিকে বড় প্রাসাদ মিউজিয়াম নেই বলে অতিউৎসাহী ট্যুরিস্ট ছাড়া লোকজন খুব একটা আসে না। নিঃসঙ্গ প্রাচীন ঘরবাড়িগুলো দিনের শেষ আলোতে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে। থামের গায়ে সোনালি গিল্টির অলঙ্করণ খসে গেছে, ছাদের রংও বিবর্ণ হয়ে গেছে। চলতে-চলতে একটা ছোট চত্বরে উপস্থিত হল তারা। হঠাৎই একটা মাঝারি আকৃতির বাড়ির দিকে চোখ পড়তে তারা সে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। খুব পুরোনো একটা বাড়ি। তার চালের ওপর সারসার ড্রাগনের মূর্তি বসানো। আর বাড়ি বা ছোট্ট প্রাসাদটার সামনে বেদির ওপর পরপর পাঁচটা ড্রাগন মূর্তি আছে। একটা হলুদ রঙের ড্রাগন। আর তার দু'পাশে লাল, কালো, সবুজ, সাদা রঙের ড্রাগন মূর্তি। তাদের সাজপোশাক, শরীরের গঠনের কিছু-কিছু পার্থক্য থাকলেও মূর্তিগুলোর ভঙ্গি এত জীবন্ত যে মনে হয় এখনই তারা নড়ে উঠবে। বলতে গেলে ওই মূর্তিগুলোই বাড়িটার কাছে দীপাঞ্জনদের টেনে নিয়ে দাঁড় করালো। তবে এ-বাড়িটা পরিত্যক্ত বলেই মনে হল। কপাটহীন দরজার ভিতর জমাটবাঁধা অন্ধকার খেলা করছে।

জুয়ান বলল, 'মনে হচ্ছে এ-বাড়িটা উপাসনালয় গোছের কিছু ছিল। চারপাশে ড্রাগন মূর্তির কেমন ছড়াছড়ি দেখছ! আর কত রকমের কত ধরনের ড্রাগন!'

হঠাৎই বাড়িটার ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। আর তারপরই বাড়ির ভিতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। তাকে দেখে চাইনিজ বলেই মনে হল দীপাঞ্জনদের। মাঝবয়সী লোকটার পরনে কালো রঙের দামি স্যুট। হাতে একটা ছোট টর্চ। বাড়িটার বাইরে বেরিয়েই সামনে দীপাঞ্জনদের দেখতে পেয়ে একটু থতমত খেয়ে গেল লোকটা। তারপর হেসে বলল, 'ট্যুরিস্ট নিশ্চয়ই?'

জুয়ান হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

লোকটা বলল, 'মূল গেট থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছেন দেখছি। পাঁচটায় কিন্তু গেট বন্ধ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ফিরুন। নইলে আটকা পড়ে যাবেন।'

দীপাঞ্জন বলল, 'আমাদের সে সমস্যা নেই। আমরা রাতে এখানেই থাকব। অনুমতি নেওয়া হয়েছে। আসলে আমরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এ-জায়গা দেখতে চাই।' এ-কথা বলার পর দীপাঞ্জন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনার পরিচয়টা?'

লোকটা জবাব দিল, 'আমি একজন গবেষক। এই যে ড্রাগন মূর্তি দেখছেন, ড্রাগনের ছবি দেখছেন, তা নিয়ে আমি গবেষণা করছি। আমি সাংহাইতে থাকি। আমার নাম শাও-ফু।'

কথাটা শুনে প্রফেসর জুয়ান উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমি প্রফেসর জুয়ান। জাপানের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। আর আমার এই বন্ধু সেনও ইতিহাসের ব্যাপারে আগ্রহী।'

দীপাঞ্জনের নাম শুনে ভদ্রলোক মৃদু বিস্মিত ভাবে বললেন, 'শেন? কিন্তু আপনাকে দেখে তো চাইনিজ বলে মনে হচ্ছে না!'

দীপাঞ্জন বলল, 'আমি ভারতীয়। আমার নাম দীপাঞ্জন সেন। 'সেন' হল পদবি। প্রফেসর আমাকে 'শেন' বলে ডাকেন।'

জুয়ান এবার সামনের ড্রাগন মূর্তিগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে ওই ড্রাগন মূর্তিগুলোর তাৎপর্য একটু বুঝিয়ে দেবেন?

শাও বললেন, 'না-না, আপত্তির কী আছে, বুঝিয়ে বলছি।' এই বলে দীপাঞ্জনদের নিয়ে মূর্তিগুলোর একদম কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, মিং রাজবংশের সময়েই এই নগরী গড়ে ওঠে। ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের রাজত্ব ছিল। তারপর শিং বা চিং বংশের রাজারা ক্ষমতা দখল করেন। তারা কিন্তু আসলে ছিলেন মাঞ্চু। এই শহরের মতো এই ড্রাগন মূর্তিগুলোও তারাই নির্মাণ করান। পশ্চিমের সংস্কৃতিতে ড্রাগনকে নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর নরকের প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও চিনা সংস্কৃতিতে ড্রাগনের ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। ড্রাগনরা এখানে সৌভাগ্যের দেবতা বা প্রকৃতির নানা রূপ হিসাবে পূজিত হন। যেমন, সবুজ বা ডিলং ড্রাগন হল পৃথিবীর দেবতা, নীল বা জিয়াওলিং হল সমুদ্রের দেবতা, কালো বা শেনলং হল বৃষ্টির দেবতা, সাদা ড্রাগন হল সাপের দেবতা, লাল রঙের ড্রাগন হচ্ছে স্বর্গের দেবতা। আর সোনালি রঙের যে ড্রাগনগুলো দেখতে পাচ্ছেন তারা হল 'ড্রাগন কিং' বা ড্রাগনদের রাজা। চিনা সম্রাটদের এক সময় ড্রাগনদের অর্থাৎ দেবতার সন্তান বলে মনে করা হতো। ড্রাগনের ছবি আঁকা পোশাক, অলঙ্কার বা অন্য কোনও কিছু জিনিস একমাত্র তারাই ব্যবহার করতে পারতেন। সাধারণ জনগণের তা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল।' কথা শেষ করলেন ভদ্রলোক।

দীপাঞ্জন জানতে চাইল, 'এ-বাড়িটার ভিতর কী আছে?'

শাও জবাব দিলেন, 'এটা আসলে একসময় ড্রাগন কিংবা সোনালি বর্ণের ড্রাগনের মন্দির ছিল। বহু যুগ হল পরিত্যক্ত। তেমন কোনও জিনিসপত্র নেই ভিতরে। হ্যাঁ, দেওয়ালের গায়ে ড্রাগনের নানা প্রাচীন ছবি আছে। সেগুলো দেখতেই ভিতরে ঢুকেছিলাম, কিন্তু প্রাণ হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হল।'

জুয়ান জানতে চাইলেন, 'প্রাণ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো কেন?'

লোকটা বলল, 'ভিতরটা সাপের আড্ডা। ঘরগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ স্টিম ইঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়ার মতো একটা শব্দ কানে এলো, 'হি-স-সস!' শব্দ শুনে টর্চের আলো ফেলতেই দেখি একগাদা ডিম নিয়ে বসে আছে বিরাট বড় একটা সাপ! আমার ধারণা অন্তত হাত দশ-বারো লম্বা হবে সেটা। কিং কোবরা। কারণ টর্চের আলো পড়তে সে যখন তার অর্ধেক দেহ তুলে ফণা ধরে উঠে দাঁড়াল তখন তার উচ্চতাই অন্তত আমার বুক সমান হবে। কোনওরকমে তার চোখে আলো ফেলতে-ফেলতে পিছু হঠে দূরে সরে গেলাম। চোখে আলো পড়াতে প্রাণীটা তার কর্তব্য ঠিক করতে পারছিল না। তাই হয়তো বেঁচে গেলাম।'

জুয়ান হেসে বললেন, 'হয়তো-বা আপনার জন্য আমরাও বেঁচে গেলাম। আমরা তো এই প্রাচীন মন্দিরটার ভিতর ঢুকতে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে টর্চও নেই। ভয়ঙ্কর কান্ড হতে পারত!'

শাও বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো হতে পারত। এত বড় আর মোটা সাপ আমি দেখিনি। চারপাশে এত ড্রাগনের মূর্তি আর ছবি যে প্রাণীটাকে দেখলে কেউ ড্রাগন বলে ভাবতে পারে। একটা ড্রাগন যেন তার ডিম নিয়ে বসে আছে! ড্রাগনের ডিম!'

কথাটা শুনে দীপাঞ্জন বলল, 'ড্রাগনের ডিম কিন্তু আমরা দেখেছি।'

শাও জানতে চাইলেন, 'তার মানে? ড্রাগনের ডিম!'

জুয়ান হেসে বললেন, 'আমরা এখানে ঝাং নামের এক সেরামিকের খেলনা বিক্রেতার বাড়িতে উঠেছি। ওর নাতির কাছে সেরামিকের তৈরি একটা ডিমের মতো জিনিস দেখেছি। বাচ্চাটা বলল ওটা ''ড্রাগনের ডিম''।'

প্রথমে শাও একটু চুপ করে রইলেন, তারপর হেসে জানতে চাইলেন, 'আপনারা এখানে ক'দিন থাকবেন?'

দীপাঞ্জন বলল, 'এ-জায়গা তেমনভাবে দেখা হয়নি। কাল মিউজিয়াম দেখব। কালকের দিনটা তো আছি। তেমন হলে হয়তো আরও একটা দিন থেকে যেতে পারি। ভালো লাগার ওপর নির্ভর করছে।'

শাও বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো করে বেড়ান। তবে খুব পুরোনো জায়গা তো তাই একটু সাবধানে বেড়াবেন। এই যেমন আমি সাপের মুখে পড়েছিলাম। আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো। এবার আমাকে ফিরতে হবে ওদিকে।'

জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ, আমরাও ফিরব।'

।।৪।।

'ড্রাগন কিং'-এর সেই মন্দির চত্বর ছেড়ে দীপাঞ্জনরা রওনা হলো তাদের ঘরে ফেরার জন্য। হাঁটতে-হাঁটতে জুয়ান মিস্টার শাওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখানে কোথায় উঠেছেন? এখন কোথায় যাবেন?'

শাও জবাব দিলেন 'প্রবেশ তোরণের পাশেই সরকারী অতিথিনিবাসে। গবেষণার কাজে এসেছি বলে সুযোগ মিলেছে সেখানে থাকার।'

একসময় তাদের আস্তানার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেল দীপাঞ্জনরা। শাও বললেন, আমিও এবার অতিথিনিবাসে ফিরে যাব। কিন্তু ঠিক এইসময় কাছেই এক জায়গাতে একটা ছোটো ভিড় দেখা গেল। স্থানীয় বাচ্চা ছেলেদেরই ভিড়। দু-চারজন ট্যুরিস্টও আছে। দীপাঞ্জনদের মনে হলো সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেউ যেন কোনও খেলা দেখাচ্ছে। কৌতূহলবশত দীপাঞ্জনরা এগোলো সেদিকে। একটু ইতস্তত করে শাও-ও পা বাড়ালেন সে দিকে। হ্যাঁ, সেখানে খেলা দেখাচ্ছে এক চীনা যুবক, আর তাকে ঘিরে একটা ছোট বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে ছেলেরা ও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ট্যুরিস্ট। মার্শাল আর্টের খেলা। যে খেলা দেখাচ্ছে তার পরনে সিল্কের ঢোলা পাঞ্জাবীর মতো জামা আর পাজামা। কোমরের কাছটা একখন্ড চওড়া জরির কাপড় দিয়ে বাঁধা। কপালের সামনের দিকটা একটু কামানো ছেলেটার আর মাথার পিছন থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে একটা লম্বা বেণী। বৃত্তের মধ্যে অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে একটা চেন দিয়ে বাঁধা দুটো ছোটো লোহার দন্ড বা 'ন্যান-চা' ঘুরাচ্ছে সে। ব্রুস লি-র সিনেমাতে যেমন দেখা যায়। অবিশ্বাস্যভাবে সে ঘুরিয়ে চলেছে হাতের জিনিসটা, আর তার সাথে সাথে কখনও শূন্যে লাফিয়ে উঠে বনবন করে পাক খাচ্ছে আবার কখনও ডিগবাজি খাচ্ছে। অদ্ভুত শারীরিক দক্ষতা তার। যুবকটির খেলা দেখে কখনও-বা হাততালির ঝড় উঠছে, আবার কখনও খুচরো পয়সা উড়ে যাচ্ছে তার দিকে। দীপাঞ্জনরাও দেখতে লাগল তার খেলা। মার্শাল আর্টের এমন খেলা এর আগে সিনেমাতেই দেখেছে, চোখে দেখেনি তারা। দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতার অসাধারণ যুগলবন্দী। 'ন্যান-চা'-র খেলা শেষ হবার পর সে মাটি থেকে একটা

তলোয়ার উঠিয়ে নিল। বাঁকানো নয়, লম্বা সোজা চীনা তলোয়ার। তার খাপটা খুলে ফেলতেই দিন শেষের সূর্যালোক ঝিলিক দিয়ে উঠলো হাত তিনেক লম্বা ধারালো ব্লেডটা। কোমরবন্ধটা আর একটু শক্ত করে বেঁধে নিয়ে তলোয়ারের খেলা দেখাতে শুরু করল ছেলেটা। একটা বেশ বড় কচি বাঁশের টুকরো সে প্রথমে এক হাতে অদ্ভুত কৌশলে ছুঁড়ে দিল আকাশের দিকে। বাঁশটা একদম সোজাভাবে আবার নেমে এল, আর দু-হাতে তলোয়ার ধরে বাঁশটাকে লক্ষ করে অদ্ভুতভাবে তলোয়ার চালালো ছেলেটা। বাঁশটা যখন মাটিতে পড়ল তখন সেটা আর একটা টুকরো নয়, চার-পাঁচ টুকরো হয়ে গেছে। বাঁশটা শূন্যে থাকতেই তাকে শশা কাটার মতো টুকরো করে ফেলেছে খেলোয়ারের তলোয়ার। ঠুং-ঠাং করে এবার কয়েন পড়তে লাগল ছেলেটার চারপাশে। জুয়ানও পকেট থেকে একটা দশ ইয়েনের নোট বার করে ভিড়ের মধ্যে থেকে বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে মাথাটা একটু নমস্কারের ভঙ্গিতে ঝুঁকিয়ে হয়তো-বা জুয়ানের উদ্দেশেই তাকে খেলা দেখাবার জন্য তলোয়ার ঘোরাতে শুরু করল। নিজের শরীরের চারপাশে পাখার ব্লেডের মতো তলোয়ার ঘোরাচ্ছে ছেলেটা। যেভাবে সে তলোয়ার চালাচ্ছে সেটা যে শুধু অতি দক্ষতার ব্যাপার তাই নয়, বিপজ্জনকও বটে। সামান্য ভুলচুক হলেই আহত হবার সম্ভাবনা তার।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার সে ঘটনাটাই ঘটল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। হঠাৎই ঠং করে শব্দ তুলে মাটিতে ছিটকে পড়ল তলোয়ারটা। আর ছেলেটা তার বামবাহু চেপে ধরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই বুঝতে পারল আর এখন খেলা দেখাবে না সে। মুহূর্তর মধ্যে ভিড়টা ভেঙে গেল। দীপাঞ্জন দেখতে পেল তাদের পাশ ছেড়ে মিস্টার শাও পা বাড়িয়েছেন ফেরার জন্য।

একসময় ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু তারা তিনজন। সেই খেলোয়াড়, দীপাঞ্জন আর প্রফেসর জুয়ান। দীপাঞ্জনরা এবার খেয়াল করল ছেলেটার চেপে-ধরা জায়গা থেকে কনুই চুঁইয়ে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে মাটিতে। ব্যাপারটা দেখেই তাকে সাহায্য করার জন্য দীপাঞ্জন আর জুয়ান তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দীপাঞ্জন তার হাতটা ধরে বলল, ‘দেখি কী হয়েছে আপনার?’

চেপে ধরা জায়গা থেকে নিজের অন্য হাতটা সরিয়ে নিল খেলোয়াড়। কনুইয়ের ওপরের বাহুর কাছে সিল্কের পোশাকটা বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। আর তার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা ক্ষত। খুব গভীর না-হলেও তলোয়ারের খোঁচাতে অন্তত তিন ইঞ্চি চিরে গেছে জায়গাটা। রক্ত গড়াচ্ছে। দীপাঞ্জন আর জুয়ানকে ক্ষতটা দেখাবার পর সেই যুবক আবার সে জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, ‘খুব ধারালো তলোয়ার তো! খুব সামান্য ছোঁয়াতেই এ-ব্যাপারটা ঘটে গেল! আগে কোনওদিন এমন হয়নি আমার!’

জুয়ান বললেন, ‘কাছেই আমাদের থাকার জায়গা। আমরা ট্যুরিস্ট। আমাদের কাছে ব্যান্ডেজ-ওষুধ আছে। সঙ্গে চলো, রক্ত বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজ বাঁধা প্রয়োজন। তারপর ডাক্তারের কাছে যাও।’

কথাটা শুনে একটু ইতস্তত করে সেই যুবক বলল, ‘আচ্ছা চলুন।’

ছেলেটার পাশে একটা ঝোলা মতো ছিলো। দীপাঞ্জন ছেলেটার জিনিসপত্রগুলো ভরে ফেলল তাতে। তলোয়ারটাও সাবধানে খাপের ভিতর পুরে ফেলল। তারপর সেগুলো নিয়ে রওনা হল তাদের আস্তানার দিকে। ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে তাদের অনুসরণ করল খেলোয়াড়। গন্তব্যের দিকে এগোতে-এগোতে জুয়ান তার কাছে জানতে চাইল, ‘তুমি কি এখানেই থাকো? কী নাম তোমার?’

সে জবাব দিলো, 'আমার নাম 'তাও লি মিং। হ্যাঁ, আপাতত এখানেই আছি। পথে-পথে ঘুরে মার্শাল আর্টের খেলা দেখাই। আপনারা কোন দেশের মানুষ?'

জুয়ান নিজেদের নাম-পরিচয় দিলেন তাকে। সে হেসে বলল, 'তোমরা দুজনেই তবে আমার প্রতিবেশী দেশের মানুষ।' কথা বলতে-বলতেই তারা পৌঁছে গেল ঝাং-এর বাড়ির সামনে। বাড়ির বাইরে বারান্দা মতো জায়গাটাতে ওয়াং দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ছোট খাঁচার মধ্যে বেশ বড় আকারের দুটো সাদা ইঁদুর। জুয়ান প্রথমে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার দাদু কই?'

সে জবাব দিলো, 'বাড়িতেই তো ছিল। সে ঘুম থেকে ওঠার পর আমি বাইরে গেছিলাম ইঁদুর আনতে। আর তখন দেখছি দাদু নেই, দরজা বন্ধ করে কোথায় যেন বেরিয়েছে।'

তাও-কে বারান্দাতে দীপাঞ্জনের সাথে বসিয়ে রেখে জুয়ান বাড়ির ভিতর ঢুকলেন মেডিক্যাল কিটসটা আনার জন্য। তাও চীনাভাষায় কথা বলতে শুরু করল ওয়াং-এর সাথে। তাদের কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছেন না দীপাঞ্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই জুয়ান ফিরে এলেন ওষুধের ছোট ব্যগটা নিয়ে। তাও কে তিনি বললেন, 'তোমার জামাটা খুলে ফেল। ব্যান্ডেজ বাঁধতে সুবিধা হবে।'

কথাটা শুনে তাও একটু ইতস্তত করে বলল, 'খুলছি,তবে। একটু তাড়াতাড়ি করবেন যা করবার।'—এই বলে সে জামাটা খুলে ফেলল। আর তার সাথে-সাথেই একটা জিনিস চোখে পড়ল দীপাঞ্জনদের। তাওয়ের শরীরে একটা বিরাট উল্কি আঁকা আছে। ড্রাগনের ছবি। ড্রাগনের মুখটা তাও-এর বুকে আঁকা। আর তার দেহটা বুক থেকে নেমে বগলের নীচ দিয়ে পাঁজর ছুঁয়ে ঘুরে গিয়ে লেজটা তাওয়ের পিঠে গিয়ে সাপের ফণার মতো শেষ হয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে একটা ড্রাগন যেন সত্যিই তার নখরযুক্ত পা দিয়ে তাও-এর বুক আর পাঁজর আঁকড়ে ধরেছে। দীপাঞ্জন তা দেখে বলেই ফেলল, 'খুব সুন্দর উল্কি তো!'

কথাটা শুনে তাও প্রথমে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর উল্কি।' তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে একটু যেন ব্যস্ত হয়েই বলল, 'সূর্য ডুবে যাবে। একটু তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজটা বাঁধুন।'

জুয়ান ততক্ষণে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বার করে ফেলেছেন। প্রথমে ক্ষতস্থানটা জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ভালো করে মোছা হল। তারপর রক্ত বন্ধ করার জন্য পুরু করে মলম মাখিয়ে তাতে ব্যান্ডেজ জড়ানো হল। আর কাজটা শেষ হতেই গায়ে জামাটা দ্রুত পরে নিল তাও। ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজ যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ ওয়াং-এর সঙ্গে কিচিরমিচির করে কী যেন বলে চলল তাও। ব্যান্ডেজ করার পর জামা পরে উঠে দাঁড়াতেই ওয়াং তাওয়ের তলোয়ারটা মাটি থেকে তুলে নিল। আবারও কিচিরমিচির করে দুজনের মধ্যে কিছু কথা হল। তারপর ওয়াং হেসে তলোয়ারটা তাওয়ের হাতে তুলে দিলো, আর তাও-ও হেসে ওয়াং-এর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। যেন তাদের মধ্যে কোনও মজার কথা বিনিময় হল। তবে তাদের কথার মধ্যে 'ড্রাগন' কথাটা বেশ কয়েকবার ছিল।

দীপাঞ্জন তাওয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের ভাষাটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। নিশ্চয়ই কোনও মজার কথা হল?'

প্রশ্ন শুনে তাও হেসে বলল, 'ও বলল, ও বড় হয়ে আমার মতো খেলা দেখাবে, মার্শাল আর্ট শিখবে। আমি ওর কথা শুনে জানতে চাইলাম ওর সাহস আছে কিনা?

জবাবে ও বলল, আমাদের এখানে সবার থেকে ওর সাহস বেশি। সে এটা এখনই প্রমাণ করতে পারে। বড় হয়ে সে শুধু তলোয়ার-এর খেলাই নয়, জ্যান্ত একটা ড্রাগন নিয়ে খেলা দেখাবে। একটা ড্রাগনের বাচ্চা সে নাকি পেতে চলেছে।'

কথাটা শুনে দীপাঞ্জন আর জুয়ান বুঝতে পারল ওয়াং তার দাদুর মুখের গল্পটা সত্যিই বিশ্বাস করে বসে আছে। সে ভাবছে ওই সেরামিকের ডিম ফুটে সত্যিই ড্রাগনের ছানা বেরোবে। তাওয়ের কথা শুনে তাই দীপাঞ্জন আর জুয়ান দুজনেই হাসল ওয়াং-এর দিকে তাকিয়ে।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ নগরীর রাজপ্রাসাদের বিরাট চূড়ার আড়ালে সূর্য মুখ লুকোতে শুরু করেছে। ধীরে-ধীরে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামবে এই প্রাচীন নগরীর বুকে। সেদিকে একবার তাকিয়ে 'তাও-লি' দীপাঞ্জনদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই। অপরিচিত লোকের জন্য আপনারা অনেক কষ্ট করলেন। এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

তাওয়ের কথা শুনে জুয়ান বললেন, 'এটা সামান্য ব্যাপার। আমাদের কর্তব্য ছিল। কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো কিছু হয়নি। হ্যাঁ, যাও। তবে ডাক্তার দেখিও আর টিটেনাস নিও। আমরা যতটা জানি করলাম।'

কথাটা শুনে তাও হাসল। তারপর ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে হারিয়ে গেল দীপাঞ্জনদের চোখের আড়ালে।

তাও চলে যাবার পর দীপাঞ্জন মজা করে ওয়াংকে বলল, 'কালকের মধ্যেই যদি ডিমটা ফুটে যায় তবে বেশ ভালো। আমরা তবে ড্রাগনের ছানাটা দেখে যেতে পারব।'

ওয়াং বলল, 'দাদু বলেছে ড্রাগনের ছানা ফোটার সময় হয়েছে। কাল পূর্ণিমা, পূর্ণিমার রাতে নাকি ড্রাগনের ছানা ফোটে। সমস্যা হল কাল রাতে নাকি ড্রাগন আসবে তার ছানাসমেত ডিম নিতে। এখন দেখি আমি কী করি?'

জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা বেশ মুশকিলের। দেখো যদি তাকে বুঝিয়ে ছানাটা তোমার কাছে রাখতে পার।'

ওয়াং চিন্তান্বিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ, কোনও একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ছানাটাকে আমার কাছে রাখা যায়। এই ইঁদুর দুটো তো ড্রাগনের বাচ্চাটার জন্যই আনলাম। ডিম ফুটে বেরোবার পর নিশ্চয়ই খিদে পাবে। তখন খেতে দেব।'

ওয়াং-এর এ-কথা বলার পরই দীপাঞ্জনরা দেখল লাঠিতে ভর দিয়ে খটখট শব্দ তুলে ওয়াং-এর দাদু বুড়ো ঝাং এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে।

বারান্দায় উঠে বৃদ্ধ প্রথমে দীপাঞ্জনদের দেখে বললেন, 'বেড়ানো কেমন হল?'

দীপাঞ্জন জবাব দিল, 'ভালোই। আশপাশটা ঘুরে দেখলাম। ড্রাগন কিং-এর পুরানো মন্দিরটার ওদিকে গেছিলাম। তবে ভিতরে ঢুকিনি। এক ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকেছিলেন, তার মুখে শুনলাম বাড়িটার ভিতরে একটা বিরাট সাপ নাকি তার ডিম নিয়ে বসে আছে।'

বৃদ্ধ শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন। ওখানে যে বিরাট সাপ থাকে তা আমরা অনেকে জানি। কিং কোবরা। কেউ-কেউ আবার ওকে ড্রাগনের রূপ ভাবে। ড্রাগন কিং। ওর খাবারের জন্য ছোটখাট প্রাণী ছেড়ে আসে মন্দিরে।'

জুয়ান বলল, 'কিন্তু আমাদের মতো ট্যুরিস্টদের ব্যাপারটা জানার কথা নয়, যে-কোনও সময় তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

ঝাং বললেন, 'সাধারণত ট্যুরিস্টরা ওখানে যায় না। রাজপ্রাসাদ, মিউজিয়াম এসব দেখতে-দেখতেই সময় ফুরিয়ে যায় তাদের। আর 'ড্রাগন কিং' কাউকে কামড়েছে বলে শুনিনি। তবে সে এবার ডিম পেড়েছে বলে জানা ছিল না।'

এ কথা বলার পর বুড়োর হঠাৎ নজর পড়ল ওয়াং-এর দিকে। আর তার হাতে ইঁদুরের খাঁচাটা দেখেই মনে হয় খেপে গেলেন বৃদ্ধ। নিজেদের ভাষায় কী যেন চিৎকার করতে লাগলেন ওয়াং-এর উদ্দেশ্যে। আর ওয়াং-ও ইঁদুরের খাঁচাটা দেখিয়ে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল তার দাদুকে। কিন্তু বুড়ো ঝাং-এর রাগ যেন ক্রমশ বেড়েই চলল। একসময় তিনি কাঁপা-কাঁপা হাতে তাঁর লাঠিটা তুললেন তার নাতির পিঠে বসিয়ে দেবার জন্য। ভয় পেয়ে ওয়াং দীপাঞ্জনের শরীরের পিছনে নিজেকে আড়াল করল। দীপাঞ্জন লাঠিটা ধরে ফেলে বলল, 'এ-বয়সে উত্তেজনা ঠিক নয়। যদি আপনি সমস্যাটা জানান তবে আমরা সমাধানের চেষ্টা করতে পারি।'

ঝাং লাঠিটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'সমস্যা তো বটেই। আমি মরছি নিজের জ্বালাতে, তার ওপর আবার ও দুটো ইঁদুর জোগাড় করে এনেছে। কিছুদিনের মধ্যেই ইঁদুরের জোড়াটা গাদা-গাদা বাচ্চা দিতে শুরু করবে। সারা বাড়ি ইঁদুরে ভরে যাবে। তারা জিনিসপত্তর কাটবে, খাবার খেয়ে নেবে। সাপ-খোপও প্রচুর আছে এ তল্লাটে। ইঁদুরের খোঁজে তখন সাপও এসে হানা দেবে এ-বাড়িতে। এ-সব আমি সহ্য করব না। কাল সকালেই যদি ও বাড়ি থেকে ইঁদুর দুটো বিদায় না করে, তবে ইঁদুর সমেত ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেব।'

এই শেষ বাক্যটাই সম্ভবত চিনা ভাষায় নাতির উদ্দেশে বলে। এরপর রাগে গজগজ করতে-করতে লাঠি হাতে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। ওয়াং চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জুয়ান তাকে নরম গলাতে বললেন, 'দাদু যখন ব্যাপারটা চাইছেন না, তখন ইঁদুরগুলো যেখানে থেকে এনেছ সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।'

জুয়ানের কথায় কোনও জবাব দিলো না বাচ্চাটা। খাঁচাটা নিয়ে সেও এরপর বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। দীপাঞ্জন, জুয়ানও এরপর বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে নিজেদের ঘরে ফিরে এল। ঘরের ভিতর থেকে তারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুনতে পেল নাতিকে তখনও বকাঝকা করে চলেছেন বুড়ো ঝাং। তারপর একসময় ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল সে শব্দ।

।।৫।।

দীপাঞ্জনরা ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল নিষিদ্ধ নগরীতে। দীপাঞ্জনদের সাথে একটা চার্জার লাইট আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা তারা অযথা জ্বালালো না। এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেলে চার্জ দেওয়া যাবে না। তাই সেটা রাতে খাবার সময়, আর বিশেষ প্রয়োজনে জ্বালাবে বলে ঠিক করলো। অন্ধকারে বসে গল্পগুজব করতে তাদের দুজনের কোনও সমস্যা হবে না। পরদিনের বেড়ানো নিয়ে আলোচনা শুরু করল দীপাঞ্জন-জুয়ান। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপাঞ্জনদের ঘরের পুরোনো দরজার ফুটোফাটা দিয়ে বাইরে থেকে একটা আলোকরেখা প্রবেশ করল। আর তারপরই একটা বাতি হাতে বৃদ্ধ ঝাং দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। তার হাতের আলোটা আসলে একটা চিনা লণ্ঠন। না, ব্যাটারিচালিত লণ্ঠন নয়,

তেলের বাতি। কারুকাজ-করা একটা বাটির মতো পাত্র। তার মুখের পলতেতে আগুন জ্বলছে। আর তার চারদিকে তারের খাঁচার গায়ে লাল সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘেরা। তার গায়ে সোনালি রং দিয়ে আঁকা আছে ড্রাগনের ছবি। জিনিসটার মাথায় একটা আংটা মতো আছে ওপর থেকে বাতিটাকে ঝোলানোর জন্য। বৃদ্ধ সেটা নিয়ে ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই নরম লাল আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরটাতে। ঝাং-এর মুখেও সেই লাল আভাতে তার বলিরেখাগুলো ফুটে উঠেছে। জিনিসটা দেখে প্রফেসর বেশ চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'ভারী সুন্দর জিনিস তো! আর বেশ পুরানো মনে হচ্ছে।'

ঝাং বললেন, 'হ্যাঁ, খাটি চিনা লন্ঠন। তেলের পাত্রের গায়ে রুপোর প্রলেপ দেওয়া। একসময় এ-লন্ঠন ব্যবহার করা হতো রাজপ্রাসাদে। ড্রাগনগুলোও খাঁটি জরি দিয়ে বোনা। এ-লন্ঠনের বয়স আমার জন্মেরও আগে। যত্ন করে তুলে রাখি। আপনারা এলেন বলে বার করলাম। আমার পূর্বপুরুষরা একসময় রাজপ্রাসাদে এই লন্ঠন জ্বালাবার কাজ করতেন।'

কথাগুলো বলে একটু থেমে ঝাং বললেন, 'আপনাদের পছন্দ হলে লন্ঠনটা আমি আপনাদের বিক্রি করতে পারি। মাত্র এক হাজার ইয়েন দাম নেব। কিউরিও শপে এর দাম তিনগুন। তাও হয়তো দেখা যাবে তিনমাস আগে কোনও ফ্যাক্টরিতে বানানো হয়েছে সেটা।'

দীপাঞ্জন বললেন, 'এত সুন্দর জিনিসটা আপনি বিক্রি করতে চাইছেন!'

বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ। চাইছি আমার নাতিটার জন্যই। এখনও বড় হল না ছেলেটা। আমার বয়স হয়েছে। মাঝেমাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার যদি হঠাৎ কিছু হয় তবে ওর কী হবে! সেরামিকের খেলনা বেচে যে সামান্য আয় হয় তা তো খাবার আর ওষুধ কিনতেই চলে যায়। এবার ভাবছি ছেলেটার জন্য যতটা সম্ভব টাকাপয়সা জোগাড় করে রাখার চেষ্টা করে যাব। সে জন্যই লন্ঠনটা বিক্রি করব বললাম। আরও কিছু ছোটখাট প্রাচীন জিনিস ছিল আমার কাছে। রুপোর পেয়ালা-পিরিচ এসব। অভাবের তাড়নাতে একটা-একটা করে বিক্রি করে দিয়েছি। এখন এই লন্ঠনটা আছে।'

তার কথা শুনে জুয়ান বললেন, 'আপনার প্রস্তাবটা আমরা ভেবে দেখব।'

দেওয়ালের একপাশে কড়িবরগা থেকে একটা হুক লাগানো লাঠি নেমে এসেছে দীপাঞ্জনদের মাথার একটু ওপর পর্যন্ত। বৃদ্ধ সেখানে গিয়ে লাঠির গায়ে হুকের সাথে লন্ঠনটা ঝুলিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরের বাইরে বেরোবার আগে আরও একবার থামলেন ঝাং। দীপাঞ্জনদের দিকে তাকিয়ে তিনি মৃদু বিষণ্ণভাবে বললেন, 'জানেন, ইচ্ছা করলেই আমি বড়লোক হয়ে যেতে পারতাম। ছেলেটার ভবিষ্যৎ নিয়েও আর চিন্তা থাকত না। কিন্তু...।' এই বলে থেমে গেলেন বৃদ্ধ।

দীপাঞ্জন বলল, 'কিন্তু কী?'

ঝাং বললেন, 'না, কিছু না। বুড়ো হয়েছি তো, মনের খেয়ালে নানা বাজে কথা বলে ফেলি।' এই বলে ধীর পায়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন ঝাং। তিনি চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দীপাঞ্জন বললো, 'ঝাং মনে হয় কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না।'

জুয়ান বললেন, 'ছেলেটাকে ও যতই বকুক-মারুক। ওর কথা শুনে বুঝলাম নাতিটাকে ও সত্যিই খুব ভালোবাসে।'

দীপাঞ্জন বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

এরপর তারা দুজন পুরোনো দিনের গল্প শুরু করল। কখনও তাদের দুজনের প্রথম সাক্ষাত সেই 'তেজক্যালিপোকার পিরামিড'-এর গল্প, কখনও আফ্রিকার 'চাঁদের বাজনা'র গল্প, কখনও বা 'ডাকাউ ক্যাম্পের' গল্প। কত রোমাঞ্চকর স্মৃতি রয়েছে তাদের মনের ঝুলিতে! গল্প করতে-করতেই কখন যেন রাত ন'টা বেজে গেল। খাওয়া সেরে, ঝুলন্ত বাতিটা ওপর থেকে নামিয়ে, নিভিয়ে দিয়ে এরপর শুয়ে পড়ল তারা। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। সম্ভবত বহুক্ষণ আগেই দাদু-নাতি ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে এই প্রাচীন নগরীও। কথা বলতে বলতে তারা দু'জনও ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু মাঝরাতে একে-একে তাদের দু-জনেরই ঘুম ভেঙে গেল গরম আর মশার দাপটে। কিছুক্ষণ দুজনেই বিছানাতে এপাশ-ওপাশ করার পর দুজনেই উঠে বসল। জুয়ান বললেন, 'আমি জানলাটা খুলি, তুমি ব্যাগ থেকে গায়ে মাখার মশার ক্রিমটা বার করো। গায়ে মেখে শুতে হবে, নইলে নির্ঘাত চীনা ম্যালেরিয়া হবে।'

খাট থেকে দুজনেই নামল। জুয়ান জানলাটা খুলতেই বাইরের চাঁদের আলো প্রবেশ করলো ঘরে। ব্যাগ হাতড়ে মলমের কৌটোটা বার করল দীপাঞ্জন। ঠিক সেই সময় জুয়ান বললেন, 'দেখো একটা লোক মনে হয়!'

কথাটা শুনে দীপাঞ্জন গিয়ে দাঁড়ালো জুয়ানের পাশে। রাত একটা বাজে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে এই প্রাচীন নগরীর বুকে। নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে অতি প্রাচীন কাঠামোগুলো। তাদের ছায়া মাটিতে পড়ে বাড়িগুলোর গায়ে আলো-আঁধারীর সৃষ্টি করেছে। জানলার ঠিক বাইরে একটা পাথুরে চত্বর আছে বাড়ির এপাশটাতে। আর তাকে ঘিরে প্রাচীন ঘরবাড়িগুলো দাঁড়িয়ে। এদিক দিয়ে এ-বাড়িতে এসে ওঠেনি দীপাঞ্জনরা। জুয়ান আঙুল তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল চত্বরের গায়ের একটা বাড়ির দিকে। বললেন, 'ওই যে, ওই বাড়ির দেওয়ালের গায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখো লোকটা। ভালো করে সেদিকে তাকিয়ে দীপাঞ্জন দেখতে পেল লোকটাকে। বাড়িটার দেওয়াল ঘেঁষে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তার পরণে সম্ভবত কালো পোশাক। তাই অন্ধকারের মধ্যে প্রায় মিশে আছে। পাছে লোকটা দীপাঞ্জনদের দেখে ফেলে সে জন্য জুয়ান জানলার পাল্লা দুটো টেনে দিয়ে তার মধ্যে সরু একটা ফাঁক রাখলেন। তার মধ্যে দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে লোকটাকে লক্ষ করতে লাগল তারা। চত্বরের গায়ের বাড়িগুলো একে অন্যর থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। লোকটা এরপর অতি দ্রুত তার জায়গা ছেড়ে পাশের বাড়িটার গায়ে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর আবার তার পরের বাড়িটার গায়ে। এভাবে যেন সে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল দীপাঞ্জনদের বাড়িটার কাছাকাছি। একসময় দীপাঞ্জনদের কাছাকাছি শেষ বাড়িটার গায়ে এসে দাঁড়াল সে। হ্যাঁ, লোকটার শরীর আপাদমস্তক অনেকটা বোরখার মতো দেখতে কালো পোশাকে মোড়া, মুখেও কাপড় ঢাকা। দীপাঞ্জনদের বাড়িটার কাছে আসতে হলে লোকটাকে অন্তত পঞ্চাশ ফুট ফাঁকা জায়গা এবার পেরোতে হবে। সেটা পেরোবার আগে কিছুক্ষণের জন্য থামল লোকটা। সতর্ক হয়ে সে যেন একবার দেখে নিল কেউ কোথাও আছে কিনা। তারপর মাত্র কয়েকটা লাফ। মনে হয় যেন চত্বরটার ফাঁকা অংশটা প্রায় উড়ে পেরিয়ে এসে আশ্রয় নিল দীপাঞ্জনদের চোখের আড়ালে, সম্ভবত তাদেরই বাড়ির দেওয়ালের গায়ে কোনও একটা জায়গাতে। দীপাঞ্জন চাপা স্বরে জুয়ানকে বলল, 'বাইরে বেরিয়ে বাড়ির সামনে গিয়ে একবার দেখবেন নাকি?'

জুয়ান বললেন, 'না থাক, দরকার নেই। এই প্রাচীন নগরীতে রাতেরবেলাতে কে কোন উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের জানা নেই। কোনও ঝামেলাতে জড়িয়ে গেলে মুশকিল।

আমরা বরং এখানেই দাঁড়িয়ে দেখি লোকটা আবার এ পথে ফেরে কি না। দেখলে তো লোকটা কেমন উড়ে পেরিয়ে এল জমিটা! মার্শাল আর্টের ট্রেনিং না-থাকলে এটা সম্ভব নয়। এখানে অনেকেই এই আর্ট জানে। ওর ওই উড়ে যাওয়াটা আর একবার দেখতে ইচ্ছা করছে। একইভাবে নিশ্চয়ই সে ফিরে যাবে।'

লোকটার লাফিয়ে উড়ে যাওয়া দেখার প্রত্যাশাতে জানলার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল তারা দুজন। কিন্তু এরপরই অন্য একজনকে দেখতে পেল দীপঞ্জনরা। দুটো বাড়ির মাঝের রাস্তা দিয়ে চত্বরের দিকে এগিয়ে আসছে অন্য একজন। সে কিছুটা এগিয়ে আসার পরই তাকে চিনতে পারল দীপাঞ্জনরা। জুয়ান বিস্মিতভাবে বলে উঠলেন, 'ওয়াং এত রাতে কোথা থেকে বাড়ি ফিরছে?'

দীপাঞ্জনরা দেখতে লাগল তাকে। ওয়াং-এর হাত থেকে কি যেন একটা ঝুলছে। ধীরেসুস্থেই চত্বরটা পেরিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ওয়াং। বাড়ির কাছে চলে এল সে। তার হাতের জিনিসটা একটা লণ্ঠন। সেটা নেভানো। দীপাঞ্জনদের জানলার কাছাকাছি এসে একবার থামল সে। তার ঢোলা জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন কোনও কিছুর উপস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। তারপর জানলার সামনে দিয়ে এগোল সম্ভবত বাড়ির সামনের অংশতে আসার জন্য। হ্যাঁ, মিনিটখানেকের মধ্যে বাড়ির কোনও একটা জায়গা থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন তাদের কানে এল। সম্ভবত ওয়াং বাড়ি ঢুকলো। জানলার সামনে আরও মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকার পর জুয়ান হাই তুলে বললেন, 'না, এবার শুয়ে পড়ি। ও লোক কখন ফিরবে কে জানে? হয়তো-বা অন্যপথেই ফিরবে। কাল সকাল-সকাল উঠতে হবে। মিউজিয়ামটা ভালো করে দেখতে হবে।'

দীপাঞ্জনেরও আবার ঘুম পাচ্ছিল। মশার মলম গায়ে মেখে আবার শুয়ে পড়ল তারা।

।।৬।।

ভোরে ঘুম থেকে উঠবে ভাবলেও পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে সকাল আটটা বেজে গেল তাদের। বাইরে বেরোবার জন্য ঘরের লাগোয়া বাথরুম থেকে স্নান সেরে নিল তারা। তারপর প্রাতরাশ সাঙ্গ করে তৈরি হয়ে ঘরের বাইরে যখন তারা বেরোল তখন প্রায় ন'টা বাজে। ঝাং আর ওয়াং-এর ঘরের দরজার পাল্লাটা ভেজানো আছে। হয়তো-বা ঘরের মধ্যেই রয়েছে তারা। তাদের অবশ্য দীপাঞ্জনদের তখন প্রয়োজন নেই। দীপাঞ্জন আর জুয়ান তাই তাদের না-ডেকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ল। নির্মল সকাল। দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সোনালি গিল্টি-করা প্রাসাদগুলোর ঢেউখেলানো ছাদে, প্রাচীন বাড়িঘরগুলোর কারুকাজ করা থামগুলোর গায়ে। এক ঝাঁক পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর পরিবেশ। লোকজন খুব কম চোখে পড়ছে। যাদের দেখা মিলছে তাদের দেখে মনে হয় তারা সবাই এই নিষিদ্ধ নগরীরই বাসিন্দা। কাঠের বালতিতে জল নিয়ে ফিরছে কেউ, আবার কেউ-বা বাড়ির সামনের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। বাইরের ট্যুরিস্টরা এখনও ভিতরে প্রবেশ করা শুরু করেনি।

প্রাসাদ মিউজিয়াম খুলবে সকাল দশটাতে। হাতে বেশ কিছুটা সময় আছে দীপাঞ্জনদের। তাই তারা প্রাসাদ মিউজিয়ামের দিকে তখনই পা না-বাড়িয়ে ধীরে সুস্থে চারপাশটা ঘুরে দেখতে শুরু করলো। কত প্রাচীন বাড়িঘর, মন্দির, উপাসনাকক্ষ চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে এই মহাচিনের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। চৈনিক সাম্রাজ্যের কত উত্থান-পতনের সাক্ষী ছিল একসময় এসব ঘরবাড়িগুলোর বাসিন্দারা। কিন্তু মহাকাল বড় নির্মম, নিষ্ঠুর।

সেসব কিছুই কেড়ে নেয়, যেমন সে কেড়ে নিয়েছে এ নগরীর একসময়ের সব জৌলুসকে। ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে জুয়ান বললেন, 'এই নিষিদ্ধ নগরী শুধুমাত্র ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইটই নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম কাষ্ঠনির্মিত নগরী। চিন সাম্রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলের বনভূমি থেকে দুর্মূল্য 'ফোবে' কাঠ সংগ্রহ করা হয়েছিল এ-নগরী তৈরি করার জন্য। এ-কাঠের বৈশিষ্ট্য হল লোহার মতো শক্ত কিন্তু হালকা। সব থেকে বড় কথা হল এ-কাঠে কোনো ঘুণপোকা ধরে না। যে কারণে পাঁচশো বছর পরও কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি-প্রাসাদ এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুরতে-ঘুরতে একসময় গতকালের সেই চকটাতে পৌঁছে গেল। যেখানে গত বিকালে খেলা দেখাচ্ছিল তাও। তার মনে পড়াতে জুয়ান বললেন, 'ছেলেটার হাতের ক্ষতটা কেমন আছে কে জানে? ওর বাসস্থান চেনা থাকলে একবার খোঁজ নেওয়া যেত।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ তা খোঁজ নেওয়া যেত। ওর গায়ের ড্রাগনের উল্কিটাও বড় সুন্দর আর অদ্ভুত। এত বড় উল্কি আমি আগে কারো গায়ে দেখিনি।'

সেই চত্বর বা চক পেরিয়ে এরপর প্রাসাদ মিউজিয়ামে যাবে বলে পা বাড়াল দীপাঞ্জনরা। ইতিমধ্যে সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। ঠিক দশটাতে মিউজিয়াম খুলবে। কিন্তু কিছুটা তফাতেই একটা গলির মুখে ছোটখাটো ভিড় নজরে পড়ল তাদের। দু-সার দিয়ে বেশ কিছু প্রাচীন ঘরবাড়ি রয়েছে সেখানে। তার মুখটাতে মানুষের জটলা। দু-একজন পুলিশকর্মীও আছে মনে হয়। সম্ভবত কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে সেখানে। দূর থেকে সেই ভিড়ের মধ্যে মিস্টার শাওকেও দেখতে পেলেন তারা। আর তিনিও তাদের দেখতে পেয়ে সেই ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি আসছেন দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপাঞ্জনরা। তিনি তাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই দীপাঞ্জন আর জুয়ান তাকে সুপ্রভাত জানালো। শাও গম্ভীর মুখে প্রথমে বললেন, 'সুপ্রভাত।' তারপর বললেন, 'সত্যিই আজ সুপ্রভাত কিনা জানা নেই। সকালে হাঁটতে বেরিয়েই ওখানে যা কান্ড দেখলাম!'

জুয়ান জানতে চাইলেন, 'কী কান্ড ঘটেছে ওখানে?'

শাও বললেন, এসব জায়গাতেও দেখছি শান্তি নেই। খুন হয়েছে। একটা লোককে তার বাড়ির মধ্যে তলোয়ার দিয়ে ঘুমের মধ্যে দু-টুকরো করে ফেলা হয়েছে।'

'কে খুন হয়েছে? আর কে খুন করেছে?' বিস্মিতভাবে জানতে চাইল দীপাঞ্জন।

মিস্টার শাও বলল, 'যিনি খুন হয়েছেন তার নাম কিং ঝাও। বুড়ো লোক। এ-নগরীর প্রাচীন বাসিন্দা।'

এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'গতকাল একটা ছেলে মার্শাল আর্ট দেখাচ্ছিল না? তাকেই পরশু ঘর ভাড়া দিয়েছিল বুড়োটা। সবার ধারণা, সেই ছেলেটাই খুনটা করেছে। দেহের পাশেই তার রক্তমাখা তলোয়ারটা পড়ে আছে। আর ছেলেটাও বেপাত্তা।'

জুয়ান বললেন, 'সে হঠাৎ বুড়োটাকে খুন করতে যাবে কেন? তার মুখ দেখে তো আমাদের সরল-সাধাসিধে বলেই মনে হয়েছিল।' যদিও তাকে নিজেদের সাথে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ক্ষতস্থানে শুশ্রূষা করার ব্যাপারটা সঙ্গত কারণেই মিস্টার শাওকে বললেন না প্রফেসর জুয়ান।

শাও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার একটা অনুমান আছে। জানেন তো এ-নগরীর বাসিন্দাদের কাছে অনেকসময় নানা দুর্মূল্য প্রাচীন সামগ্রী পাওয়া যায়। বংশপরম্পরায় তাদের কাছে রয়েছে সেসব জিনিস। পুলিশ আর সরকারি নজরদারি

এড়িয়ে গোপনে সেগুলো কেনাবেচাও হয়। তারপর তো পাচার হয়ে যায় এ-নগরীর বাইরে, দেশের বাইরে, লক্ষ-লক্ষ ডলারে বিক্রি হয় সেসব অ্যান্টিক জিনিস। আমার ধারণা বুড়োটার কাছে তেমনই কিছু জিনিস ছিলো সেটা নিয়ে বুড়োটাকে মেরে চম্পট দিয়েছে লোকটা। আপনারা চললেন কোথায়?'

জুয়ান জবাব দিলেন, 'প্রাসাদ মিউজিয়াম দেখতে।'

মিস্টার শাও বললেন, 'এগোন তবে। সময় তো হয়ে এল। আমাকেও আমার কাজে যেতে হবে। এই বলে শাও রওনা হয়ে গেলেন অন্যদিকে, আর দীপাঞ্জনরাও এগোল প্রাসাদের দিকে। সকালবেলায় একটা খুনের খবর পেয়ে, বিশেষত খুনের সাথে তাওয়ের নাম সন্দেহর প্রথমে আছে জেনে মনটা কেমন যেন তেতো হয়ে গেল দীপাঞ্জনদের। চলতে-চলতে দীপাঞ্জন শুধু একবার বলল, 'তাও কে দেখে কিন্তু আমারও সরল চিনা যুবক বলেই মনে হয়েছে। সে কি এ কাজ করতে পারে?'

জুয়ান বললেন, 'কে জানে? কিন্তু সে নিরুদ্দেশই-বা হল কেন?'

দীপাঞ্জনরা যখন প্রাসাদ মিউজিয়ামের কাছে পৌঁছলো প্রায় দশটা বাজে। বাইরের পর্যটকরা ইতিমধ্যে দলে-দলে ঢুকতে শুরু করেছে নিষিদ্ধ নগরীতে। জড়ো হচ্ছে পাঁচশো বছরের প্রাচীন মিং রাজপ্রাসাদের সামনে। টিকিট কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট নিল তারা। দশটা বাজতেই তারা প্রবেশ করলো ঐতিহ্যমণ্ডিত সেই প্রাসাদে। দীপাঞ্জনরা ভিতরে ঢুকেই বুঝতে পারল বাইরে থেকে বোঝা না-গেলেও এটা কোনও একটা প্রাসাদ নয়, ছোট-বড় নানা প্রাসাদের সমষ্টি। সেগুলোকে নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে নানা মিউজিয়াম প্রদর্শনীকক্ষ। প্রাসাদের ভিতর বেশ কয়েকটা জলাশয়ও আছে। শাপলা ধরনের ফুল ফুটে আছে তাতে, আর আছে রঙিন মাছের ঝাঁক। এছাড়া বাগান তো আছেই। সবকিছু বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। কমিউনিস্ট চিন রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী হলেও তারা দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য আর ইতিহাসের প্রতি গভীর যত্নশীল।

টিকিটের সাথে একটা বুকলেটে প্রাসাদ-মিউজিয়ামের একটা ম্যাপ, আর কোথায় কী দ্রষ্টব্য আছে তা লেখা আছে। সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জুয়ান বললেন, 'এত বড় মিউজিয়াম খুঁটিয়ে দেখা একদিনে সম্ভব নয়। এখানে শুধু তৈলচিত্রই আছে পঞ্চাশ হাজার। যতটুকু পারি আজকে দেখি। তেমন হলে কালকের দিনটাও থেকে যাব মিউজিয়াম দেখার জন্য। চলো, আমরা প্রথমে দরবার-হলটা দেখি। তবে, ওর ছবি তোলা নিষেধ।

গাইডবুকের নির্দেশ মেনে তারা প্রথমে পৌঁছলো একটা প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিশাল দরবার-হলে। সেখানে বসে একসময় তাদের বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করতেন চিনা সম্রাটরা। বিশাল ঘরটা শ্বেতপাথরে মোড়া। থামগুলো সব চন্দন কাঠের। তার ওপর সোনা-রুপোর নকশা। সিলিং-এও শোলার কারুকাজ। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে সম্রাটদের প্রাচীন তৈলচিত্র। আর সর্বত্রই বসানো আছে মিং সম্রাটদের প্রতীক সোনালি ড্রাগনের বা ড্রাগন কিং-এর স্বর্ণখোদিত মূর্তি। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিরাট কাচের আধারের মধ্যে রয়েছে সম্রাটের সিংহাসন। দীপাঞ্জন আর জুয়ান গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। বিরাট সিংহাসনটা নিরেট সোনার তৈরি। কত রকমের হিরে-জহরত-পান্না যে তাতে বসানো আছে তার হিসাব নেই। সিংহাসনের মাথার দু-পাশে দুটো ড্রাগন মূর্তি আছে। তাদের চুনির চোখ, সোনার আঁশে ঢাকা দেহ। এমনকি সিংহাসনের নীচে সম্রাটদের পা রাখার জন্য যে জায়গা, সেখানেও হিরে বসানো। প্রাচ্যের সম্রাটদের বৈভব কেউ দেখতে চাইলে তাকে একবার এই দরবার হলে আসতেই হবে। দরবার-হল দেখার পর একে-একে প্রাসাদ

মিউজিয়ামের অন্য অংশগুলোও দুজনে দেখে বেড়াতে শুরু করল। দরবার কক্ষ ছেড়ে তারা প্রথমে প্রবেশ করল রাজঅন্তঃপুরে। সেখানে বসবাস করতেন সম্রাটরা। শ্বেতপাথর আর দামি কাঠেমোড়া রাজঅন্তঃপুরে কত রকমের প্রাচীন মূর্তি আর ছবি আছে তার হিসাব নেই। সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীদের শয়নকক্ষের ভিতরে অবশ্য প্রবেশের অনুমতি নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতে হয় কাচের পর্দার আড়াল থেকে। বৈভব আর শিল্পের চূড়ান্ত রূপ রয়েছে একসময় ব্যবহৃত সেই ঘরগুলোতে। খাট ইত্যাদি সোনার তো বটেই, ঘরের মেঝেতে পর্যন্ত সোনার ইট বসানো। একের পর এক দ্রষ্টব্য প্রাসাদ দেখে চলল দীপাঞ্জনরা। সময় গড়িয়ে চলল। তার সাথে বাড়তে লাগল ভিড়ও।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ একটা প্রাসাদে প্রবেশ করল তারা। যে প্রাসাদ এক সময় রাজপরিবারের শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। পরিচারক-পরিচারিকাদের তত্ত্বাবধানে দিনের বেলা শিশুরা থাকত এখানে। সম্রাটদের শিশুদের বৈভবও তো সম্রাটদের মতোই হবে। তাই সোনার দোলনা, চাকা লাগানো হাতির দাঁতের গাড়ি, সোনার সুতোয় বোনা তাদের পোশাক আর অসংখ্য তৈলচিত্র রাখা আছে সেখানে। সেসব দেখতে-দেখতে হঠাৎই একটা তৈলচিত্র সামনে জুয়ান থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর সেই তৈলচিত্রর প্রতি দীপাঞ্জনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওই দেখো।'

ছবিটার দিকে তাকাল দীপাঞ্জন। তিনজন পাঁচ-ছ বছরের বাচ্চার ছবি। তাদের পরনে রাজকীয় টুপি, জুতো, পোশাক, অলঙ্কার বলে দিচ্ছে তারা সম্রাটের সন্তান। পোশাকে ড্রাগনের ছবিও আঁকা। যা একমাত্র সে-যুগে রাজপরিবারের সদস্য ছাড়া কেউ ওই প্রতীক ব্যবহার করত না। বাচ্চাগুলো পা ছড়িয়ে বসে কতগুলো বলের মতো জিনিস নিয়ে খেলছে। ভালো করে দেখার পর দীপাঞ্জন বুঝতে পারল সেগুলো বল নয়, ডিমের মতো দেখতে। ওয়াং-এর কাছে দেখা সেই ড্রাগনের ডিমের মতো।

দীপাঞ্জন ফিরে তাকাল জুয়ানের দিকে। তিনি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। ছবির ডিমগুলোর আকার দেখে মনে হচ্ছে এদের আকার ওয়াং-এর সেই ড্রাগনের ডিমের মতোই। অর্থাৎ, এ-জিনিসগুলো এক সময় সম্রাটপুত্রদের খেলার সামগ্রী ছিল। এবার অনুমান করতে পারছি বৃদ্ধ ঝাং কেন ডিমটা আগলে রাখতে চান। জিনিসটা দুর্মূল্য অ্যান্টিক। প্রচুর দাম হবে। বাচ্চা ছেলেটা জিনিসটা হারিয়ে ফেলতে পারে। যেমন আর একটু হলেই আমরা না-থাকলে জিনিসটা সে হারিয়ে ফেলছিল।'

দীপাঞ্জন বলল, 'কিন্তু ড্রাগনের ডিম ফিরিয়ে নিতে আসার গল্পটা, যেটা বলল ওয়াং।'

জুয়ান বললেন, 'এমন হতে পারে ওয়াং যাতে ডিমে হাত না-দেয়, সেটা নিয়ে বাইরে না-যায় সেজন্য ওই গল্প ফেঁদেছে ওই বৃদ্ধ। আবার এমনও হতে পারে যে ডিমটা অ্যান্টিক জিনিস হিসাবে কাউকে বেচে দিতে চলেছে ঝাং। যেমন, আমাদের সে লণ্ঠন বেচতে চাইলো। নাতির ভবিষ্যতের জন্য টাকা রেখে যেতে চাইছে সে।'

কথাগুলো বলার পর ঘড়ি দেখে জুয়ান বললেন, 'বেশ বেলা হয়েছে, খিদেও পাচ্ছে। আপাতত আজকের মতো মিউজিয়াম দেখা শেষ করি। কালকের দিনটাও এখানেই থেকে যাব। এখন চলো ঘরে ফিরি।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, চলুন।'

দরজার দিকে যাবার জন্য পিছন ফিরতেই দীপাঞ্জনের হঠাৎ একটা লোকের ওপর দৃষ্টি পড়ল। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে একজন চিনা। পরনের

পোশাক দেখে তাকে স্থানীয় লোক বলেই মনে হল। লোকটার ডান গালে একটা কাটা দাগ আছে। দীপাঞ্জনের সাথে চোখাচোখি হতেই সে অন্যদিকে চলে গেল।

দীপাঞ্জন জুয়ানকে বলল, 'দেখলেন লোকটাকে?'

জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ, এ-লোকটাকে কিছুক্ষণ আগে যেন আরও একটা জায়গাতে দেখলাম বলে মনে হলো। গালে কাটা দাগওয়ালা লোক।'

দীপাঞ্জন বলল, 'আগে দেখেছেন! ও এমনভাবে চলেই বা গেল কেন? আমাদের ফলো করছে নাকি?'

জুয়ান বললেন, 'কে জানে! কিন্তু আমাদের ফলো করার মতো তো কোনও ব্যাপার ঘটেনি।' কথা বলতে বলতে এরপর সে ঘর, প্রাসাদ-কমপ্লেক্স ছেড়ে ঘরে ফেরার জন্য পা বাড়াল তারা। কিছুটা এগোতেই তারা একটা ঘরের দরজার সামনে মুখোমুখি হয়ে গেল মিস্টার শাওয়ের। জুয়ান তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এখানে?'

শাও বললেন, 'হ্যাঁ, একটু আগেই এলাম। আসলে এখানে একটা বিশেষ ধরনের ড্রাগন মূর্তি আছে, সেটা দেখতেই এলাম। আপনাদের দেখা শেষ?'

জুয়ান জবাব দিলেন, 'আপাতত আজকের মতো। এত বড় মিউজিয়াম কি কয়েক ঘণ্টাতে ভালো করে দেখা যায়? ভাবছি কালকের দিনটাও থেকে যাব।'

এ-কথা বলার পর জুয়ান বললেন, 'আপনাকে একটা তথ্য দিই, হয়তো সেটা কোনও কাজে লাগতে পারে।'

'কী তথ্য?'

জুয়ান হেসে বললেন, 'ড্রাগনের ডিম কিন্তু আছে বা ছিল। আসলে সে জিনিসটা হল সম্রাট শিশুদের খেলার জিনিস। সম্রাটদের তো ড্রাগন বলে ডাকা হতো। তাই হয়তো ওই খেলনা ডিমকে 'ড্রাগনের ডিম' বলে।'

মিস্টার শাও কথাটা শুনে প্রথমে বললেন, 'এ-ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। ছবিটাও দেখিনি। আসলে এখানে এত ছবি আছে যে সব ছবি চোখে পড়ে না। তবে আমার গবেষণা ড্রাগনের ছবি, মূর্তি এসব নিয়ে, খেলনা নিয়ে নয়।' এ কথা বলার পর মিস্টার শাও বললেন, 'আরও একটা দিন এখানে থাকবেন তো বলছেন, কিন্তু অনেকেই খুনের ঘটনাটার পর এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনার আমার মতো বাইরের বেশ কিছু লোক তো এই নিষিদ্ধ নগরীতে রয়েছি। পুলিশ নাকি আমাদেরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করবে বলে শুনছি। আমি তো ভাবছি আজই ফিরে যাব, কে আর ঝামেলাতে জড়াতে চায়?' কথাগুলো বলে মিস্টার শাও পা বাড়ালেন অন্যদিকে, তিনি চলে যাবার পর জুয়ান বললেন, 'সত্যিই যদি পুলিশের হাঙ্গামাতে পড়তে হয় তবে মুশকিলের কথা। যদিও আমাদের ভয়ের কিছু নেই। তাও-লি নামের ছেলেটাকে আমরা শুশ্রূষা করেছিলাম মাত্র। সে যদি অপরাধী হয়েও থাকে আমরা তো আর তার অপরাধের সঙ্গী নই।'

প্রাসাদ-কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে এরপর ফেরার পথ ধরল দীপাঞ্জনরা।

।। ৭।।

বাড়িতে ফিরে এসে বাইরের বারান্দাতে উঠতেই ভিতর থেকে বৃদ্ধ ঝাং-এর চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ কানে এল দীপাঞ্জনদের। তারা অনুমান করলো, নির্ঘাৎ আবার দাদু-নাতির

মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। তারা বাড়ির ভিতর ঢুকে বুঝতে পারল অনুমান সত্যি। জাং-এর ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঝাং চিনা ভাষাতে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াং। সে যেন মাঝে-মাঝে দাদুকে কিছু বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে বুড়ো।

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জুয়ান একটু ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে?'

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ তার শনের মতো চুল-দাঁড়িওয়ালা মাথা নেড়ে বললেন, 'এ-ছেলে আমাকে আর বাঁচতে দেবে না। আমার ক্ষতি করেই ছাড়বে। আমি রাতে আফিম খেয়ে ঘুমাই। আমার হুঁশ থাকে না। উঠতেও একটু বেলা হয়। আর সেই সুযোগে ঘর থেকে একটা জিনিস সরিয়ে ফেলেছে ও। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করছে না। জিনিসটা যে আজ রাতেই আমার দরকার।'

দীপাঞ্জন জানতে চাইল, 'কী জিনিস?'

প্রশ্ন শুনে একটু থেমে গেলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'খুব পুরানো একটা জিনিস। ওই যে ওই তাকে একটা ছোট বেতের ঝুড়ির মধ্যে রাখা ছিল। এখন নেই। যেভাবেই হোক আজকের মধ্যে ওটা ফেরত চাই আমার।'

দীপাঞ্জনরা বুঝতে পারল যে ডিমটার ব্যাপারে বলতে গিয়েও চেপে গেলেন বৃদ্ধ। পুরানো জিনিসটা আসলে কী জিনিস তা বাইরের লোককে জানতে দিতে চান না তিনি। সেটা যে দীপাঞ্জনরা ঘটনাচক্রে ওয়াং-এর মাধ্যমে দেখেছে তা জানা নেই বৃদ্ধের।

দীপাঞ্জনদের কথাটা বলে আবার চিনা ভাষায় সুর চড়াতে লাগলেন বৃদ্ধ। ওয়াং-এরপর আবারও কিছু একটা বলল, 'আর কথাটা শুনে বৃদ্ধ ঝাং খেপে গিয়ে তার লাঠি দিয়ে এক ঘা দিলেন ওয়াং-এর পায়ে। লাফিয়ে উঠল ওয়াং। ঝাং তার পায়ে দ্বিতীয়বার লাঠির গা দেবার আগেই ওয়াং এক লাফে ঘরের বাইরে বেরিয়ে ছুটলো বারান্দার দিকে। বৃদ্ধ ঝাং রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, 'নির্ঘাত ওই জিনিসটা সরিয়েছে রাতেরবেলাতে। রাতে দরজা দিয়ে শুয়েছিলাম আমি। বাইরের লোক ঘরে কীভাবে ঢুকবে। ওয়াং দরজা খুলে বেরিয়েছিল। জিনিসটা আমি কীভাবে ফেরাবো তাকে। আজই তো সেটা যার জিনিস সেটা সে ফেরত নিতে আসবে।'

জুয়ান প্রশ্ন করলেন, 'কার জিনিস?'

প্রশ্নটা শুনে বৃদ্ধ একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'সে লোককে আপনারা চিনবেন না। তবে ওয়াং যদি ওটা ফিরিয়ে না-আনে তবে আমি আত্মহত্যা করব। তখন ও বুঝবে ব্যাপারটা। না-খেয়ে মরবে।'

গতকাল গভীর রাতে ওয়াংকে ফিরতে দেখেছিল দীপাঞ্জনরা। ঝাং-এর অনুমান কি তবে সত্যি? দাদু জিনিসটা অন্য কাউকে দিয়ে দেবে বলে কি সরিয়ে ফেলেছে বেতের ঝুড়িটা? জুয়ান বৃদ্ধকে বললেন, 'আপনি মাথা ঠান্ডা করুন। আপনার সমস্যার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা একবার ওয়াং-এর সাথে বলে দেখি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'দেখুন বলে।'

জুয়ান আর দীপাঞ্জন আবার বারান্দাতে বেরিয়ে এল। এক কোণে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াং। তার চোখের কোণে জল। জুয়ান তার কাছে এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত রেখে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, 'ডিমের ঝুড়িটা কোথায়, তুমি জানো?'

মাথা নেড়ে ওয়াং বলল, 'ঝুড়ি আমি নিইনি।'

দীপাঞ্জন বলল, 'তবে কাল রাতে তুমি কোথায় গেছিলে? আমরা কিন্তু তোমাকে ফিরতে দেখেছি।'

কথাটা শুনেই ওয়াং চমকে উঠে তাকাল দীপাঞ্জনের দিকে। তারপর বলল, 'ইঁদুরগুলো ছেড়ে আসতে গেছিলাম।'

'অত রাতে ইঁদুর ছাড়তে বাইরে বেরিয়েছিলে?' একটু সন্দিগ্ধভাবেই প্রশ্ন করল দীপাঞ্জন।

ওয়াং বলল, 'হ্যাঁ, ঘুম আসছিলো না। দাদুর ওপর রাগ হচ্ছিল। তাই রাতেই ইঁদুর ছাড়তে গেছিলাম। আমি যখন বাড়িতে ফিরলাম তখনও কিন্তু ঝুড়িটা ওখানেই ছিল, ডিমও ভিতরেই ছিল। আমি দেখেছি।' শেষ কথাগুলো বেশ দৃঢ়ভাবেই বলল ওয়াং।

এরপর সে বলল, 'দাদু বলেছে ডিমের ঝুড়ি না-পেলে আর বাড়ি ঢুকতে দেবে না। ঠিক আছে আমি আর বাড়ি ফিরব না। কালকের তাও-লির সাথে দেখা হয়েছে আমার। আমি ওর সাথে চলে যাব। পথে-পথে মার্শাল আর্ট দেখাব। দাদু আর আমাকে খুঁজে পাবে না।' এ-কথাগুলো বলে দীপাঞ্জনদের আর কোনো কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ওয়াং। তারপর ছুটতে-ছুটতে দীপাঞ্জনদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়াং-এর মুখে তাও-লির নাম শুনে বেশ অবাক হয়ে গেল দীপাঞ্জনরা। জুয়ান বললেন, 'তাও-কে তো পুলিশ খুঁজছে শুনলাম। ওয়াং কি জানে তাও কোথায়? ছেলেটা শেষে না বিপদে পড়ে!'

দীপাঞ্জনরা আবার বাড়ির ভিতর ফিরল। নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঝাং। দীপাঞ্জনদের উদ্দেশে ঝাং বললেন, 'ওয়াং কিছু স্বীকার করলো?'

জুয়ান জবাব দিলেন, 'সে বলল ঝুড়িটা সে নেয়নি। কাল রাতেও নাকি সে ঘরেই দেখেছে ঝুড়িটা। তারপর রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেল।'

ঝাং বললেন, 'কোথায় যাবে আর? একটু পরই ভাত খেতে ফিরে এল বলে।' এ-কথা বলে চীনা ভাষায় ওয়াংকে সম্ভবত গালাগালি করতে-করতে দরজা বন্ধ করে দিলেন বৃদ্ধ। দীপাঞ্জনরা ঘরে ফিরে এল।

ঘরে ঢুকে বন্ধ জানলার পাল্লাটা খুলল দীপাঞ্জন। দুপুর রোদে শূন্য বাড়ির পিছনের চত্বরটা। বাইরে তাকিয়ে আবার সে সেই লোকটাকে দেখতে পেল। জুয়ানকে সে বলল, 'ওই দেখুন মিউজিয়ামের গালকাটা সেই লোকটা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে।'

সত্যিই চত্বরের ওপাশে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা দীপাঞ্জনদের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল। জুয়ান জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে লোকটা হয়তো বুঝতে পারল যে দীপাঞ্জনরাও তাকে লক্ষ্য করছে। হয়তো সে জন্যই এরপর সে যে-বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিল, তার পাশেরগলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জুয়ান বললেন, 'এবার কিন্তু মনে হচ্ছে লোকটা আমাদের অনুসরণ করছে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'কিন্তু আমাদের অনুসরণ করার তো কোনো কারণ নেই।'

জুয়ান বললেন, 'ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কেন জানিনা আমার মন বলছে যে আজ রাতে কোনও একটা ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের একটু সতর্ক থাকা

প্রয়োজন।’

দীপাঞ্জন বলল, ‘আজ রাতেই তো ড্রাগনের তার ডিম ফেরত নিতে আসার কথা।’

জুয়ান বললেন, ‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা কী তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। রাত জাগতে হবে আমাদের। চলো এখন ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিই। রাত জাগতে অসুবিধা হবে না তবে।’

শুকনো খাবার দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিল তারা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বেশ মজার একটা স্বপ্ন দেখল দীপাঞ্জন। এক বস্তা ডিম নিয়ে কলকাতার রাস্তায় সেগুলো বিক্রি করতে বেরিয়েছে সে আর জুয়ান। জুয়ান চিৎকার করে খদ্দের ডাকছেন, ‘ড্রাগনের ডিম। ড্রাগনের ডিম। মাত্র দশটাকা জোড়া। নিয়ে যান, নিয়ে যান। ড্রাগনের বাচ্চা এই ডিম ফুটে বেরোলো বলে। এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।’ অনেক লোক জড়ো হয়েছে চারপাশে। বেচাকেনা চলছে। হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন বৃদ্ধ ঝাং। তিনি জুয়ানকে বললেন, ‘ও তোমরাই তবে আমার ডিম চুরি করে এনেছ! আমার ডিম ফেরত দাও।’

জুয়ান বললেন, ‘আমরা তো চুরি করিনি। তাও লি আমাদের ডিমগুলো দিয়েছে।’

বুড়ো বললেন, ‘কোথায় সেই হতভাগা?’

সঙ্গে-সঙ্গে তাও সেখানে এসে উপস্থিত। তাওকে দেখেই ঝাং তার লাঠিটা তলোয়ারের মতো বাগিয়ে ধরলেন। তাও লি তার তলোয়ার খুলে ফেলল। তারপর সে কী যুদ্ধ তাদের মধ্যে। মার্শাল আর্টের যুদ্ধ। নেচে-নেচে, লাফিয়ে লাফিয়ে, শূন্যে-শূন্যে উড়ে লড়াই। সবাই লড়াই দেখতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ কে একজন চিৎকার করে উঠল, ‘ডিম ফুটেছে। ড্রাগনের বাচ্চা বেরিয়েছে।’

দীপাঞ্জনরা দেখল সত্যি ডিমের ঝুড়ির ভিতর থেকে ড্রাগনের বাচ্চা বেরোচ্ছে। ড্যাবডেবেচোখে বাচ্চাটা চারপাশে তাকাচ্ছে। আর ঠিক এইসময় কোথা থেকে যেন উদয় হল ওয়াং। বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে সে ছুটতে শুরু করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝাং আর তাও-ও যুদ্ধ থামিয়ে, ‘আমার ড্রাগন, আমার ড্রাগন’ বলে ওয়াং-এর পিছু ধাওয়া করল। এ পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল দীপাঞ্জনের। জুয়ান আগেই উঠে বসেছেন। তিনি দীপাঞ্জনকে বললেন, ‘পাঁচটা বাজে। চলো বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসা যাক!’

বিছানা থেকে উঠে পড়ল দীপাঞ্জন।

।।৮।।

কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল তারা। ঝাং-এর ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু ঘরের ভিতর তিনি বা ওয়াং নেই। তবে বারান্দাতে বেরিয়ে এসে তাকে দেখতে পেল দীপাঞ্জনরা। লাঠিতে ভর দিয়ে চিন্তান্বিত মুখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন ঝাং। দীপাঞ্জনদের দেখে তিনি বললেন, ‘ঘুরতে যাচ্ছেন?’

জুয়ান বললেন, ‘হ্যাঁ, আশপাশটা একটু ঘুরে আসি।’

ঝাং বললেন, ‘ভেবেছিলাম ওয়াং ফিরে আসবে। কিন্তু সে এলো না। তার ভাত পড়ে আছে। আর আমারও খাওয়া হয়নি তার জন্য। যদি রাস্তায় তাকে দেখেন তবে তাকে বলবেন যে সে যেন তাড়াতাড়ি তখনই বাড়ি ফিরে আসে। ওকে নিয়ে যে কী করব বুঝে পাই না।’

দীপাঞ্জন বলল, 'আচ্ছা তাকে দেখলেই আমরা ধরে নিয়ে আসব।'

চিন্তান্বিত মুখে বারান্দাতে ওয়াং-এর ফেরার প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ। আর দীপাঞ্জনরা রাস্তায় নেমে পড়ল।

হাঁটতে-হাঁটতে জুয়ান বললেন, 'এবারও বুঝলাম ওয়াংকে একটু মারধোর-শাসন করলেও তাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন ঝাং। নাতির জন্য এত বেলা পর্যন্ত না-খেয়ে বসে আছেন।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, ওয়াংকে দেখতে পেলে সত্যি তাকে বুঝিয়ে বাড়ি ফেরত আনতে হবে। তাও লি যদি সত্যিই একজন অপরাধী হয়ে থাকে আর ওয়াং যদি তার পাল্লায় পড়ে থাকে তবে বিপদ হবে।'

জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ, সেটাই চিন্তার ব্যাপার।'

চারপাশে তাকাতে-তাকাতে ধীর পায়ে দুজনে হাঁটতে লাগল। দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে পড়েছে এই ভুলে যাওয়া নগরীর মাথায়। চারদিক ফাঁকাও হয়ে গেছে। বিকেল পাঁচটাতে গেট বন্ধ হয়ে যায়। ট্যুরিস্টরা সব ফিরে গেছে। তাছাড়া এ-দিকটাতে ট্যুরিস্টরা তেমন একটা আসে না, তেমন কিছু দেখার নেই বলে। গতদিনের মতোই জুয়ানরা বিকালবেলা প্যালেস কমপ্লেক্সের দিকে না গিয়ে এগোলো অন্যদিকে। মাঝে-মাঝেই ছোট ছোট চত্বর। আর তাকে ঘিরে পুরোনো দিনের ঘর-বাড়ি-মন্দির। তার সামান্য কয়েকটাতেই লোকজন থাকে, বাকিগুলো শূন্য-পরিত্যক্ত। রাস্তার পাশে একটা চত্বরে ওয়াং-এর বয়সী একদল ছেলেকে 'ন্যান-চা' নিয়ে মার্শাল আর্ট প্র্যাকটিস করতে দেখে জুয়ান এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে। একজনকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা ওয়াংকে দেখেছ? ওই যে সেরামিকের খেলনা বিক্রি করে।'

জুয়ানের কথা শুনে একটা ছেলে বলল, 'ও সেই খ্যাপা ওয়াং। বুড়ো ঝাং-এর নাতি? না, সে আমাদের সাথে খেলে না। আমরা তাকে দেখিনি।'

জবাব পেয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন তারা। জুয়ান বললেন, 'ওয়াং-এর মধ্যে বয়সের তুলনায় একটু বেশি শিশুসুলভ আচরণ থাকার জন্যই মনে হয় ওর সমবয়সীরা ওকে 'খ্যাপা ওয়াং' বলে।'

দীপাঞ্জন হেসে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক। নইলে ডিম ফুটে ড্রাগনের ছানা বেরোবে, ড্রাগন ডিম নিতে আসবে—এ গল্পও বিশ্বাস করতো না।'

জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ, এ-ধরনের সরল ছেলেদেরই তো ভুলিয়ে কোথাও নিয়ে যাওয়া সহজ। সত্যিই, ইতিমধ্যে তাও ওকে কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে?'

হাঁটতে থাকেন তারা। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একটা চত্বরে পৌঁছে গেল তারা। এ-জায়গাটা সেই ড্রাগন কিং-এর মন্দিরের বেশ কাছাকাছি। একসার বাড়ির পিছন থেকে তার চুড়োটা দেখা যাচ্ছে।

জুয়ান বললেন, 'চলো ও-দিকটাতে আর একবার ঘুরে আসি।'

কিছুটা এগোবার পরই আবারও তারা দেখতে পেল মিস্টার শাওকে। ড্রাগন কিং-এর মন্দিরের দিক থেকেই আসছিলেন তিনি। দীপাঞ্জনদের মুখোমুখি হয়ে গেলেন তিনি। জুয়ান তার উদ্দেশে বললেন, 'আপনার সাথে আবারও দেখা হয়ে গেল আমাদের। ভেবেছিলাম আপনি হয়তো ফিরে গেছেন।'

শাও বললেন, 'হ্যাঁ, তেমনই ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু হঠাৎই ড্রাগন কিং-এর মন্দিরের ওদিকে আরও একটা মন্দিরে কিছু দুষ্প্রাপ্য ড্রাগনের মূর্তির সন্ধান পেলাম, তাই সিদ্ধান্ত বাতিল করলাম। মনের মধ্যে যে ভয় নেই তা নয়। তবু রয়ে গেলাম। ও জায়গা থেকেই এখন ফিরছি ছবি তুলে। এই বলে তিনি তার পকেট থেকে একটা আধুনিক ডিজিটাল ছোট ক্যামেরা বার করে দেখালেন।

শাও এরপর পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা তো আজ রাতেও ওই বুড়ো সেরামিক বিক্রেতার বাড়ি থাকছেন?'

দীপাঞ্জন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আজ এবং কাল দুটো দিনই।'

শাও বললেন, 'আমিও আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। যদি দেখা হয় আপনাদের সাথে তবে খবরটা আপনাদের জানাতে পারি ভেবে।'

জুয়ান বললেন , 'কী খবর?'

শাও বললেন, 'সরকারি অতিথিনিবাসে আমার পাশের ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। আপনারা যে-বাড়িতে আছেন সেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই নিশ্চয়ই। ওখানে আলো, ফ্যান, টেলিভিশন সব বন্দোবস্ত আছে। আমি কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলেছি। আমার সহকর্মী পরিচয়ে আপনারা সেখানে থাকতে পারেন। আর তার জন্য বেশি ভাড়াও গুনতে হবে না আপনাদের।'

মিস্টার শাও-এর প্রস্তাবটা লোভনীয় সন্দেহ নেই। কথাটা শুনে দীপাঞ্জন তাকাল জুয়ানের দিকে। একটু ভেবে নিয়ে জুয়ান, মিস্টার শাওকে বললেন, 'আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। তবে এখন আর সেখানে যেতে ইচ্ছা করছে না। তাছাড়া বাড়ির মালিক ঝাং জানেন যে আমরা আজ রাতে তার বাড়িতেই থাকব। আজকের রাতটা আমরা ওর ওখানেই থাকি, তেমন হলে কালকের রাতটা না-হয় আপনার ওখানে গিয়ে থাকা যাবে।'

জুয়ানের জবাব শুনে চুপ করে গেলেন মিস্টার শাও।

দীপাঞ্জন এরপর মিস্টার ঝাংকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এদিকে দশ-বারো বছর বয়সী কোনও ছেলেকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন?'

'কেন বলুন তো?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিস্টার শাও।

জুয়ান বললেন, 'আমরা যে সেরামিক বিক্রেতার বাড়িতে আছি, ছেলেটা সেই বৃদ্ধের নাতি। দাদুর সাথে ঝগড়া করে না-খেয়ে বাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়েছে। বাড়ি ফেরেনি। এদিকে নাতির জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধ। তাই জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে।'

কথাটা শুনে মুহূর্তখানেক ঠোঁট কামড়ে চুপ করে যেন ভাবার চেষ্টা করলেন শাও। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটু আগেই তেমন একটা ছেলেকেই দেখলাম. ড্রাগন কিং-এর মন্দিরের কাছেই একটা ব্ল্যাক প্যাগোডা কালো রঙের পরিত্যক্ত মন্দির আছে। আমার সামনে দিয়েই তো বাচ্চাটা সেই মন্দিরে ঢুকল।'

জুয়ান বললেন, 'চলো তো দেখি সেখানে ওয়াংকে পাওয়া যায় কিনা?'

মিস্টার শাও বললেন, 'চলুন আমিও যাচ্ছি আপনাদের সাথে, প্যাগোডাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

দীপাঞ্জনরা হাঁটতে শুরু করল মিস্টার শাও-এর সাথে। প্রথমে সেই ড্রাগন কিং-এর মন্দিরের কাছে পৌঁছল তারা। তারপর তাকে বাঁ পাশে রেখে এগোলো কিছুটা দূরে একলা দাঁড়িয়ে থাকা কালো রঙের একটা প্যাগোডার দিকে। এ জায়গাটা জনশূন্য। সূর্য ডুবে গেছে। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন স্থাপত্যের ভিতর জমাট বাঁধতে শুরু করেছে অন্ধকার। বাড়িটার সামনে এসে মিস্টার শাও বললেন, 'চলুন দেখা যাক ছেলেটা ভেতরে আছে কিনা? সাপখোপের ভয় ছাড়া এখানে অন্য কোনও ভয় নেই।'

এই বলে তিনি প্রথমে প্রবেশ করলেন তোরণের ভিতর। মিস্টার শাও-এর পিছনে প্রফেসর জুয়ান আর সবার শেষে দীপাঞ্জন। দীপাঞ্জন হঠাৎই ভিতরে ঢোকার আগে একবার পিছন ফিরে তাকাল। আর তখনই আবার সে দেখতে পেল সেই গালকাটা লোকটাকে। ড্রাগন কিং-এর মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। লোকটা যে সত্যিই তাদের অনুসরণ করছে তা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল দীপাঞ্জন। কিন্তু মিস্টার শাওয়ের সামনে জুয়ানকে কথাটা এখনই জানানো ঠিক হবে কিনা বুঝতে না-পেরে তাদের পিছন-পিছন প্যাগোডাতে ঢুকে পড়ল দীপাঞ্জন। সামনে একটা লম্বা বারান্দা। সেটা সোজা গিয়ে মিশেছে প্রার্থনা-কক্ষে। পুরু ধুলোর রাশি ছড়িয়ে আছে মাটিতে। তারা এগোল সেই প্রার্থনা-কক্ষের দিকে। প্রার্থনা-কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। বিশাল ঘরটার মধ্যে আধো অন্ধকার খেলা করছে। মূর্তি ইত্যাদি কিছু জিনিসপত্রও আছে মনে হয়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে একবার হেঁচে রুমালে নিজের মুখ-চাপা দিয়ে মিস্টার শাও বললেন, 'আমার আবার ডাস্ট এলার্জি শুরু হল। এই ধুলো ভর্তি ঘরে আমি ঢুকব না। আপনারা ঢুকে দেখুন ছেলেটা কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা! আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।'

প্রার্থনা-কক্ষের ভিতর প্রবেশ করল দীপাঞ্জন আর জুয়ান। ধুলো-ভর্তি ঘর। ভাঙা মূর্তি-সহ নানা জঞ্জাল পড়ে আছে নানা জায়গাতে। ছাদের থেকেও একটা অংশ খসে পড়েছে মেঝেতে। আবছা আকাশ দেখা যাচ্ছে। এ ঘরে কোনও জানলা নেই। ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল দুজন। তারা দেখার চেষ্টা করল ওয়াং কোথাও আছে নাকি? জুয়ান হাঁক দিল, 'ওয়াং তুমি কোথাও আছো?'

ওয়াং-এর কোনও উত্তর এলো না। তবে অন্য একটা শব্দ হলো। ঘরের অন্ধকারটা হঠাৎই যেন গাঢ় হয়ে গেল। দীপাঞ্জনরা দেখতে পেল মিস্টার শাও বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। দীপাঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতে-দিতে বলল, 'মিস্টার শাও দরজা বন্ধ করলেন কেন? দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।'

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাবার পরও দরজা খুলল না, আর শাওয়ের সাক্ষাৎ মিলল না।

দীপাঞ্জন জুয়ানকে বলল, 'এখানে ঢোকার সময় সেই গালকাটা লোকটাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। মনে হচ্ছে সে আসলে শাওয়ের সঙ্গী। আমাদের ওপর শাওই তাকে দিয়ে নজরদারী করাচ্ছিলেন। কিন্তু শাও আমাদের এভাবে আটকে দিলেন কেন?'

জুয়ান বললেন, 'আমার ধারণা আমরা আজকে রাতে ঝাংয়ের বাড়িতে থাকি, তা তিনি চান না। সে জন্যই এখানে আটকে দিলেন। আর একই কারণে তিনি আমাদের অতিথি নিবাসে পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন। তবে এর পিছনে কি উদ্দেশ্য তা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারব না!'

দীপাঞ্জন চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল বাইরে বেরোবার আর কোনও উপায় আছে কিনা। অন্য কোনও দরজা-জানলা নেই ঘরে। প্রাচীন হলেও দেওয়ালের কাঠ খুব পুরু। মাথার ওপরের ছাদে মানুষ গলবার মতো ছিদ্র আছে বটে, কিন্তু তা অনেক ওপরে। দেওয়াল বেয়ে সেখানে পৌঁছবার উপায় নেই। ক্রমশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগল ঘরটা।

।। ৯।।

ঘণ্টাখানেক পর আবার দীপাঞ্জনদের চারপাশে অন্ধকার কাটতে শুরু করল। চাঁদ উঠতে শুরু করেছে বাইরে। মাথার ওপরের ছাদের বড় ফোকরটা দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরে। রাত আটটা নাগাদ প্রায় পরিস্কার আলোতে ভরে গেল ঘরটা। ফোকর দিয়ে চাঁদটা দেখা যাচ্ছে। যেন ঘরটাতে আলো দেবার জন্যই ঘরের ঠিক মাথার ওপরেই উঠেছে চাঁদটা। বিরাট বড় পূর্ণিমার চাঁদ।

সেদিকে তাকিয়ে জুয়ান বললেন, 'যাক আলোটা অন্তত পাওয়া গেল। দিনের আলো ফুটলে ঠান্ডা মাথায় এ-ঘর থেকে বেরোবার উপায় ভাবতে হবে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, ওদিকে বাইরে কী ঘটছে কে জানে? আজ তো ঝাং-এর কাছে ড্রাগনের ডিম ফিরিয়ে নিতে আসার কথা। ওয়াং-ও বাড়ি ফিরল কিনা কে জানে?'

জুয়ান বলল, 'আমার ধারণা ওই ড্রাগনের ডিমের সাথেই সব ঘটনা যুক্ত।'

এরপর আর কোনও কথা না-বলে চুপচাপ বসে রইল তারা দুজন। বাইরে রাত বেড়ে চলল, ন'টা-দশটা-এগারোটা বারোটা...

তখন রাত প্রায় দেড়টা হবে। চোখে একটু ঝিমুনি লেগে গেছিল দীপাঞ্জনদের। জুয়ানের খোঁচা খেয়ে দীপাঞ্জন তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপর দিকে তাকাতেই দেখতে পেল মাথার ওপরের সেই ফোকর দিয়ে উঁকি মারছে একটা মুখ।

তাকে চিনতে পারল দীপাঞ্জনরা। এ যে ওয়াং।

প্রফেসর জুয়ান তার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দরজা খুলে দাও ওয়াং। আমাদের এখানে আটকে রাখা হয়েছে।' কিন্তু পরক্ষণেই কোনও জবাব না-দিয়ে ফোকরের মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়াং।

আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার বাইরে একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল। তবে কি ওয়াং দরজা খুলতে এল? দীপাঞ্জনও এবার উঠে দাঁড়াল।

দরজা খুলে গেল ঠিকই। কিন্তু যে দরজা খুলল সে ওয়াং নয়, মিস্টার শাও। ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি।

তাকে দেখে জুয়ান ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি আমাদের আটকে রেখে গেছিলেন কেন?'

শাও জবাব দিলেন, 'আমি চাইনি আপনারা ঝাং-এর বাড়িতে রাত্রিবাস করুন। তাই ভেবেছিলাম এখানে আর আসব না, আপনাদের সাথে আর দেখা হবে না আমার। কিন্তু আসতেই হল। আপনাদের আটকে না-রাখলে ভুল করতাম। আপনারা যে ঝাং-এর থেকে জিনিসটা হাতিয়ে ফেলেছেন তা বুঝতে পারিনি।

দীপাঞ্জন বলে উঠল, 'কী বাজে কথা বলছেন আপনি? আপনার ইচ্ছা হলে আপনি আটকে রাখবেন আমাদের? আমরা কোনও জিনিস হাতাইনি।'

শাও বললেন, 'নিশ্চয়ই হাতিয়েছেন। ঝাং-এর ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি সেটা পাইনি। এবার ড্রাগনের ডিমটা দিন। কাছে না-থাকলে কোথায় সেটা লুকিয়ে রেখেছেন বলুন? আপনাদের ঘরেও যে সেটা নেই তা আমি খুঁজে দেখে এলাম।'

জুয়ান বললেন, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? ডিম আমরা নিইনি। আমরা এবার বেরোবো। পাগলামি ছাড়ুন।'

শাও বলে উঠলেন, 'ওই ডিমের খোঁজ না-দিলে কোনো দিন আর এ-ঘরের বাইরে বেরোতে পারবেন না।'

দীপাঞ্জন বলল, 'দেখি কীভাবে আটকান? এখান থেকে বেরিয়ে আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাব আপনার নামে।'

এই বলে দীপাঞ্জন এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু শাও তার ডানহাতটা দীপাঞ্জনের দিকে তুলে ধরলেন। চাঁদের আলোতে দেখা গেল ঝিলিক দিচ্ছে একটা রিভলবার। থেমে গেল দীপাঞ্জন।

শাও বললেন, 'এক পা এগোলে মাথার খুলি ফুটো করে দেব। আমার হাতে বেশি সময় নেই, ডিমটা কোথায়? পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে জুয়ান একটু নরম স্বরে বললেন, 'আপনি কিন্তু সত্যিই ভুল ভাবছেন মিস্টার শাও। ও ডিম আমাদের কাছে নেই।'

শাও, দাঁত কিড়মিড় করে বললেন বিশ্বাস করি না। হয় তোমরাও আমার মতো ডিমের সন্ধানে এসেছিলে অথবা মিউজিয়ামের ছবিটা দেখার পর ডিমটা হাতিয়েছ। বেশি চালাক সাজার জন্য তোমরা ওই ডিমের কথা বারবার বলছিলে।'

দীপাঞ্জনরা মিস্টার শাওয়ের কথার কী জবাব দেবে তা বুঝতে না-পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মিস্টার শাও বললেন, 'নিন, বলে ফেলুন। আমার হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই।'

জুয়ান বললেন, 'এমনও তো হতে পারে, জিনিসটা অন্য কেউ সরিয়েছে?'

শাও বললেন, 'যে সেটা নেবার জন্য এসেছিল সে এখন খুনের দায় মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া আজ সকাল থেকে সারাদিন বাড়িটার ওপর নজর ছিল আমার। সে সেখানে যায়নি।'

এ-কথা বলেই মিস্টার শাও হিংস্রভাবে বললেন, 'আর সময় নষ্ট করা যাবে না। আমি পাঁচ গুনব। তারপর গুলি চালাব। মানুষ মারতে আমার হাত কাঁপে না। কাল রাতেই একজনকে তলোয়ারের কোপে দু-টুকরো করেছি।'

কথাটা শুনে চমকে উঠল দীপাঞ্জনরা। শাও রিভলবার তাক করে গুনতে শুরু করলেন, 'এক-দুই-তিন... ।' ঠিক এই মুহূর্তেই ঘরটা যেন এক নিমেষের জন্য আবছা হয়ে গেল। কারো শরীরের আড়ালে যেন ঢেকে গেল চাঁদটা। আর তারপরই আকাশ থেকে উড়ে নেমে এসে শাও আর দীপাঞ্জনদের মাঝে এসে দাঁড়ালো কালো পোশাক-পরা একজন। তবে তার মুখের ঢাকনা খোলা থাকায় তাকে চিনতে পারল সবাই। লোকটা হল তাও-লি। তার হাতে একটা ন্যান-চা। পোশাকের ভিতর পেটের কাছটা খুব ফোলা। ছোটোখাটো কোনও একটা জিনিস রাখা।

তাকে দেখে মিস্টার শাও বলে উঠলেন, 'তুমি পালাওনি এখনও। তোমাকে যে খুনের দায়ে পুলিশ ধরবে?'

তাও-লি বলল, 'সে দেখা যাবে। তোমাকে কাল বিকালে খেলা দেখাবার সময় আমি চিনতে পেরেছিলাম হুয়ান। সেজন্যই আমার মনসংযোগ নষ্ট হয়, তলোয়ারের আঘাত লেগে হাত চিরে যায়। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম যে তুমি ঘুমন্ত লোকটাকে খুন করেছ আর এই নিরীহ লোকদুজনকেও মারতে যাচ্ছিলে। ডিমের ঝুড়ি ওদের কাছে নয়, আমার কাছে।' এই বলে সে হাত দিয়ে তার ফোলা পেটটা দেখাল।'

তাও-লি-র কথা শুনে শাও ওরফে হুয়ান নামের লোকটা বলল, 'তাহলে তো ভালোই হল। দাও ওটা দিয়ে দাও। সময় নষ্ট করো না।'

তাও-লি বলে উঠল, 'তোমার সময় এবার সত্যি শেষ হয়ে এসেছে। কথাটা বলেই সে হুয়ানকে সম্ভবত আক্রমণ করার জন্য বিদ্যুৎগতিতে ন্যান-চা ঘোরাতে শুরু করল।

হুয়ান চিৎকার করে উঠল, 'জিনিসটা তুমি দেবে না। দেখাচ্ছি মজা।' এই বলে সে রিভলবার তাক করল তাও লি-র দিকে। তারপর গুলি চালিয়ে দিল।

কিন্তু সে গুলি তাও লি-র শরীর স্পর্শ করল না। ফ্যানের ব্লেডের মতো ঘুরতে থাকা ন্যান-চা তে গুলিটা আঘাত পেয়ে অন্যদিকে ছিটকে পড়ল। পাকা মার্শাল আর্ট খেলুড়েরা ন্যান-চা ঘুরিয়ে গুলি আটকে দিতে পারে এ কথাটা কোথায় যেন পড়েছিল দীপাঞ্জন। এবার সে চাক্ষুষ করল ব্যাপারটা।

ন্যান-চা ঘুরিয়ে হুয়ানের চারপাশে পাক খেতে শুরু করল তাও লি। হুয়ানও পিস্তল বাগিয়ে চারদিকে ঘুরে চলেছে দ্বিতীয়বার গুলি চালাবার জন্য। কিন্তু ঠিক সেই সময় কোথা থেকে উদয় হল ওয়াং। আর তাকে দেখতে পেয়েই হুয়ান এক লাফে তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে পাকড়ে ধরে মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে বলল, 'কেউ কিছু করার চেষ্টা করলে বাচ্চাটাকে গুলি করে মারব। ন্যান-চা ফেলে দাও।'

ন্যান-চা ঘোরানো থেমে গেল তাও লি-র। তারপর সে ন্যান-চা ফেলে দিল হাত থেকে।

হুয়ান নামের লোকটার ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি। সে তাও লিকে বলল, 'ডিমের ঝুড়িটা বার করে মেঝেতে নামিয়ে রাখ। তারপর সবাই হাত মাথার ওপরে তুলে ঘরের শেষ প্রান্তে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও।'

তাও লি এ-নির্দেশ পালন করার আগে একটু ইতস্তত করতেই হুয়ান তার রিভলবারের নলটা ওয়াং-এর হাঁ-করা মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। হিংস্র চাহনি লোকটার চোখে। যেন এখনই গুলি চালিয়ে বাচ্চাটাকে শেষ করে ফেলবে সে। অগত্যা তাও লি তার পোশাকের ভিতর থেকে ঝুড়িটাকে বার করে আনল। ঢাকনাওয়ালা ছোট্ট একটা বেতের ঝুড়ি। সে সেটাকে মাটিতে নামিয়ে দু'হাত মাথার ওপর তুলে দেওয়ালের দিকে পিছু হটতে লাগল। একই কাজ করল দীপাঞ্জনরাও। দু-হাত তুলে তারা সার বেঁধে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে ঝুড়ির দিকে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল হুয়ান। ঝুড়িটার সামনে এসে ওয়াংকে এক ধাক্কা দিয়ে একপাশে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর তার রিভলবার দীপাঞ্জনদের দিকে তাক করে হুয়ান হাঁটু মুড়ে বসল ঝুড়িটার সামনে। বাঁ-হাত দিয়ে সে ঝুড়ির ঢাকনাটা খুলে ফেলল ডিমটাকে নেবার জন্য।

ঝুড়ির ভিতর তার বাম হাতটা ঢোকালো হুয়ান। আর এর দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই হুয়ানের মুখটা যেন আকস্মিক কোনও যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল। ঝুড়ি থেকে হাতটা বার করে আনল হুয়ান, হাতটা একটু উঁচু করে চোখের সামনে মেলে ধরল। বিস্ফারিত হুয়ানের চোখ। চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হুয়ান তারপর হাতটা ঝাড়া দিতে লাগল কোনও ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। এরপর হঠাৎই যেন সে স্থির হয়ে যেতে লাগল। হাত দুটো শিথিল হয়ে গেল। রিভলবারটা মাটিতে খসে পড়ে শব্দ তুলে একটা গুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল। কয়েকবার দুলে উঠল লোকটা। তারপর দড়াম করে ছিটকে পড়ল মাটিতে। তার দেহের ধাক্কায় ঝুড়িটা গড়িয়ে গেল কয়েক হাত। প্রথমে ব্যাপারটা বোধগম্য হল না কারোরই। এটা লোকটার কোনও চালাকি নয় তো। হুয়ান আর নড়ছে না দেখে তাও লি হঠাৎই মার্শাল আর্টের ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গিয়ে রিভলবারটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটা তাক করল মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা হুয়ানের দিকে। দীপাঞ্জন আর জুয়ানও ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়ালো। মাটিতে পড়ে আছে হুয়ান। বিস্ফারিত চোখ, ঠোঁটের কোণ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। আর এরপরই তারা দেখল লোকটার বাঁ হাতের তালুতে কালো ফিতের মতো ইঞ্চি তিনেক লম্বা কী যেন একটা নড়ছে। দীপাঞ্জনরা এরপর তাকাল ঝুড়িটার দিকে। সেটা উল্টে তার ভিতর থেকে ডিমের ভাঙা খোলস বেরিয়ে পড়েছে। ডিম ফুটেছে ঠিকই, তবে তার ভিতর থেকে ড্রাগনের বাচ্চা নয়, বেরিয়েছে সাপের বাচ্চা। যে কামড়ে ধরে আছে হুয়ান নামের লোকটার হাত।

।। ১০।।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাও লি বলে উঠল, 'কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কাল মাঝরাত থেকে তো ঝুড়িটা পেটের মধ্যে নিয়ে ঘুরছিলাম। ভাগ্যিস ডিমটা ভিতরে আছে দেখে নিয়ে ঝুড়িটা আর খুলিনি।'

দীপাঞ্জন বলল, 'তুমি ঝুড়িটা পেলে কী ভাবে? ওয়াং দিয়েছিল?'

মাটিতে পড়ে-থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে তাও লি বলল, 'এ লোকটা হল একজন দাগী অপরাধী। সাংহাইতে মাদক আর চোরাই প্রত্নবস্তুর ব্যাবসা চালায়। ওকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ও আমার পিছু ধাওয়া করে এখানে হাজির হয়েছে। সাংহাইতে আমার একটা ছোট কিউরিও-শপ আছে। সেখানেই আমার সাথে ওর পরিচয়। আমি তখনও ওর আসল পরিচয় জানতাম না। অসতর্ক মুহূর্তে আমি একবার ডিমের গল্পটা ওর কাছে করে ফেলেছিলাম। ঝাং-এর কাছ থেকে চিনা ক্যালেন্ডারের ড্রাগন পূর্ণিমার দিন আমার ডিমটা ফেরত নেবার কথা ছিল। কিন্তু হুয়ানকে দেখতে পেয়েই বুঝতে পারলাম পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। ধোঁকা দিতে হবে হুয়ানকে। তাই নিজেই নিজের প্রাপ্য জিনিস চুরি করার জন্য গতরাতে হানা দিলাম, আপনাদের ওখানে ঝাং-এর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ঘুমাচ্ছিল সে। ডিমের ঝুড়িটা খুঁজতে যাচ্ছি এমন সময় ওয়াং ফিরে এল। আমি খাটের তলায় লুকিয়ে পড়লাম। চাঁদের আলো ঢুকেছিল ঘরে। দেখলাম ওয়াং এসে তাকে রাখা ঝুড়িটা নিয়ে কী যেন করল। তারপর সে বিছানাতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেই আমি ঝুড়িটা নিয়ে তার ভিতর ডিম আছে দেখে সেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম...।

জুয়ান বললেন, 'তার মানে কালো পোশাক-পরা আমরা যাকে আমাদের ঘরের ভিতর থেকে বাইরে দেখেছিলাম সে হলে তুমি। আমার কেমন যেন একবার সন্দেহ হয়েছিল। মার্শাল আর্ট জানা না-থাকলে ও ভাবে কেউ লাফাতে পারে না।'

তাও লি বলল, 'তাই হবে।'

দীপাঞ্জন জানতে চাইল, 'তারপর?'

তাও লি বলল, 'আমি সোজা ফিরে গেলাম আমার আস্তানাতে। সেখানে ফিরে দেখি ভয়ঙ্কর কান্ড। খুন হয়ে গেছে বাড়ির মালিক। কী কুক্ষণেই যে আমার পোশাক গায়ে দিয়ে সে ঘুমাতে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারলাম হুয়ানই খুনটা করেছে আমাকে মেরে ফেলে ডিমটা নিয়ে পালাবার জন্য। কিন্তু খুনটা দেখেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম আমাকে লুকোতে হবে। আর সুযোগ বুঝে এই নিষিদ্ধ নগরী ছেড়ে পালাতে হবে। তাই ডিমের ঝুড়ি নিয়ে আমি এসে লুকিয়ে পড়লাম ড্রাগন কিং-এর মন্দিরের একটা ঘরে। সেখানেই আজ সকালে ওয়াং-এর সাথে দ্বিতীয়বার দেখা আমার। সে অবশ্য এখনও জানত না যে ঝুড়িটা আমার কাছে আছে। তারপর দুপুরে সে আবার এলো। আমরা বাড়ির ভিতর থেকে দেখলাম, হুয়ানের সাথে আপনারা এ-বাড়িতে ঢুকছেন। তখন কিন্তু আমার এও সন্দেহ হয়েছিল যে আপনারা হুয়ানের লোকও হতে পারেন। রাতে তাই চালে উঠে দেখতে গেছিলাম ভিতরে আপনারা কী করছেন? আর তারপর...।'

দীপাঞ্জন বলল, 'এই হুয়ানের সাথে আর একজন লোক ছিল। গালে কাটা দাগ। এ বাড়িতে ঢোকার সময়েও আমি তাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমিই সেই লোক।'

দীপাঞ্জনরা কণ্ঠস্বর শুনে তাকাল দরজার দিকে। ঘরে প্রবেশ করল গালে কাটা দাগওয়ালা সেই লোকটা। তখন পুরোদস্তুর পুলিশের ইউনিফর্ম তার পরনে। সঙ্গে আরও কয়েকজন পুলিশকর্মী, ও সব শেষে একজন পুলিশকর্মীর কাঁধে ভর দিয়ে লাঠি হাতে বৃদ্ধ ঝাং। তার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। ওয়াং ঝাংকে দেখতে পেয়েই একছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে।

গালে কাটা দাগ লোকটা বললেন, 'আমার নাম অফিসার ফোডোং। হুয়ানের ঝুড়িতে হাত ঢোকানো থেকে আপনাদের কথোপকথন আমি এতক্ষণ ধরে দরজার আড়াল থেকে শুনেছি। মিস্টার তাও, আপনি যদি আজ সকালে বা কাল রাতে খুনটা দেখার পর পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতেন তাহলে ব্যাপারটা এত কঠিন হত না। আপনারাও বিপদে পড়তেন না, আর বৃদ্ধ ঝাংকেও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে হত না। ঝাং-এর বাড়ি ডিমটার জন্য হানা দিয়েছিল হুয়ান। ডিম না-পেয়ে গুলি চালিয়েছিল। মাথার চামড়া ঘেঁষে গুলিটা বেরিয়ে গেছে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিলেন ঝাং। হুয়ান ভেবেছিল যে মরে গেছে। আমরা গিয়ে ঝাং-এর জ্ঞান ফেরাই। কাজটা করে এখানে চলে এসেছিল সে। কথাগুলো বলে অফিসার ফোডোং এগিয়ে গেলেন হুয়ানের দেহের দিকে। ততক্ষণে মরে কাঠ হয়ে গেছে হুয়ান। সাপের বাচ্চাটা তখনও কামড়ে ধরে আছে তার হাত। সেদিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, 'কী ভয়ঙ্কর বিষ এই ছোট্ট সাপটার, একটা মানুষকে মেরে ফেলল।'

দীপাঞ্জন বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না ড্রাগনের ডিম সাপের ডিমে বদলে গেল কীভাবে?'

তাও লি বলল, 'আমি কিন্তু ঝুড়িটা ঝাং-এর ঘর থেকে নেবার পর একবারও খুলিনি। কারো কাছে রাখতেও দিইনি।'

কথাটা শুনে বৃদ্ধ ঝাং বলে উঠলেন, 'তুমিই তবে ডিমটা সরিয়েছিলে? কে তুমি?'

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ঝাং-এর দিকে তাকিয়ে রইল তাও লি। তারপর সে একটানে তার জামাটা খুলে ফেলল। মাথার ওপর থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঠিক তাও লি-র শরীরের ওপর। তার গায়ের সেই বিরাট ড্রাগনের উল্কির ওপর। শরীরটাকে মোচড় দিয়ে উল্কিটা ভালো করে দেখাল তাও লি। আর সেটা দেখেই বৃদ্ধ ঝাং ধীরে-ধীরে বসে পড়ে মাথা ঝোঁকাল। তার গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল—ড্রাগন।

তাও লি বলল, 'হ্যাঁ ড্রাগন। মিং সম্রাটের শেষ বংশধর তাও লি মিং। এই উল্কি চিহ্ন দেখিয়েই তো ড্রাগনের ডিমটা আজ রাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমার। যে ডিম বংশ-পরম্পরায় তোমরা রেখেছিলে তোমাদের কাছে।'

ঝাং বললেন, 'হ্যাঁ, আমার পূর্বপুরুষদের মতো আমিও প্রতি ড্রাগন-পূর্ণিমাতে অপেক্ষা করে থেকেছি কবে আপনারা আপনাদের ডিম ফিরিয়ে নেবেন বলে।'

দীপাঞ্জন বুঝতে পারল, ঝাং যে তার নাতিকে 'ড্রাগন' আসবে বলেছিল সেটা মিথ্যা নয়। মিং রাজবংশের লোকদের 'ড্রাগন' নামেই সম্বোধন করা হত। পুলিশ অফিসার ফোডোং-ও এবার তার মাথার টুপিটা খুলে ফেললেন মিং রাজবংশের শেষ প্রতিনিধিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

বৃদ্ধ ঝাং এরপর লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও-ডিম আমার কাছে নেই। ডিমটা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। এর জন্য আপনি যা শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব। শুধু আমার নাতির যেন কোনও অভিশাপ না-লাগে।' কান্নায় যেন ভিজে এল বৃদ্ধ ঝাং-এর গলা।

পুলিশ অফিসার ফোডোং বললেন, 'কিন্তু জিনিসটা গেল কোথায়? সেটা তো খোঁজা দরকার।'

সবাইকে চমকে দিয়ে ওয়াং এবার বলল, 'ওটা কোথায় আছে আমি জানি। ড্রাগন কিং-এর মন্দিরে যে ঘরে সাপ ডিম নিয়ে বসে আছে সেই ডিমের মধ্যে। দাদু বলেছিল ড্রাগন আসবে ডিম নিতে। দাদু তাকে ডিমটা দিয়ে দেবে। তাই গতকাল রাতে দাদু আফিম খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি ঝুড়ি থেকে ডিম নিয়ে ওখানে যাই। তারপর ডিমটা সাপের ডিমের মধ্যে রেখে সাপের একটা ডিম নিয়ে ফিরে এসে সেটা রেখে দিয়েছিলাম ঝুড়িতে।'

কথাটা শুনে দীপাঞ্জন বলে উঠল, 'এমন ভয়ঙ্কর কাজ তুমি করলে কীভাবে?'

ওয়াং বলল, 'সঙ্গে ইঁদুর নিয়ে গেছিলাম যে। সাপটা অনেক দিন খায়নি। ঘরের কোণে দড়ি বেঁধে ইঁদুর ছাড়তেই সে ডিম ছেড়ে ইঁদুর খেতে গেল। আর আমিও ডিম পাল্টে নিলাম।'

তার সাহসের কথা শুনে তাও লি মিং এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'সত্যিই তুমি মার্শাল আর্ট শেখার উপযুক্ত। আমি শেখাব তোমাকে।'

পুলিশ অফিসার ফোডোং বললেন, 'চলুন এবার এখান থেকে ফেরা যাক। ডিমটা উদ্ধারের যা ব্যবস্থা করার আমি করছি। ভোরের আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

সকাল হয়েছে। বৃদ্ধ ঝাং-এর ঘরে বসেছিলেন সবাই। তাও লি মিং পুলিশ অফিসার ফোডোং, ঝাং, ওয়াং, দীপাঞ্জন, জুয়ান সবাই। ব্ল্যাক প্যাগোডা থেকে তারা সবাই এখানেই ফিরে এসেছে। অফিসার ফোডোং তার কর্মীদের পাঠিয়েছেন ড্রাগনের ডিমটা উদ্ধার করে আনার জন্য। তাও লি মিং গল্প করছিলেন কীভাবে তাদের মিং বংশের পতন হয়েছিল। পালাবার সময় তার পূর্বপুরুষরা ডিমটা রেখেছিলেন তাদের অতি বিশ্বাসী এক ভৃত্য ঝাং-এর এক পূর্বপুরুষের কাছে। কীভাবে মিং সম্রাটদের উত্তরপুরুষরা বিগত সাড়ে তিনশো বছর ধরে পূর্বপুরুষদের থেকে জেনেছেন ডিমটা কোথায় আছে সে গল্প। কেউ-কেউ নাকি ডিমটা এসে দেখেও গেছিলেন ঝাং-এর পূর্বপুরুষদের কাছে। এসব নানা গল্প শুনতে-শুনতেই ডিমটা নিয়ে ফিরে এল পুলিশকর্মীরা। ডিমটা পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দিয়ে তারা জানাল, 'সাপ আর তার বাচ্চারা নাকি আর নেই। সব ডিম ফুটে বেরিয়ে গেছে। এই একটিই ডিম সেখানে ছিল।'

পুলিশ অফিসারের ডিমটা তুলে দিলেন তাও লি মিং-এর হাতে। পূর্বপুরুষের জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। এই ডিম নিয়ে শৈশবে খেলা করতেন তার পূর্বপুরুষেরা।

জিনিসটা যার সম্পত্তি সেটা তার হাতে ফেরত যাওয়াতে বৃদ্ধ ঝাং-এর মুখেও আনন্দের আভাস। হঠাৎ জুয়ান বললেন, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, যে সম্রাটদের এত সোনা-হিরে-জহরত ছিল তাদের শিশুরা সেরামিকের ডিম নিয়ে খেলত কেন? আর এ-জিনিসটার বর্তমানে একটা অ্যান্টিক মূল্য আছে সত্যি, কিন্তু খুব বেশি তো নয়। তার জন্য এত খুন-জখম-গোপনীয়তা কেন?'

প্রশ্নটা শুনে মিং সম্রাটের বংশধর কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে জুয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। এ-প্রশ্ন অন্যদের মাথাতেও আসা উচিত ছিল। যারা হিরে-জহরতের মধ্যে মানুষ হতেন, মিং সম্রাট পরিবারের শিশুরা নিছক সেরামিকের ডিম নিয়ে খেলতে পারে না। সত্যিটা তবে আপনাদের জানাই। এই বলে তিনি নখ দিয়ে ডিমের ঠিক মাঝবরাবর চারপাশে খুঁটতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানের চলটা খসে একটা প্যাঁচ দেখা দিল। তাও লি মিং মোচড় দিয়ে ডিমটা দুখণ্ড করতেই জানলা দিয়ে আসা সূর্যালোকে ডিমের ভিতরটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। ডিমের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ইঞ্চি দুই লম্বা একটা সোনার ড্রাগন মূর্তি। দুর্মূল্য পাথরখচিত তার শরীর। জিনিসটার কত দাম হতে পারে তা ধারণা নেই দীপাঞ্জনদের। হয়তো-বা কয়েক কোটি টাকা। তাও লি মিং বললেন, 'হ্যাঁ, এমনই একটা করে ড্রাগন মূর্তি লুকানো থাকতো প্রত্যেকটা ডিমের মধ্যে। যা বাইরের কেউ জানত না। দুঃসময়ে কাজে আসত জিনিসগুলো।'

দীপাঞ্জন আর জুয়ান চেয়ে রইল আশ্চর্য সুন্দর দুর্মূল্য প্রাচীন সেই ড্রাগন মূর্তির দিকে। আর সেটার দিকে তাকিয়ে ওয়াং বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'ডিম ফুটে ড্রাগনের ছানা বেরোল।'

জম্ভলা দেবতার পুরোহিত

বেশ ক'দিন বৃষ্টির পর মেঘ কেটে গেছে। ঝলমলে এক সকাল। নীল আকাশের বুকে জেগে আছে অনেক দূরে সার সার পর্বতমালা। ট্যুরিস্টরাও নেমে পড়েছে রাস্তায়। দু-পাশে সার সার দোকানপাট। কোনওটা রংচঙে শীতবস্ত্রের, কোনওটা অর্কিডের দোকান বা সুভেনিরের দোকান, কোনওটা আবার হাল ফ্যাশনের কেতাদুরস্ত শোরুম। এ ছাড়া ছোটোবড়ো হোটেল-রেস্টুরেন্ট তো আছেই। আর যেটা আছে তা হল ফুটপাথে কিছুটা দূর অন্তর অন্তর মোমোর দোকান। রাহুল আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে এ রাস্তায়। গত কয়েক বছর ধরে কাজের সূত্রে তাকে বেশ কয়েকবার আসতে হয়েছে এই পাহাড়ি শহর কালিম্পঙে। এখানকার রাস্তাঘাট তাই মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে তার। গত ক'দিন অফিসের কাজের চাপে আর বৃষ্টির জন্য হোটেল আর অফিস করেই তার সময় কেটেছে। কাজ শেষ হয়েছে, আর চাপ নেই। তাই সকাল নটা নাগাদই সে বেরিয়ে পড়েছিল। বেশ ভালোই লাগছিল তার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে। একসময় নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছে গেল রাহুল। ফুটপাথের গা বেয়ে ছোটো ছোটো সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। রাস্তার দু-পাশে বড়ো বড়ো বাড়িঘর বেসমেন্টেও সার সার দোকান আছে। তাদের উপস্থিতি না জানলে সেই দোকানগুলো ট্যুরিস্টদের চট করে ঠিক চোখে পড়ে না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে রাহুল এসে দাঁড়াল একটা দোকানের সামনে। হ্যাঁ, এই দোকানটাই। দোকানের মাথার ওপর ইংরেজি হরফে লেখা আছে 'মলমল অ্যান্ড কোং'। কিউরিয়ো অ্যান্ড আর্ট ডিলার, কালিম্পং। দরজার ঠিক দু-পাশে দেওয়ালের গায়ে আটকানো আছে দুটো দন্তবিকশিত কাঠের মুখোশ। তাদের দিকে তাকালেই কেমন যেন অস্বস্তি হয়। হয়তো বা সেগুলো কোনও তিব্বতি অপদেবতার মুখোশ হবে। বছরখানেক আগে কালিম্পঙের এক হোটেল মালিক রাহুলকে সন্ধান দিয়েছিল এই কিউরিয়োর দোকানের। অনেকের যেমন গণেশমূর্তি সংগ্রহের শখ থাকে, তেমনই রাহুলেরও শখ হল বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করা। এর আগে সে বেশ কয়েকবার এসেছে এই দোকান থেকে মূর্তি কিনতে। তিন-মাস আগেও একবার এসেছিল একটা বুদ্ধমূর্তির অর্ডার দিতে। রাহুলের মতো সাধারণ মানুষদের তো আর লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে অ্যান্টিক মূর্তি কেনার ক্ষমতা থাকে না। তাই সাধারণ সংগ্রাহকদের শখ মেটাতে এরা আগাম অর্ডার দিলে আসল অ্যান্টিক মূর্তির পাশাপাশি ছোটোখাটো ধাতুর মূর্তি বানিয়ে দেয়। যেগুলো দেখতে অ্যান্টিক মনে হলেও আসলে তা নয়। তিন মাস আগে এই দোকানে এসে তেমনই এক বুদ্ধমূর্তি বানাবার জন্য অগ্রিম দিয়ে গিয়েছিল রাহুল। সেটা সংগ্রহ করার জন্যই দোকানটাতে হাজির হয়েছে সে।

রাহুল দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই বাইরের পৃথিবীর কোলাহল যেন মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল। তার নাকে এসে লাগল একটা অদ্ভুত গন্ধ। পুরোনো জিনিসের গন্ধ। বেশ বড়ো একটা ঘর। দেওয়ালের গায়ে শোকেসে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সব মূর্তি, পাত্র, নেপালি কুকরি, তিব্বতি তলোয়ার ইত্যাদি। মাথার ওপর কোথাও ছাদ থেকে ঝুলছে 'থাংকা' বা তিব্বতি মন্ত্র লেখা প্রাচীন রেশমি কাপড়, কাঠের বা ধাতুর নানা ধরনের মুখোশ, রুপো বা হাড়ের তৈরি চোঙাকৃতি শিঙা, ডুগডুগি ধরনের বাদ্যযন্ত্র। ঘরের কার্পেট মোড়া মেঝেতে, ঘরের কোণগুলোতেও রাখা আছে পাথর বা কাঠের তৈরি বিভিন্ন মূর্তি। অ্যান্টিক জিনিস সব। দেখেই বোঝা যায় সেগুলো একসময় কোনও প্রাচীন স্থাপত্যের অংশ ছিল। আর ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা আছে একটা স্টাফ করা চিতাবাঘ।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘাড়টা একটু পিছনে ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাহুল এর আগে যখন দোকানে এসেছিল, তখন দোকানের মালিক মলমল কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ওই বাঘটার বয়স নাকি দেড়শো বছর। ইংরেজেরা যখন পাহাড়ের জঙ্গল কেটে এখানে বসতি স্থাপন করছে, তখন এখন যেখানে কালিম্পঙের জনবহুল ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, ঠিক সেই জায়গাতেই এক সাহেব নাকি মেরেছিলেন বাঘটাকে। এ বাঘটার ছবি দোকানের ক্যাশমেমোতেও ছাপা আছে।

ঘরের এক কোণে সেলস কাউন্টার। সেখানে দোকান-মালিক মাঝবয়সি শেঠ মলমলকে দেখতে পেল রাহুল। তাঁর সামনে রাহুলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে টুপি-ওভারকোট পরা একজন লোক। রাহুল কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াতেই তারা দুজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে। মলমল রাহুলকে চিনতে পেরে বললেন, 'ও, আপনার সেই বুদ্ধমূর্তিটা তো? স্কেলিটন বুদ্ধমূর্তি। এসে গেছে ওটা।'—এই বলে তিনি তাঁর পিছনের শোকেস থেকে একটা ইঞ্চি ছয়েক লম্বা বুদ্ধমূর্তি বার করে এগিয়ে দিলেন রাহুলের হাতে। রাহুল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল সেটা। বেশ বানিয়েছে মূর্তিটা। কঙ্কাল বুদ্ধমূর্তি বা স্কেলিটন বুদ্ধমূর্তি। গৌতম যখন তপস্যায় বসেছিলেন, তখন অনাহারে তাঁর চেহারা কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল। অস্থিপঞ্জর প্রস্ফুটিত এই ধ্যানস্থ মূর্তিটা দেখে বেশ খুশি হল রাহুল। সে এর পর পকেট থেকে অগ্রিম বাবদ দু-হাজার টাকার রসিদ ও বাকি তিন হাজার টাকা বার করে দিল শেঠ মলমলের হাতে। শেঠ মলমল সেগুলো নিয়ে পাকা রসিদ লিখতে শুরু করলেন। রাহুল চারপাশের শোকেসের দিকে তাকিয়ে নতুন কোনও ছোটো বুদ্ধমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় কি না তা দেখার চেষ্টা করতে লাগল। শোকেসে নয়, হঠাৎই তার চোখ পড়ল অন্য একটা অদ্ভুত মূর্তির ওপর। সেটা তার সামনেই একপাশে কাউন্টারের ওপর রাখা আছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দেহের আড়ালে থাকায় সেটা এতক্ষণ নজরে পড়েনি রাহুলের। সেই অদ্ভুত মূর্তিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'এটা কীসের মূর্তি?'

প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্য মৃদু্য দৃষ্টিবিনিময় হল শেঠ মলমল আর রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার মধ্যে। শেঠ মলমল জবাব দিলেন, 'ওটা জম্ভলামূর্তি। তিব্বতি দেবতা। এটাও ফেক। মানে আপনার বুদ্ধমূর্তির মতোই।' আগ্রহী হয়ে রাহুল আরও ভালো করে দেখার জন্য মূর্তিটাকে পাশ থেকে তুলে নিজের সামনে আনল। সেটা তুলতে গিয়েই সে বুঝতে পারল, প্রায় এক ফুট লম্বা মূর্তিটা যথেষ্ট ভারী। রাহুল দেখতে লাগল মূর্তিটা। সত্যিই বড়ো অদ্ভুত দেখতে। বজ্রাসনে বসে আছেন মাথায় মুকুট আর সর্বাঙ্গে অলংকার পরা স্ফীতোদর এক দেবতা। তাঁর ডান পা-টা পেটের কাছে গোটানো আর বাঁ পা বাইরের দিকে একটু প্রসারিত। দেবতার ডান হাতে ধরা আছে ফলজাতীয় কিছু একটা, আর বাঁ হাতে ধরা বেজি বা নেউল ধরনের কোনও প্রাণী। দেবতার পদতলে এক নারীমূর্তি। তার হাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম।

মূর্তিটা ভালো করে দেখার পর রাহুল জানতে চাইল, 'ইনি কীসের দেবতা?'

শেঠ মলল বললেন, 'হিন্দুদের অর্থসম্পদের দেবতা যেমন কুবের, ঠিক তেমনই তিব্বতিদের অর্থসম্পদের দেবতা হলেন এই জম্ভলা। মূর্তির ডান হাতে রয়েছে নরবু। ওটা এক ধরনের ফল। আর বাম হাতে যে বেজি ধরা আছে, জম্ভলাদেব তার পেট টিপলে বেজিটা হিরা-চুনি-পান্না অর্থাৎ রত্ন বমন করে বলে তিব্বতি ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। জম্ভলা দেবতা একই সঙ্গে অপদেবতাদেরও দেবতা। কুবেরের অনুচর যেমন যক্ষরা, তেমনই জম্ভলা দেবতার অনুচর হল অপদেবতারা। এই মূর্তিটার পায়ের নীচে বসে থাকা

নারীমূর্তি আসলে ডাকিনীমূর্তি। অর্থসম্পদ আর অপদেবতাকে বশ করার জন্য জম্ভলা দেবতার পূজা করা হয়।'

দেবতা বেজির পেট টিপলে সে রত্ন বমন করে! রাহুল বেশ অবাক হয়ে গেলে মলমলের কথা শুনে। এর পর সে কৌতূহলবশত আরও কিছু জানতে যাচ্ছিল এই মূর্তিটার বিষয়ে, কিন্তু তার আগেই পাশ থেকে বাংলাতেই একটা প্রশ্ন ভেসে এল —'আপনিও কি অ্যান্টিক কালেক্টর? কলকাতা থেকে এসেছেন?' রাহুলের মুখোমুখি ফিরে দাঁড়িয়েছেন পাশের ভদ্রলোক। উত্তর দেবার আগে রাহুল তাকাল তাঁর দিকে। নিখুঁতভাবে কামানো লোকটার ফরসা মুখমণ্ডলে একটা মঙ্গোলয়েড ভাব আছে। চোখ নরুন-চেরা হলেও দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ। রাহুল হেসে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি কলকাতা থেকে এসেছি। তবে আমি অ্যান্টিক কালেক্টর নই। ইচ্ছা থাকলেও অ্যান্টিক মূর্তি সংগ্রহের সামর্থ্য আমার নেই।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ওই একই ব্যাপার হল। আমিও আপনার মতোই একজন কালেক্টর। তবে আপনি যেমন বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করেন, তেমন আমার শখ হল তিববতি দেবতাদের মূর্তি সংগ্রহ করা। মহাকাল, মঞ্জুশ্রী, তারাদেবী—এসব নানারকম তিববতি দেবদেবীর মূর্তি। তা আপনি তো হোটেল অর্কিড-এ উঠেছেন তা-ই না? আমিও ওখানেই উঠেছি। আপনাকে দেখেছি সেখানে। আমার নাম পদ্ম শ্রীবাস্তব। কলকাতায় বহুদিন আছি। সেখান থেকেই এসেছি।'

রাহুল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, হোটেল অর্কিড-এই। আমি রাহুল।' এই বলে সে করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল শ্রীবাস্তবের দিকে। শ্রীবাস্তবও হাত বাড়ালেন তার দিকে। তাঁর আস্তিনটা গোটানো। করমর্দনের সময় রাহুল লক্ষ করল তাঁর ডান হাতের পাতায়, কবজিতে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। হয়তো ভদ্রলোক কোনও সময় কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন।

তিনি এর পর শেঠ মলমলের উদ্দেশে বললেন, 'এ মূর্তিটা আপনি কত টাকায় বিক্রি করবেন?'

মলমল মূর্তিটা চট করে কাউন্টারের দেরাজে নামিয়ে রেখে বললেন, 'না, এটা আমি বিক্রি করব না।'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'এটা কেন আপনি বিক্রি করবেন না তা আমি জানি। কারণ মূর্তিটা ফেক নয়, আসল মূর্তি, এবং এটা কোন জায়গার জিনিস, তাও আমি অনুমান করতে পারছি।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মলমলের মুখ। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'তবে এটা চোরাই মূর্তি নয়। যেভাবে এ মূর্তি সংগ্রহ করা হয়, সেভাবেই করেছি। এটা আমি নিজের কাছে রাখব বলেই বেচব না।'

শ্রীবাস্তব প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তবে আপনার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। আপনি যখন এই সৌভাগ্যের দেবতাকে সংগ্রহ করেছেন, তখন ওটা আপনার কাছেই থাকুক। কিউরিয়ো ব্যবসায় এসব চলে আমি জানি। আমি এবার চলি।'

শেঠ মলমল তাঁর উদ্দেশে বললেন, 'হ্যাঁ, আসুন। অন্য তেমন কিছু অ্যান্টিক পেলে আপনাকে আমি জানাব।' কথাগুলো বলে তিনি রাহুলকে তার রসিদটা দিলেন। রসিদ আর মূর্তিটা নিয়ে রাহুল শ্রীবাস্তবের সঙ্গেই দোকানের বাইরে বেরোল।

রাস্তায় ওঠার পর শ্রীবাস্তব বললেন, 'আপনি কি হোটেলে ফিরবেন? তবে একসঙ্গে ফিরব।'

রাহুল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ফিরব। একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক। আমি একটা সরকারি চাকরি করি। অডিটর। সেজন্য কালিম্পঙে মাঝে মাঝে আসতে হয়। তা আপনি কী করেন? চাকরি না ব্যবসা?'

শ্রীবাস্তব মৃদু হেসে বললেন, 'আসলে আমার পেশাটা একটু অদ্ভুত। একসময় আমার একটা স্নেক ফার্ম ছিল বারাসতের দিকে। এখন আর নেই। তবে আমি এখন সাপ ধরি সরকারের গবেষণাগারের জন্য। ওর থেকে ভেনাম বার করা হয়। জানেন তো, এই হিমালয়ের জঙ্গলে কিং কোবরা বা রাজগোখরো পাওয়া যায়। বলতে গেলে সে কাজের জন্যই আমার এখানে আসা। দু-দিন আগে ডেলো পাহাড়ের ওদিক থেকে ধরেওছি একটা। এখানে আরও ক'দিন থাকব আমি। লাভা-লোলেগাঁওয়ের দিকে যাব। যদি আরও দু-একটা সাপ ধরা যায়...।'

রাহুল বলল, 'আমার ওদিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা আাছে। আপনার পেশাটা বড়ো অদ্ভুত। তা সাপটাকে নিয়ে কোথায় পাঠালেন?'

শ্রীবাস্তব হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আশা করি ব্যাপারটা আপনি গোপনে রাখবেন। অন্য ট্যুরিস্টরা জানলে ভয় পেতে পারে। সাপটা আমার হোটেলের ঘরেই রাখা আছে। আপনি চাইলে দেখাতে পারি।'

তাঁর কথা শুনে এবার সত্যিই চমকে উঠল রাহুল। সে বলল, 'হ্যাঁ, দেখব।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই হোটেলে ফিরে এল রাহুলরা। দোতলায় রাহুলের একটা ঘরের পরই শ্রীবাস্তবের ঘর। তিনি তাঁর সাপ দেখাবার জন্য রাহুলকে সে ঘরে নিয়ে ঢুকে প্রথমে ভালো করে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর রাহুলকে কিছুটা তফাতে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের এক কোনায় টেবিলের ওপর রাখা বাচ্চা ছেলেদের স্টিলের স্কুল বাক্সর মতো একটু বড়ো একটা কাঠের বাক্সর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেবিলটার গায়েই একটা হাত দুই লম্বা স্টিলের লাঠি রাখা। তার মাথাটা হুকের মতো বাঁকানো। রাহুল চিনতে পারল লাঠিটা। ওকে বলে 'স্নেহ হুক'। ডিসকভারি চ্যানেলে একবার এক সর্পবিশারদের সাপ ধরার ছবি দেখানো হয়েছিল। সেখানে লোকটার হাতে ও লাঠি দেখেছিল রাহুল। শ্রীবাস্তব স্নেক হুকটা তুলে নিলেন হাতে। রাহুলকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বলে এর পর তিনি সন্তর্পণে বাক্সটা খুলে, সাবধানে হুকটা বাক্সর মধ্যে ঢুকিয়ে তার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে ঠেলে বার করে আনলেন বিরাট লম্বা মোটাসোটা একটা সাপ। আকারে অন্তত সেটা দশ ফুট হবে। গায়ের রং কালচে খয়েরি। এতে বড়ো সাপ এর আগে কোনও দিন দেখেনি রাহুল। সাপটাকে তিনি সাবধানে নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। প্রাণীটা এদিক-ওদিকে মৃদু মৃদু মাথা নাড়াচ্ছে, আর বাতাসে ছুড়ে দিচ্ছে তার চেরা জিভ। বিস্মিত রাহুল তাকিয়ে রইল প্রাণীটার দিকে। হঠাৎই সাপটা মাথাটা টেবিল থেকে ফুট তিনেক ওপরে উঠিয়ে ফণা মেলল। তারপর তীব্র শব্দ করল—হি-স-স-স... যেন কোনও কানাডিয়ান স্টিম ইঞ্জিনের শব্দ! রাহুল শিউরে উঠল। এর পরই অবশ্য ফণা নামিয়ে মাথাটা নিজের দেহকুণ্ডলীর মধ্যে ঢুকিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল মহাসর্প। শ্রীবাস্তব সাপটার দিকে চোখ রেখে রাহুলের উদ্দেশে বললেন, 'হিমালয়ান কিং কোবরা। সাক্ষাৎ যমের দোসর! ভয়ংকর রাগি প্রাণী। এমন রাগি যে এরা মাটির ওপর পড়া উড়ন্ত পাখির ছায়াকেও কামড়াতে চায়! তবে ও ধরা পড়ার দিনই ওকে একটা আস্ত মুরগি খাইয়েছি। এখনও হজম হয়নি। পেটটা ফুলে

আছে দেখুন। আপাতত কয়েক সপ্তাহের জন্য নিশ্চিন্ত। ও শান্তই থাকবে। নইলে ওকে বাইরে বার করে আপনাকে দেখাতে পারতাম না।'

রাহুল বলল, 'আপনার সাহস আছে বটে!'

শ্রীবাস্তব হেসে জবাব দিলেন, 'অনেকেই সে কথা বলে। হয়তো বা সেটা সাহস নয়, দুঃসাহস।'

এরপর তাঁর সঙ্গে আরও দু-চারটে কথা বলে নিজের ঘরে ফিরে এল রাহুল।

দুই

বিকালবেলা সে দিন হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিল রাহুল। ইতিউতি একটু ঘোরাঘুরি করে সে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গিয়েছিল গাড়ির খোঁজে, পরদিন লাভা-লোলেগাঁও যাবার জন্য। বেশ কয়েকবার কালিম্পং এলেও ওই দু-জায়গা তার দেখা হয়নি। তার ইচ্ছা লাভা-লোলেগাঁওতে দু-রাত্রি থাকার। কিন্তু ভরা ট্যুরিস্ট সিজন এই মে-জুন মাস। সব গাড়ি হয় আগে থেকে বুকড, নয়তো পাঁচগুণ ভাড়া হাঁকছে। গাড়ি ঠিক না করেই সে হোটেলে ফিরে এল। মনে মনে সে ঠিক করে নিল যে সে সকালবেলা আর একবার মনোমতো গাড়ির খোঁজ করবে। যদি গাড়ি না পাওয়া যায়, তবে শেয়ারের জিপ ধরে শিলিগুড়ি রওনা হবে কলকাতায় ফেরার জন্য।

পাহাড়ি অঞ্চলে রাত আটটার মধ্যেই সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অন্য দিনের মতোই ওই সময় এ দিন শুয়ে পড়ল রাহুল। স্বাভাবিক নিয়মেই রাতটা কেটে গেল। শুধু মাঝরাতে একবার তার কানে যেন ভেসে এসেছিল সেই হি-স-স-স শব্দটা। মিনিটখানেকের জন্য ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। বেড সুইচ থেকে বাতিও জ্বালিয়েছিল সে। তবে সেই শব্দটা শ্রীবাস্তবের ঘর থেকে ভেসে আসা শব্দ, নাকি রাহুলের মনের ভুল তা বুঝতে না পেরে রাহুল আবার বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

সকালবেলা রাহুলের যখন ঘুম ভাঙল, তখন আটটা বেজে গেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই সে তৈরি হয়ে নিল বাইরে বেরোবার জন্য। তাকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যেতে হবে। তৈরি হয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরোতেই তার নজর গেল শ্রীবাস্তবের ঘরের দিকে। ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। তার মনে পড়ে গেল গতকাল রাতের শব্দটার কথা। 'হয়তো ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখা না-ও হতে পারে। একবার দেখা করে যাই।' —এই ভেবে রাহুল তাঁর ঘরের সামনে এগিয়ে দরজায় নক করল।

দরজাটা প্রথমে একটু ফাঁক করলেন ভদ্রলোক। তারপর রাহুলকে দেখে দরজা খুলে বললেন, 'গুড মর্নিং। ভিতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকল রাহুল। কিন্তু শ্রীবাস্তবের দিকে ভালো করে তাকাতেই চমকে উঠল সে। ভদ্রলোক মনে হয় সদ্য বিছানা থেকে উঠলেন। খালি গায়ে সম্ভবত তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। সেভাবে উঠেই তিনি দরজা খুলেছেন। রাহুল দেখল শুধু হাতে নয়, তাঁর অনাবৃত গা জুড়েই নানা ক্ষতচিহ্ন আঁকা হয়ে আছে! যেন কেউ ধারালো কোনও কিছু দিয়ে চিরেছিল তাঁর সর্বাঙ্গ। রাহুল তাকিয়ে রইল তাঁর দেহের দিকে। ব্যাপারটা সম্ভবত বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাস্তব বিছানা থেকে একটা চাদর তুলে নিজের শরীরে জড়িয়ে নিলেন। তারপর তিনি রাহুলের উদ্দেশে বললেন, 'এই সাতসকালে কোথায় বেরোচ্ছেন?'

রাহুল বলল, 'ইচ্ছা আছে লাভা-লোলেগাঁওয়ের দিকে যাবার। গতকাল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে খোঁজ নিয়ে গাড়ি পেলাম না। সব বুকড। দেখি আজ পাই কি না। নইলে কলকাতার দিকেই রওনা হব।'

রাহুলের কথা শুনে কী যেন একটু ভাবলেন শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন, 'আমিও তো ওইদিকেই যাব। কাল সম্ভবত ব্যাপারটা আপনাকে একবার বলেছিলাম। সাপ ধরা ছাড়াও ওদিকে একটা মন্দির আছে, সেখানেও আমি যাব। আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গী হতে পারেন। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাবেন। অজানা জায়গা, অচেনা পরিবেশ...'

রাহুল প্রশ্ন করল, 'কীসের মন্দির?'

একটু চুপ করে থেকে তিনি জবাব দিলেন, 'জম্ভলাদেবের মন্দির। মেঘ ঢাকা এক পাহাড়ের ঢালে জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে মন্দিরটা। লোকজন সাধারণত ও জায়গাতে যায় না। জম্ভলাদেব যেমন একাধারে সম্পদের দেবতা, তেমনই আবার অপদেবতাদেরও দেবতা। এ জন্য স্থানীয় লেপচারা এড়িয়ে চলে ও জায়গা। আর ট্যুরিস্টরা ওখানে যায় না, কারণ ও মন্দিরের সন্ধান তারা জানে না। তা ছাড়া পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টা চারেক ট্রেক করে ওখানে যেতে হয়। যাবেন আপনি?'

শ্রীবাস্তবের কথা শুনে রাহুলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল মলমল কিউরিয়ো শপের সেই জম্ভলামূর্তিটার কথা। সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, মলমল ওই জম্ভলামূর্তিটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন?'

শ্রীবাস্তব প্রথমে জবাব দিলেন, 'আমার ধারণা মলমল ওই মূর্তিটা জম্ভলা মন্দির থেকেই কোনওভাবে সংগ্রহ করেছে। ওটা বেশ প্রাচীন মূর্তি। তা ছাড়া অপদেবতাদের ভয়ে সাধারণত জম্ভলামূর্তি কেউ বানায় না।' এরপর একটু থেমে তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমার সঙ্গে ওখানে গেলে কোনও অ্যান্টিক মূর্তি কপাল ভালো থাকলে আপনিও পেয়ে যেতে পারেন। মন্দির সংস্কারের জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে অর্থের প্রয়োজন হলে অনেক সময় ওরা ছোটোখাটো মূর্তি নামমাত্র দামে বিক্রি করে দেয়।'

শ্রীবাস্তবের কথা শুনে কিছুক্ষণ ভাবল রাহুল। শ্রীবাস্তব লোকটাকে আপাতদৃষ্টিতে তার খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া তাঁর মতো একজন মধ্যবয়সি লোক রাহুলের মতো একজন ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবককে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কী-ই বা করবেন? রাহুল কোনও পয়সাওয়ালা লোক বা বিখ্যাত লোকও নয় যে তাকে কেউ অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করবে। শ্রীবাস্তবের সঙ্গী হলে তার একটা নতুন জায়গা দেখা হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ভদ্রলোকের বক্তব্য ঠিক হলে হয়তো কোনও অ্যান্টিক মূর্তিও মিলে যেতে পারে! কোনও একটা অ্যান্টিক মূর্তি সংগ্রহের শখ রাহুলের বহুদিন ধরে। কিন্তু অর্থাভাবে সংগ্রহ করা হয়নি। সে শখও হয়তো মিটে যেতে পারে! —এসব ভেবে রাহুল শেষ পর্যন্ত বলল, 'আমি রাজি আছি আপনার সঙ্গী হতে। কিন্তু আপনার শর্ত কী কী?'

শ্রীবাস্তব হেসে জবাব দিলেন, 'আমার কোনও শর্ত নেই! আর এক ঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু রওনা হব আমি। আপনি সেইমতো তৈরি হয়ে নিন। ঠিক সাড়ে নটায় রওনা হব। গাড়ি হোটেলের বাইরেই লাগানো আছে।'

রাহুল বলল, 'ঠিক আছে। গাড়ির অর্ধেক খরচ কিন্তু আমি দেব। আপনি না করতে পারবেন না।'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তা-ই হবে।'

নিজের ঘরে আবার ফিরে গিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিল রাহুল। সেসব নিয়ে নীচে নেমে ডাইনিং রুমে প্রথমে ব্রেকফাস্ট সারল। তারপর হোটেলের বিলপত্র মিটিয়ে দিয়ে সাড়ে নটার একটু আগেই হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াল। ঠিক সাড়ে নটাতেই বাইরে বেরিয়ে এলেন মিস্টার শ্রীবাস্তব। পিঠে একটা বিরাট বড়ো রুকস্যাক। ডান হাতেও বেশ বড়ো একটা প্যারাশুট কাপড়ের ব্যাগ আর বাঁ হাতে বুকের কাছে ধরে থাকা সেই কাঠের বাক্সটা। রাহুল জানে ওই বাক্সর মধ্যে কী আছে।

হোটেলের সামনেই রাস্তার একপাশে একটা পুরোনো জিপ দাঁড়িয়ে আছে। রাহুলকে নিয়ে তিনি জিপটার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে নিজের, তারপর রাহুলের মালপত্র জিপের পিছনে তুলে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলেন। তা-ই দেখে রাহুল একটু অবাক হয়ে বলল, 'ড্রাইভার কই? আপনিই চালাবেন নাকি?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই চালাব। ড্রাইভার নিলে অনেক ঝামেলা তার থাকা-খাওয়া নিয়ে। তাই শুধু গাড়িটাই ভাড়া নিয়েছি। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাবার অভ্যাস আছে আমার। আর পথটাও আমি চিনি। উঠে পড়ুন।'

রাহুল উঠে পড়ল শ্রীবাস্তবের পাশে। তারপর একবার পিছন দিকে তাকাল। সেই কাঠের বাক্সটা তো পিছনেই আছে!

শ্রীবাস্তব মনে হয় রাহুলের মনের ভাব বুঝতে পেরে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করে হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই। বাক্সর মুখটা ভালোভাবেই বন্ধ করা আছে।'

রাহুলদের হোটেলটা কালিম্পং ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একটু নীচের দিকে। সেখান থেকে জিপ নিয়ে ওপরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে উঠে বাজারের রাস্তা প্রথমে ধরল তারা। কিন্তু সে রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাদের। সামনে সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত কিছু একটা হয়েছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের চোখে-মুখেও কেমন যেন একটা উত্তেজনার ভাব! কী হয়েছে ব্যাপারটা! শ্রীবাস্তব সামনে কী হয়েছে দেখে আসার জন্য গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক তখনই রাহুল রাস্তার পাশে পরিচিত একজনকে দেখতে পেল। তাদের হোটেলের ম্যানেজার আচার্যবাবু। তাঁর হাতে দুটো থলে। সম্ভবত তিনি বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। রাহুলের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হতে তিনি গাড়ির সামনে এসে বললেন, 'আপনারা চলে যাচ্ছেন নাকি?'

রাহুল জবাব দিল, 'হ্যাঁ যাচ্ছি। সামনে কিছু হয়েছে নাকি?'

আচার্যবাবু বললেন, 'এখানকার এক কিউরিয়ো শপের মালিক মলমলকে দোকানের মধ্যেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে! তাঁর সারা দেহ কেউ যেন ফালা ফালা করেছে। জ্ঞান থাকলেও মলমল কিছুতেই বলতে পারছে না কী হয়েছে। আতঙ্কে কথা বন্ধ হয়ে গেছে!'

বিস্মিত রাহুল বলে উঠল, 'ডাকাতির ঘটনা?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'তা ঠিক বলতে পারব না। হতেও পারে। তবে এখানকার কিছু লোক আবার অন্য কোথাও বলছে। তাদের ধারণা, কোনও অপদেবাতর কাজ এটা। এইসব কিউরিয়ো শপে নানা অপদেবতার মূর্তি-টুর্তি বিক্রি হয়, জানেন তো। সেইসব কোনও অপদেবতাই নাকি এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। এখনই লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। রাস্তা এবার খুলে যাবে।'

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের গাড়িগুলো এগোতে শুরু করল। রাস্তা খুলে গেছে। ম্যানেজারবাবুও অন্য দিকে এগোলেন। রাহুল দেখল শ্রীবাস্তবের মুখটা যেন বেশ গম্ভীর হয়ে গেল কথা শুনে। রাহুল তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী হল মনে হয়?'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'আপনি যা শুনলেন, আমিও তা শুনলাম। বেশি জানা-বোঝার দরকার আমাদের নেই। অন্যদের মতো আমরাও শুধু ওঁর কাস্টমার ছিলাম। আমি কিউরিয়ো কিনতে এর আগে কয়েকবার গেছি ওঁর দোকানে। তেমন কোনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না ওঁর সঙ্গে। গতকাল ঘটনাচক্রে ওঁর দোকানে গিয়ে ওই জম্ভলামূর্তিটা আমার চোখে পড়ে। এসব ব্যাপার নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানোই ভালো। উটকো কোনও ঝামেলা ঘাড়ে এসে পড়তে পারে।'

রাহুল জবাব দিল, 'আপনাকে এমনিই কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। লোকটা পরিচিত ছিল, তাই খবরটা শুনে খারাপ লাগছে, উত্তেজনা বোধ হচ্ছে।'

জিপ যখন দোকানটার সামনের রাস্তা দিয়ে গেল, তখন দোকানের সামনের ফুটপাথে বেশ বড়ো একটা জটলাও চোখে পড়ল। গাড়ি চালাতে চালাতে সেদিকে তাকিয়ে একটু আনমনাভাবে শ্রীবাস্তব বললেন, 'আমার ধারণা, জম্ভলামূর্তিটা শেঠ মলমল কোনও অসাধু উপায়ে হস্তগত করেছিলেন। হয়তো যাদের মূর্তি, তারা আবার সেটা ফেরত নিয়ে গেল!'

রাহুল বলল, 'তার মানে? কথাটা ঠিক বুঝলাম না।'

শ্রীবাস্তব প্রশ্ন শুনে যেন তাঁর চিন্তার জাল কাটিয়ে উঠে সতর্কভাবে বললেন, 'এটা আমার অনুমানমাত্র। আসলে ওইসব প্রাচীন মূর্তি নিয়ে অনেক সময় অ্যান্টিক ডিলার, স্মাগলারদের মধ্যে খুনজখম হয়। হয়তো জম্ভলামূর্তিটা নিয়েই কিছু ঘটে থাকতে পারে।'

এ কথা বলার পর তিনি প্রসঙ্গ পালটে ফেলে বললেন, 'এসব আলোচনা থাক। এসব দুর্ঘটনা মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আমাদের সঙ্গে তো এই ঘটনার কোনও যোগাযোগ নেই। এসব নিয়ে ভাবলে বেড়াবার আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে।'

রাহুল বলল, 'ঠিক বলেছেন। অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করাই ভালো।'

কালিম্পং শহর ছাড়িয়ে জিপ লাভা যাবার রাস্তা ধরল। মসৃণ পিচ ঢালা রাস্তা, কিন্তু সামনে ট্যুরিস্ট গাড়ির লম্বা মিছিল। অসম্ভবরকম শ্লথ গাড়ির গতি। পাকদণ্ডির বাঁকগুলোতে থেমে থাকতে হচ্ছে উলটো দিকের গাড়িগুলোকে পথ করে দেবার জন্য। লাভা মাত্র এক ঘণ্টার পথ। সেখানে পৌঁছোতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লেগে গেল রাহুলদের। বেশ ওপরে উঠে এসেছে রাহুলরা। বাতাসে বেশ ঠান্ডা আছে। লাভার ছোট্ট গাড়ি স্ট্যান্ডটাতেও বেশ ভিড়। কিছু দূরে আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট বড়ো লাল রঙের স্থাপত্য দেখিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, 'ওটাই হল লাভার বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ। ওর নাম জ্যাং ঢোক পালারি মনাস্ট্রি। ওখানে বহু দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধ পুথি আছে। ফেরার সময় মনাস্ট্রিটা দেখাব আপনাকে।'

জিপ থেকে নেমে একটা ছোট্ট মোমোর দোকানে খেতে ঢুকল ওরা দুজন। খাদের ধারে ছোট্ট কাঠের দোকান। কাচের জানলা দিয়ে দূরের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। অনেক উঁচুতে পাইনবন ছাওয়া একটা সবুজ পাহাড়ের মাথা ঘন মেঘে ঢাকা। যেন ও জায়গাটা সত্যিই মেঘের দেশ। রাহুল গরম মোমো খেতে খেতে পাহাড়টার দিকে শ্রীবাস্তবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওই পাহাড়টা কেমন মেঘে ঢাকা! যেন পৃথিবীর বাইরের কোনও জায়গা।'

শ্রীবাস্তব সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই পাহাড়েই উঠব আমরা। ওটা সত্যিই মেঘের দেশ। ওই পাহাড়ের ঢালেই জম্ভলা দেবতার মন্দির আছে।'

এ কথা বলার পরই তিনি কাছাকাছি অন্য একটা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে, পাহাড়টার মাথায় বর্ষার মেঘ জমছে। মেঘটা এদিকেই আসছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। পাহাড়ে একবার বৃষ্টি নামলে কতক্ষণে থামবে, তার ঠিক নেই। রাস্তায় আটকে যেতে হবে।'

রাহুলরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে জিপে উঠে বসল। শ্রীবাস্তব জিপ স্টার্ট করলেন।

তিন

লাভা শহর পিছনে পড়ে রইল। পাকদণ্ডি বেয়ে জিপটা আরও ওপরে উঠতে শুরু করল। গাড়ি চালাতে চালাতে শ্রীবাস্তব বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। সেই কালো মেঘটা ক্রমশ আরও ঘন হয়ে যেন তাদের মাথার ওপরেই এগিয়ে আসছে। রাহুলদের যেখানে গন্তব্য, সেই সাদা মেঘে ঢাকা পাহাড়টা দেখিয়ে সে জানতে চাইল, 'ওখানে যারা থাকে, তারা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে কীভাবে? খুব মুশকিল হয় নিশ্চয়ই?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ওদের তথাকথিত সভ্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগের তেমন দরকার হয় না। খুব প্রয়োজন হলেই তবে ওরা কোনও সময় নীচে নামে। জনসংখ্যা ওখানে খুব কম। পাহাড়ের ঢালে কিছু সবজি চাষ হয়, ঝরনাতে ছোটো ছোটো মাছ পাওয়া যায়, জঙ্গলে খরগোশ, পাখি—এসব শিকার মেলে, তাতেই ওদের চলে যায়।'

রাহুল আবার জানতে চাইল, 'জম্ভলাদেবের মন্দির কি আসলে বৌদ্ধ মঠ?'

সতর্কভাবে রাস্তার মোড় ঘুরতে ঘুরতে শ্রীবাস্তব বললেন, 'না, ওটা বৌদ্ধ মঠ নয়। আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে যে তিব্বতি মানেই বৌদ্ধ। ঠিক যেমন বাইরের পৃথিবীর অনেকেই ধারণা করেন যে ভারতীয় মানেই হিন্দুধর্মাবলম্বী হতে হবে। এ দেশের তিব্বতি মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ হলেও অনেক তিব্বতি আছে, যারা বিভিন্ন লৌকিক দেবতার পূজা করে, ভূত-প্রেত, অপদেবতার পূজা করে। বরং তাদের কিছু লোকাচারই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে। লামা তারানাথ বা তারানাথ তান্ত্রিক যেমন বহু শতাব্দী আগে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই। বৌদ্ধদের থেকেও বরং হিন্দু তন্ত্রসাধনার সঙ্গে ওদের আচার-আচরণের বেশ মিল আছে। খেয়াল করবেন, জম্ভলা মন্দির নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি তাই মন্দির শব্দটাই ব্যবহার করেছি। মঠ বা গুম্ফা শব্দ বলিনি। জম্ভলাদেবের মন্দির।'

কথা বলতে বলতে সবুজ বনপথে উঠে এল গাড়ি। পথের দু-পাশে ঘন পাইনবন। বড়ো বড়ো গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তার ঢাল থেকে সোজা আকাশের দিকে উঠে নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন গাছগুলোর গায়ে জমাট বেঁধে আছে শ্যাওলা অথবা মসের আবরণ। রাস্তার পাশের গাছগুলোর গায়ে ফার্নের ঝোপ। কোনও গাছের ডাল থেকে বাতাসে উড়ছে সুতোর মতো, কালচে ঝুলের মতো কোনও উদ্ভিদ। শুয়ে থাকা বিশাল গাছের গুঁড়ির ওপর ফুটে আছে থালার মতো দেখতে ছত্রাক। সূর্যের আলো দিনের বেলাই খুব একটা বেশি প্রবেশ করে না এ পথে। আধো-অন্ধকার খেলা করে। চারপাশে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। জঙ্গল থেকে শুধু বাতাসের খসখস শব্দ আর ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। এ পথে আরও কিছুক্ষণ ওপরে ওঠার পর হঠাৎই যেন মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার

গাঢ় হয়ে এল। যেন রাত্রি ঘনিয়ে এল রাস্তায়। আর তারপরই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। শ্রীবাস্তব তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে একটা পাথুরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে জিপটা থামিয়ে জিপের ক্যানভাসের পর্দাগুলো নামিয়ে দিলেন। সে কী প্রচণ্ড বৃষ্টি! পাহাড়ি নির্জন রাস্তায় এ অভিজ্ঞতা কোনও দিন হয়নি রাহুলের। বৃষ্টির তোড়ে আন্দোলিত হচ্ছে বড়ো বড়ো গাছের মাথাগুলো। পাথরের ওপর বৃষ্টির ফোঁটায় একটা অদ্ভুত গুমগুম শব্দ হচ্ছে। কখনও কখনও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন। ওপর থেকে জলস্রোত নেমে এসে পথ ভাসিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। গাড়ির ভিতর চুপচাপ বসে তারা দেখতে লাগল বৃষ্টির তাণ্ডব। রাহুলের এক একসময় মনে হতে লাগল, এই বৃষ্টি মনে হয় আর কোনও দিন শেষ হবে না!

কিন্তু সব দুর্যোগের মতোই এই দুর্যোগও একসময় শেষ হল। ঘণ্টাখানেক পর ধীরে ধীরে একসময় বৃষ্টি থেমে এল। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো দেখা দিল। আবার জিপ স্টার্ট করলেন শ্রীবাস্তব। বৃষ্টিভেজা পাথুরে রাস্তা দিয়ে সাবধানে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে চালাতে তিনি বললেন, 'বৃষ্টি থামল ঠিকই, কিন্তু আজ আর আমাদের গন্তব্যে পৌঁছোনো যাবে না। ট্রেক করে মন্দিরে পৌঁছোতে অন্ধকার হয়ে যাবে। তা ছাড়া সদ্য বৃষ্টি হল। পাহাড়ের গা থেকে জল চুঁইয়ে ঢালগুলো পিছল হয়ে আছে। ট্রেক করাও বিপজ্জনক।'

রাহুল বলল, 'তাহলে কী হবে?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আমি ভাবছি আরও কিছুটা এগিয়ে ট্রেকিং পয়েন্টে জিপেই রাত কাটিয়ে দেব। আপনি চাইলে আমি অবশ্য আরও এগিয়ে লোলেগাঁওতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সে ক্ষেত্রে অবশ্য সকালে উঠে ট্রেকিং স্পট থেকে যাত্রা শুরু করতে আমাদের বেশ কিছুটা দেরি হয়ে যাবে।'

রাহুল শুনে বলল, 'না, হোটেলের দরকার নেই। আমিও আপনার সঙ্গে জিপেই থাকতে পারব।'

ভদ্রলোক মনে হয় খুশি হলেন রাহুলের কথা শুনে। তিনি বললেন, 'দেখবেন, নির্জন জঙ্গলপথে রাত কাটানো এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!' সেই জঙ্গল-ঘেরা পাহাড়ি রাস্তায় আরও বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একসময় রাহুলদের জিপ থামল। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা দুজন।

চারপাশে তাকিয়েই রাহুল বুঝতে পারল, তারা প্রায় সেই পাহাড়টার মাথায় উঠে এসেছে, যে পাহাড়টাকে সে নীচ থেকে মেঘে ঢাকা দেখতে পেয়েছিল। রাহুলদের ডান দিকে পায়ের নীচে পাহাড়ের ঢালে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। যেন কেউ কুয়াশার চাদরে মুড়ে রেখেছে জায়গাটা। একটা অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ নেমে গেছে সেদিকে পাইনবনের ভিতর দিয়ে। সেটা দেখিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, 'ওটাই আমাদের রাস্তা। নীচের ওই মেঘের আড়ালেই লুকিয়ে আছে জম্ভলা দেবতার মন্দির।'

রাহুল সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'কুবের দেবতার যে বাসস্থান বা যক্ষপুরী আমাদের কল্পলোকে ভেসে ওঠে, সেও তো মেঘেরই রাজ্য। এই দুই দেবতার মধ্যে বেশ মিল আছে দেখছি।'

জায়গাটা বেশ ভালোই। একটু খোলামেলা উন্মুক্তও বটে। পথের বাঁ দিকে রাস্তার গায়ে একটা ফাঁকা জায়গা পাহাড়ের গা থেকে ঝুলন্ত বারান্দার মতো বাইরে বেরিয়ে আছে, যে জায়গাতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনটে প্রাচীন পাইন গাছ। আকাশের দিকে মাথা তুলে

তারা যেন নজর রাখছে সারা উপত্যকার ওপর। গাছগুলো যে কত প্রাচীন তা আন্দাজ করা শক্ত। তাদের কাণ্ড পুরু মসের আবরণে ঢাকা। এমনকি হিমেল বাতাসে তাদের পাতাগুলোতেও যেন ঝুলের মতো কীসের আবরণ পড়েছে। গাছগুলোর পায়ের তলায় সেই ফাঁকা জমিতে কিছু ঝোপঝাড়ও আছে। ফার্ন আর পিচার প্ল্যান্ট—কলসপত্রর গাছ। রাহুলরা এত ওপরে উঠে এসেছে বলে মাথার ওপরে আর মেঘ নেই। মেঘমুক্ত আকাশের পটে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে তুষারধবল পর্বতশ্রেণি। নগাধিরাজ হিমালয়। আর সেই পর্বতশ্রেণির ফাঁক গলে শেষ বিকালের রোদ এসে পড়েছে রাহুলদের সামনের ফাঁকা জমিটায় সেই প্রাচীন মহাবৃক্ষগুলোর পায়ের কাছে। খুব সুন্দর দৃশ্য।

কিছুক্ষণ চারদিকের প্রকৃতিকে উপভোগ করার পর হঠাৎ শ্রীবাস্তব জিপের কাছে গিয়ে তার সেই কাঠের বাক্স আর স্নেক হুকটা বাইরে বার করে আনলেন। তা-ই দেখে রাহুল একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি কী করবেন ওগুলো নিয়ে?'

শ্রীবাস্তব একটু হেসে বললেন, 'ভাবছি সাপটাকে এই ফাঁকা জমিতে একটু খুলে দিই। বেচারা অনেকক্ষণ বাক্সবন্দি হয়ে আছে।'

রাহুল এবার স্পষ্টতই ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'খুলে দিই মানে! ও তো আমাদের কামড়াতে আসতে পারে? পালিয়েও যেতে পারে?'

শ্রীবাস্তব শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ ও কামড়াবেও না, পালাবেও না। আমাকে মার্জনা করবেন, এই সাপটা যখন আপনাকে কাল দেখাই, তখন আপনি স্বল্প পরিচিত ছিলেন বলে ভরসা করে ওর সম্পর্কে পুরোটা সঠিক বলিনি আমি। সামান্য একটু মিথ্যা বলেছিলাম। ওকে আমি ক'দিন আগে এখান থেকে ধরিনি। ওকে আমি উদ্ধার করেছিলাম দশ বছর আগে তিস্তার চর থেকে। তখন ও মাত্র এক ফুট লম্বা ছিল। শিশু সাপটা হড়পা বানে ভেসে এসে কোনওরকমে নদীর ধারে একটা ছোটো গাছের ডালে জড়িয়ে ছিল। তারপর থেকে ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে সবসময়। অন্য সব সাপ ধরে আমি সরকারকে দিলেও ওকে আমি দিতে পারিনি। মায়া পড়ে গেছে বন্ধুর মতো। তবে সাপ সঙ্গে রাখা তো নিষিদ্ধ। তাই অনেক সময় মিথ্যা বলতে হয়। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

রাহুল খুব আশ্চর্য হয়ে গেল শ্রীবাস্তবের কথা শুনে। লোকটা বড়ো অদ্ভুত তো!

শ্রীবাস্তব এর পর একটু এগিয়ে রাস্তার পাশে ফাঁকা জমিটা যেখানে শুরু হচ্ছে, সে জায়গায় মাটির ওপর বাক্সটা নামালেন। তারপর বাক্সর মুখ খুলে স্নেক হুক দিয়ে ধীরে ধীরে সাপটাকে বার করে জমির ওপর ছাড়লেন। সাপটা প্রথমে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ মাটির ওপর পড়ে রইল। তারপর মাথাটা একটু ওপরে তুলে চারদিকে তাকাল। সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার শরীরে। গতকালের চেয়ে আজ সাপটাকে যেন আরও বেশি বড়ো মনে হল রাহুলের। রাজগোখরো সত্যিই রাজকীয়! ভয়ংকর সুন্দর দেখতে! যেমন মোটা, তেমন লম্বা! তেমনই তার তেল চুকচুকে গাত্রবরন! সাপটা মাথা তুলে চারদিকে দেখে নিয়ে অতি মন্থর গতিতে রাজকীয় ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলল কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছগুলোর দিকে। রাহুলও পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শ্রীবাস্তবের পাশে। সাপটার দিকে চোখ রেখে শ্রীবাস্তব বললেন, 'ও এখন ওই ঝোপঝাড়গুলোতে গিয়ে পোকামাকড় ধরে খাবে।'

রাহুল বলল, 'আপনি যে বললেন ওকে মুরগি খাইয়েছেন?'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'এ কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। সত্যিই মুরগি খেয়েছে ও। তবে আমরা যেমন ভরা পেটেও অনেক সময় চিপস, ঝালমুড়ি, ফুচকা খাই, ওর পোকামাকড় ধরাটা তেমনই।'

রাহুল এবার হেসে ফেলল তাঁর কথা শুনে। শ্রীবাস্তব কাঠের বাক্সটা হাতে তুলে নিলেন। দুজনে এগোতে লাগলেন জমিটার ভিতর। জমিটার মাঝখানে পৌঁছে গেল রাহুলরা। সেই মহাসর্প ততক্ষণে এগিয়ে গেছে পাইন গাছগুলোর পাদদেশের ঝোপঝাড়গুলোর দিকে। মাঝে মাঝে সে ছোটোখাটো ঝোপগুলোর মধ্যে মাথা ঢোকাচ্ছে, আবার তারপর মাথা বাইরে এনে চারপাশে তাকিয়ে তার চেরা জিভটা বাতাসে ছুড়ে দিচ্ছে। রাহুল আর শ্রীবাস্তব দেখতে লাগল তাকে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করতে লাগল কিরীটশোভিত হিমালয়ের অপূর্ব দৃশ্য। কনকনে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে সেদিক থেকে। রাহুল তার মাফলারটা ভালো করে কান-মাথায় জড়িয়ে নিল।

হঠাৎই পাইনবনের ঝোপের কাছে একটা পাইন গাছের গুঁড়ির সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সাপটা। আর তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মাটি থেকে ফুট পাঁচেক উঁচু হয়ে বাঁশের মতো লম্বা টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রাণীটার শরীর। তার বিরাট ফণাটা খুলে গেল। বাতাস চিরে সে তীব্র শব্দ করে উঠল, 'হি-স-স-স!'

বেশ কিছুটা তফাত থেকেও রাহুলের কানে এসে লাগল তার ক্রুদ্ধ গর্জন।

গাছটার দিকে তাকিয়ে রাজগোখরো তার ফণাটা মৃদু দোলাতে দোলাতে স্টিম ইঞ্জিনের মতো শব্দ ছাড়তে লাগল—'হি-স-হি-স-স-স!' শ্রীবাস্তব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয়ই ও কোনও কিছু ওখানে দেখেছে, তাই অমন করছে!' —এই বলে তিনি বাক্স আর স্নেক হুকটা নিয়ে ছুটলেন সেদিকে। রাহুল সতর্কভাবে তাঁকে অনুসরণ করল। সাপটার একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন শ্রীবাস্তব। তাঁর কয়েক হাত পিছনে রাহুল এসে দাঁড়াল। সাপটা তার বিরাট ফণা দুলিয়ে গর্জন করে চলেছে, 'হিস-হিস...।' তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাহুলরা দেখতে পেল সামনের পাইন গাছটার আড়াল থেকে উঁকি মারছে একটা মুখ! একটা বাচ্চা ছেলের ভীতসন্ত্রস্ত আতঙ্কিত মুখ! এই নির্জন স্থানে একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল তারা দুজন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে শ্রীবাস্তব তাড়াতাড়ি স্নেক হুক দিয়ে তাঁর পোষ্যকে ধরে তাড়াতাড়ি পুরে ফেললেন কাঠের বাক্সর মধ্যে।

এর পর ছেলেটা বাইরে বেরিয়ে এল। দশ-বারো বছর বয়সি একটা লেপচা বা তিববতি ছেলে। খালি পা, পরনে শতচ্ছিন্ন পোশাক। হাতে ধরা আছে একটা কাপড়ের থলে। তার ভিতর এমন কিছু আছে, যেটা নড়ছে! কোনও জীবন্ত প্রাণী হবে।

বাইরে বেরিয়ে ছেলেটা তখনও কাঁপছে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ কাঠের বাক্সর ভিতর। সেখান থেকে তখনও ক্রুদ্ধ সরীসৃপের ফোঁস ফোঁস গর্জন কানে আসছে। যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে সে। শ্রীবাস্তব তার হাতের ছোট্ট পুঁটুলিটার দিকে ইশারা করে জানতে চাইলেন, 'ওতে কী আছে?'

বাচ্চাটা কাঠের বাক্সটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পুঁটুলিটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনল নেউল বা বেজির বাচ্চা! সেই বেজির বাচ্চাটাও যেন ঠকঠক করে কাঁপছে। শ্রীবাস্তব বললেন, 'এবার বুঝলাম আমার কালো সোনা কেন অমন রেগে গেছে। বেজি আর সাপ জাতশত্রু। চোখে না দেখলেও বেজির বাচ্চাটার উপস্থিতি টের পেয়েছে। নইলে মানুষ দেখলে চট করে ও অমন রেগে যেত না।'

বাচ্চাটা অসম্ভব ভয় পেয়ে গেছে। রাহুল এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কী? কোথায় থাকো?'

ছেলেটা তার কথা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তখনও সে কাঁপছে। ছেলেটার ভয় কাটাবার জন্য রাহুল মাথায় হাত বোলাতে লাগল। পকেট থেকে একটা লজেন্স বার করে ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিল। কাঁপা কাঁপা হাতে একটু ইতস্তত করে লজেন্সটা নিল ছেলেটা। তারপর সেটা নাকে ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকল জিনিসটা কী বোঝার জন্য। সে মনে হয় গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারল ওটা একটা খাদ্যদ্রব্য। ধীরে ধীরে তার কাঁপুনি থেমে গিয়ে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে।

শ্রীবাস্তব রাহুলকে বললেন, 'আমি কাজ চালাবার মতো একটু-আধটু তিববতি ভাষা জানি। দেখি কোনও কাজ হয় কি না?' —এ কথা বলে বিজাতীয় ভাষায় শ্রীবাস্তব কী যেন প্রশ্ন করতে শুরু করলেন ছেলেটাকে। সে প্রথমে কোনও জাবাব দিল না। একটু ভীতভাবেই সে চেয়ে রইল শ্রীবাস্তবের মুখের দিকে। শ্রীবাস্তব এর পর ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে কী একটা বললেন। এবার মুখ খুলল ছেলেটা। নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'ডং-পো।' সম্ভবত সেটা ছেলেটার নাম। ধীরে ধীরে কথা শুরু হল ছেলেটা আর শ্রীবাস্তবের মধ্যে। কথা বলতে বলতেই সে বারকয়েক আঙুল তুলে দেখাল নীচের মেঘে ঢাকা উপত্যকাটা। একসময় তাদের দুজনের কথা শেষ হল। রাহুল জানতে চাইল ছেলেটা কী বলল? শ্রীবাস্তব বললেন, 'যদিও ওর কথা পুরোপুরি বুঝতে পারছি না, তবে মোটামুটি যা বুঝলাম তা বেশ চমকপ্রদ। ওর বাড়ি ওই নীচের গ্রামে জম্ভলা মন্দিরের কাছে। ক'দিন আগে একটা লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল গ্রামের কাছে পাহাড়ি রাস্তায়। ছেলেটা তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জম্ভলা মন্দিরে পৌঁছে দেয়। পরে বোঝা যায় লোকটা অসুস্থ ছিল না। ওটা ছিল তার ভান। জম্ভলা মন্দিরে যাবার জন্য লোকটা ও কাজ করে। লোকটা চোর। সে দিন রাতেই সে পঞ্চজম্ভলার এক জম্ভলাকে নিয়ে চম্পট দেয়। যদিও তার খোঁজে শহরে লোক পাঠিয়েছেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কোঞ্চক। তবুও সে নিজেও বেরিয়ে পড়েছে শহরে গিয়ে সেই মূর্তি উদ্ধারের জন্য। কারণ গ্রামবাসীরা নাকি বলাবলি করছিল, যেহেতু ডং-পো নামের এই বাচ্চাটাই চোরটাকে পথ দেখিয়ে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল, তাই মূর্তি না উদ্ধার হলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে তাকে জম্ভলা দেবতার ঘরে আটকে রেখে।'

রাহুল বেশ অবাক হল কথাগুলো শুনে। শ্রীবাস্তব এর পর বললেন, 'আমার ধারণা, ছেলেটা সত্যি কথাই বলছে। ও নীচের গ্রাম থেকেই এসেছে। ওর হাতের বেজিটা সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে। জম্ভলাদেবের উপাসকরা বেজি পোষে। জম্ভলাদেবের হাতে ধরে থাকা বেজি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয় ওদের কাছে। তা ছাড়া অন্য কাজেও ব্যবহৃত হয়। আমার ধারণা, মূর্তিটা যে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল, সে শেঠ মলমল বা তারই কোনও লোক হবে। ওই মূর্তিটাই সম্ভবত আমরা দেখেছিলাম।'

রাহুল বলল, 'পঞ্চজম্ভলা কী?'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'পঞ্চজম্ভলা জম্ভলাদেবেরই পাঁচটা রূপ। তাঁর গাত্রবর্ণ পাঁচ ধরনের হয়। কালো, সাদা, নীল, হলুদ, সবুজ। সমৃদ্ধি লাভ করা ছাড়াও এক একটা কারণে বিভিন্ন বর্ণের জম্ভলার পূজা করা হয়। পাঁচ বর্ণের জম্ভলার অনুগত পাঁচ ডাকিনী আলাদা আলাদা পাঁচরকম ক্ষমতার অধিকারিণী। তাদের মধ্যে কেউ নাকি মানুষকে বশ করতে পারে, কেউ রোগগ্রস্তকে সারিয়ে তুলতে পারে, কেউ মানুষকে অদৃশ্য করতে

পারে—এইসব ব্যাপার আর কী! তবে সবচেয়ে ক্ষমতাবান মনে করা হয় সবুজ জম্ভলা দেবতাকে। অন্য চারটে রূপ তাঁরই অংশবিশেষ। বিষ্ণুর প্রতিরূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণ।'

রাহুল শুনে বলল, 'বাঃ, আপনি দেখছি এসব নিয়ে অনেক জানেন!'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আমি তিববতি মূর্তি সংগ্রহ করি তো। ওসব সংগ্রহ করতে করতেই এসব জানা হয়ে গেছে।'

'তা ছেলেটাকে আপনি কী পরামর্শ দিলেন?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'শহর বলতে ও সম্ভবত কালিম্পং বোঝাচ্ছে। আমি ওকে বললাম, নামধাম না জানলে কোনও মানুষকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া শহর অনেক দূর। পায়ে হেঁটে শহরে গিয়ে কালকের মধ্যে তার পক্ষে গ্রামে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তার চেয়ে আবার তার গ্রামে ফিরে যাওয়াই ভালো। আমরা তো কাল যাচ্ছিই ওখানে। ও আমাদের সঙ্গী হতে পারে। যদিও এ ব্যাপারে সে হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না।'

গাড়ির দিকে এগোল রাহুলরা। ছেলেটাও তাদের পিছন পিছন এসে দাঁড়াল। রাহুল আর শ্রীবাস্তব নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। আর ছেলেটা লক্ষ করতে লাগল তাদের। আর মাঝে মাঝে ব্যাগ খুলে দেখতে লাগল তার পোষ্যটাকে।

সূর্য ডুবে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। ঠান্ডা কনকনে বাতাস আরও জোরে প্রবাহিত হতে লাগল। শ্রীবাস্তব বললেন, 'খেয়েদেয়ে জিপের মধ্যে ঢুকে যাওয়াই ভালো। নইলে ঠান্ডা লেগে যাবে।'

সাপের বাক্স, স্নেক হুক জিপের মধ্যে রাখার পর খাবার বার করা হল। বিস্কিট, ফল, কেক—এসব খাবার। ছেলেটাকেও দেওয়া হল কিছু। রাহুলদের সঙ্গেই খেল ছেলেটা। অন্ধকার নামল। শ্রীবাস্তব ছেলেটাকেও জিপের ভিতর উঠতে বলল। কিন্তু সে আঙুল দিয়ে জিপের নীচটা দেখাল। সে ওখানেই শুতে চায়। সম্ভবত সাপের ভয়ে সে জিপের ভিতর ঢুকতে চায় না। প্রচণ্ড ঠান্ডা নামছে। শ্রীবাস্তব একটা কম্বল বার করে দিলেন ডং-পো-কে। হাসল ছেলেটা। তারপর কম্বল আর তার পুঁটুলিটা নিয়ে জিপের নীচে ঢুকে গেল। রাহুলরাও জিপে উঠে ক্যানভাসগুলো ভালো করে নামিয়ে একজন সামনে, একজন পিছনে শুয়ে পড়ল।

সামনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাহুল। মাঝরাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। পর্দাটা ফাঁক করে বাচ্চা ছেলেটা হাত ঝাঁকিয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করছে। রাহুল উঠে বসে দেখল ইতিমধ্যে শ্রীবাস্তবও উঠে বসেছেন। ছেলেটা ইশারায় তাদের গাড়ি থেকে নামতে বলছে আর মাঝে মাঝে কাদের দিকে তাকাচ্ছে।

জিপ থেকে নামল তারা। ডং-পো আঙুল তুলে দেখাল উলটো দিকের খাদের দিকে। চাঁদনি রাত। সেই আলোতে রাহুলরা দেখল দুটো ছায়ামূর্তি ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তাদের একজনের মাথায় ছোটোমতো কী একটা জিনিস ধরা আছে। যদিও জিনিসটা কী তা এত ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত, আর তারপরই তারা ঢালের ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত রাতে কারা ওই লোক দুটো? হয়তো কাছাকাছি কোনও গ্রাম আছে। কাজ সেরে ঘরে ফিরছে তারা। পাহাড়ি পথে সন্ধ্যার সময় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বলে আলো জ্বালিয়ে রাস্তার কাজ হয়। হয়তো সে কাজই করে ওরা। এর পর অবশ্য বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ওরা দুজন। প্রচণ্ড ঠান্ডা। অনতিবিলম্বেই আবার জিপে ঢুকে যেতে হল।

চার

রাহুলদের যখন ঘুম ভাঙল, তখন সূর্যদেব সবে উদয় হয়েছেন। চারপাশের কুয়াশা তখনও ভালোভাবে কাটেনি। নীচের উপত্যকাটাও মেঘে ঢাকা। ডং-পো সম্ভবত আগেই ঘুম থেকে উঠে গাড়ির বনেটের মধ্যে বসে ছিল। রাহুলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে হাসল। তার ভয় ও বিমর্ষতা যেন অনেকটাই কেটে গেছে। শ্রীবাস্তব বললেন, 'আশা করি ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব সেখানে। দেখবেন কী অদ্ভুত জায়গা লুকিয়ে আছে পাহাড়ের কোলে।' কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল তারা। রাহুলের পিঠে একটা রুকস্যাক, আর শ্রীবাস্তবের পিঠে একটা ঢাউস রুকস্যাক। স্নেক হুকাটকে ফোল্ড করা যায়। সেটা আর সাপের বাক্সটাকেও সেই ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন শ্রীবাস্তব। জিপটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে রাখা হল ফাঁকা জমির মধ্যে পাইন গাছগুলোর কাছে। অতঃপর যাত্রা শুরু হল। রাহুলরা ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল নীচের উপত্যকার দিকে। বাচ্চাটাও তাদের সঙ্গী হল।

দু-পাশে ঘন পাইন গাছের বন। তার নীচে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমা হয়ে আছে পচা পাতার রাশি। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল খসে পড়ছে তার ওপর। সূর্যের আলো ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে জঙ্গলে। দু-একটা পাখি ডাকছে মাঝে মাঝে। এরই মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে পায়ে চলা পথ। তবে পথ একটু পিচ্ছিল। হয়তো বা গতকালের বৃষ্টির জন্যই। সাবধানে নামছে রাহুলরা। ডং-পো কিন্তু বেশ তিড়িংবিড়িং করেই নামছে। বেশ খুশি খুশি ভাব তার মুখে-চোখে। ব্যাপারটা নজর এড়াল না কারও। শ্রীবাস্তব চলতে চলতে কথা শুরু করলেন তার সঙ্গে। একসময় রাহুল জানতে চাইল, 'ডং-পো কী বলছে? ওকে তো বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে!'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ও একটা নতুন কথা জানাল। জম্ভলামূর্তি আবার নাকি ফিরে এসেছে! কাল রাতের লোক দুটোকে ও কাছ থেকে দেখেছে। ওদের মাথাতেই নাকি মূর্তিটা ছিল। এবার নিশ্চয়ই গ্রামে ফিরলে পুরোহিত তাকে শাস্তি দেবে না। আজ নাকি আবার মন্দিরে উৎসব আছে। জম্ভলা দেবতা দর্শন দেবেন।'

রাহুল বেশ অবাক হয়ে বলল, 'তা-ই নাকি? তাহলে ওই লোকগুলো কি শেঠ মলমলকে মারধর করে মূর্তিটা আবার ফেরত নিয়ে এল?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'সম্ভবত তা-ই। ওরা হয়তো অনুসরণ করেছিল ওকে। অথবা কালিম্পঙে গিয়ে কিউরিয়ো শপগুলোয় খোঁজ করে শেষ পর্যন্ত ওর খোঁজ পেয়ে যায়। ওরাও তো জানে যে ওই কিউরিয়ো শপগুলোতেই প্রাচীন মূর্তি-টুর্তি বিক্রি হয়। দেবতার ব্যাপারে ওরা বড়ো স্পর্শকাতর। মূর্তিটা চুরি করে আনা ছিল বলেই হয়তো ওই ঘটনা সম্বন্ধে শেঠ মলমল পুলিশকে কিছু বলতে পারছে না। ওর গায়ে যে ধরনের ক্ষতচিহ্নর কথা শুনলাম, তাতে আমারও ধারণা হয়েছিল যে ওই জম্ভলা দেবতার মূর্তিটা নিয়েই কোনও ঘটনা ঘটেছে।'

রাহুল বলল, 'মানে? আপনার শেষ কথাটা ঠিক বুঝলাম না। ক্ষতচিহ্নর ব্যাপার দেখে কীভাবে ধারণা হল?'

শ্রীবাস্তব প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়ে বললেন, 'জম্ভলা দেবতার উপাসকদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আছে তাই।'

বাচ্চাটা আগে আগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। হঠাৎ তার বলা একটা কথা মনে পড়ল রাহুলের। শ্রীবাস্তবকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, জম্ভলা দেবতা দর্শনের ব্যাপারটা ও কী বলছিল?'

চলতে চলতে রাহুলের প্রশ্ন শুনে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'আমি একবার তাকে দেখেছি। বহু বছর আগে। হয়তো আপনিও তাকে দেখবেন। আপাতত ব্যাপারটা আপনার কাছে একটু রহস্যই থাকুক। ওখানে গেলে আপনি সব জানতে-বুঝতে পারবেন।' কথাগুলো বলে রাহুলকে একটু কৌতূহলের মধ্যে ফেলে শ্রীবাস্তব চলতে শুরু করলেন। সময় এগিয়ে চলল। এগিয়ে চলল রাহুলরাও। পথের পাশে কখনও আদিম জঙ্গল, কখনও বা খাড়া পাহাড়ের ঢাল, ওপর থেকে নেমে আসা ঝরনার জল পা ভিজিয়ে দিয়ে আরও নীচে নেমে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা মারছে বা মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চারদিক। পোশাক ভিজে যাচ্ছে। বিশ্রাম নেবার জন্য কখনও কখনও রাস্তার ওপর কিছুক্ষণ বসা। তারপর আবার চলা। এভাবেই ধীরে ধীরে ঘণ্টা চারেক কেটে গেল একসময়। তারপর এক মেঘের রাজ্যে প্রবেশ করল তারা। এত ঘন মেঘ যে কয়েক হাত দূরেই কিছু দেখা যায় না। শ্রীবাস্তব বললেন, 'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। দূরত্বের নিরিখে এ জায়গা কালিম্পং থেকে খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু এ জায়গা যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য এক পৃথিবী। আমরা যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামছি, সেই পাহাড়টার গঠন সুচালো হওয়ায় বাতাসের চাপ এখানে কম। তাই এত মেঘ। প্রায় হাতড়ে হাতড়ে বেশ কিছুটা পথ আরও নামার পর আস্তে আস্তে মেঘ কেটে যেতে লাগল। নীচে তাকিয়েই রাহুলদের চোখে পড়ল একটা মন্দিরের সোনালি চুড়ো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। ভালো করে তাকাতেই মন্দিরের পিছনে পাহাড়ের ঢালে বেশ কয়েকটা ঘরবাড়িও নজরে এল। ডং-পো সেদিকে আঙুল তুলে কী যেন বলল, তারপর তাদের কাছে এসে রাহুল আর শ্রীবাস্তবের হাতে চুমু খেয়ে হরিণের মতো দ্রুতপায়ে ছুটল সেদিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে হারিয়ে গেল পথের বাঁকে। শ্রীবাস্তব বললেন, 'ও বলল ও গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। আবার দেখা হবে। ওর মনে হয় আর ফেরার তর সইছিল না। তবে ডং-পো নাকি একাই থাকে ওর কুঁড়েঘরে। ও অনাথ, বাপ-মা কেউ নেই।'

মন্দিরে পৌঁছোবার জন্য আরও বেশ কিছুটা নীচে নামতে হল রাহুলদের। রাস্তাটা নীচে নেমে তারপর উঠেছে মন্দির চত্বরে। সেই পথ বেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দুজন উঠে এল মন্দিরের সামনে।

রাহুল বেশ অবাক হয়ে গেল সেখানে পৌঁছে। বেশ বড়ো পাথুরে একটা চত্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কাঠ আর পাথরের তৈরি প্রাচীন মন্দিরটা। একপাশের দেওয়ালের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে মন্দির, অন্য দিকের দেওয়াল দুটো দুই বাহুর মতন সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত পাহাড়ের গায়ে খাদ কেটে মন্দিরটা বানানো হয়েছিল। এ মন্দিরটা ঠিক বৌদ্ধ গুম্ফার মতো নয়। থামের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরটার শীর্ষদেশে বেশ কয়েকটা চুড়ো আছে। সেগুলো দেখতে অনেকটা প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মতো। মন্দির স্তম্ভের অলংকরণে, মন্দিরগাত্রে, চূড়োয় একসময় মনে হয় সোনালি গিল্টি করা ছিল। বয়সের ভারে সেগুলো এখন সবই প্রায় উঠে গেলেও স্থানে স্থানে যতটুকু আছে, সেগুলো মেঘের ফাঁক গলে আসা সূর্যকিরণে চিকচিক করছে। মন্দিরের মাথার ওপরে চাঁদোয়ার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে দুধসাদা মেঘ। দূরের পাহাড়গুলোকে দেখাচ্ছে ঘন নীল। যেন এ এক নীল পাহাড়ের দেশ।

জনাকয়েক লোক কাঠের বালতিতে জল নিয়ে মন্দির চত্বর ধোয়া-মোছা করছিল। তাদের পরনে খাটো পাজামা আর লম্বা ঝুলের হাতাওয়ালা পোশাক। কোমরের কাছে চামড়ার চওড়া কোমরবন্ধ। তাতে কারও কারও আবার কুকরি গোঁজা আছে। কান-উঁচু টুপিও আছে কয়েকজনের মাথায়। রাহুলদের দেখে কাজ থামিয়ে একটু বিস্মিতভাবে থমকে দাঁড়াল তারা। তারপর দুজন লোক এগিয়ে এল তাদের কাছে। শ্রীবাস্তব তাদের বললেন, 'আমরা ট্যুরিস্ট। মন্দির দেখতে এসেছি।' লোকগুলো শুধু একবার ঘাড় নাড়ল। একজন মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন দীর্ঘকায় লোক। তিববতিদের মধ্যে এত লম্বা লোক সাধারণত দেখা যায় না। তার গায়ে সোনালি জরির কাজ করা অনেকটা ওভারকোটের মতো রেশমের পোশাক, রেশমের কোমরবন্ধ, কানে সোনার মাকড়ি ঝিলিক দিচ্ছে। পায়ে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো। মাথায় একটা তেকোনা পশুলোমের টুপিও আছে। বাতাসে তার কানের ওপর টুপির লোমগুলো উড়ছে। তার পোশাক আর দৃঢ় ভঙ্গিতে রাহুলের দিকে এগিয়ে আসা দেখেই বুঝতে পারল এ লোকটা অন্য লোকগুলোর থেকে আলাদা গোত্রের।

লোকটা এসে দাঁড়াল রাহুলদের সামনে। লোকটার মুখমণ্ডল ঘন দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ভরা। তার বয়স ঠিক ধরা যাচ্ছে না। চোখের রং রক্তাক্ত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে রাহুলদের ভালো করে দেখল। তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কারা? এখানে কেন এসেছেন? কোথা থেকে আসছেন?'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'আমরা ট্যুরিস্ট। কলকাতা থেকে আসছি। মন্দির আর আশপাশের জায়গাগুলো দেখতে এসেছি।'

'ট্যুরিস্ট? ট্যুরিস্টরা তো এ পর্যন্ত আসে না? তারা লাভা-লোলেগাঁও পর্যন্তই দেখে। এখানে মন্দির আছে আপনারা জানলেন কীভাবে?' সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল লোকটা।

শ্রীবাস্তব বললেন, 'হ্যাঁ, সাধারণ ট্যুরিস্টরা এখানে আসে না জানি। চার-পাঁচ মাস আগে আমার পরিচিত একটা ট্রেকিং দল ট্রেক করে নীচে নেমেছিল। যদিও সময়াভাবে তারা মন্দিরে আসেনি, কিন্তু দূর থেকে বাইনোকুলার দিয়ে মন্দিরটা দেখেছিল। তারাই ফিরে গিয়ে গল্প করেছিল যে এখানে অদ্ভুত সুন্দর একটা মন্দির আছে। তাই দেখতে চলে এলাম। আমরা কলকাতা শহর থেকে এসেছি।'

রাহুল বুঝতে পারল, যে কোনও কারণেই হোক, শ্রীবাস্তব যে আগে একবার এখানে এসেছিলেন, সে কথা চেপে গেলেন।

লোকটা বলল, 'আমি কলকাতা শহরের নাম শুনেছি, তবে সেখানে যাইনি কখনও। শুনেছি সেটা অনেক দূরের পথ। আপনারা যে সেখান থেকে এসেছেন, তার প্রমাণ কী?'

রাহুলের সঙ্গে ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড ছিল। বাইরে বেরোলে সেটা সঙ্গেই থাকে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ভোটার কার্ড সঙ্গে আছে, দেখাচ্ছি।'

লোকটা বলল, 'সেটা আবার কী জিনিস?'

রাহুল বুঝতে পারল যে লোকটা ভোটার কার্ড শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়। পকেট থেকে কার্ডটা বার করে সে লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সরকারি পরিচয়পত্র। এতে নাম-ঠিকানা সব লেখা আছে।'

লোকটা কার্ডটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সেটা রাহুলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ক'দিন আগে এখানে একটা লোক এসেছিল। সেও নিজেকে ট্যুরিস্ট বলেছিল। কালিম্পঙের লোক। সে একটা কাণ্ড ঘটিয়ে পালিয়েছিল।'

রাহুল আর লোকটার কথার মাঝেই শ্রীবাস্তব তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করলেন। তার মধ্যে রয়েছে একটা স্ফটিকের মালা। বেশ বড়ো একটা লকেটও রয়েছে তার সঙ্গে। মোড়ক খুলে মালাটা বার করে সেটা তিনি লোকটার দিকে এগিয়ে বললেন, 'এটা আমাদের তরফ থেকে উপহার। আপনাকে দিলাম।'

মালাটা হাতে নিয়ে দেখল লোকটা। সম্ভবত খুশিও হল। তারপর বলল, 'আমার নাম কোঞ্চক। এই জম্ভলা দেবতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আমি। এসেছেন যখন, তখন মন্দির ও আশপাশের জায়গা ঘুরে দেখুন। একটা রাত আপনারা মন্দিরের অতিথিশালায় কাটাতে পারেন। আজ বিকালে এই মঠ চত্বরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে। জম্ভলা দেবতা দর্শন দেবেন। অন্য অনুষ্ঠানও হবে। দেখতে পারেন। তবে কাল সকালেই কিন্তু আপনাদের মন্দির চত্বর ছাড়তে হবে। আর একটা কথা, আমাদের আচার-সংস্কৃতি শহরের লোকদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। আশা করি আমাদের ধর্মীয় আচরণে আপনারা কোনও হস্তক্ষেপ করবেন না এবং আমাদের নিয়মবিধি মেনে চলবেন। আর মন্দিরে থাকার জন্য কিছু অর্থ দিলে ভালো হয়।'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'কাল সকালেই চলে যাব আমরা। আশা করি আমরা নিয়মবিরুদ্ধ কিছু করব না।' কথা শেষ করে পকেট থেকে একশো টাকার কড়কড়ে দশটা নতুন নোট বার করে পুরোহিত কোঞ্চকের হাতে দিলেন।

চকচক করে উঠল কোঞ্চকের চোখ। নোটগুলো হাতে নিয়ে একবার নতুন টাকার গন্ধ শুঁকলেন তিনি। তারপর সেগুলো জামার পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, 'আমাদের এখানে এমনিতে টাকার প্রয়োজন হয় না। যুগ যুগ ধরে এখানে বিনিময়পদ্ধতি চলে আসছে। তবে মাঝে মাঝে কিছু জিনিস কেনার জন্য কালিম্পং শহরে লোক পাঠাতে হয়, যা এখানে পাওয়া যায় না। তখন টাকার প্রয়োজন হয়। আপনাদের এই টাকা মন্দিরের কাজেই লাগবে। আমি একজন লোক দিচ্ছি, সে আপনাদের ঘরে নিয়ে যাবে। মন্দিরটাও সে ঘুরিয়ে দেখাবে। খাবারের ব্যবস্থাও সে করবে।'

এ কথা বলার পর তিনি হাঁক দিলেন 'পেমবা' বলে। একজন মাঝবয়সি লোক কাছে এসে দাঁড়াল সে ডাক শুনে। কোঞ্চক তাকে তিববতি ভাষায় কী যেন বলতেই সে ইশারায় রাহুলদের তাকে অনুসরণ করতে বলল, রাহুলরা এগোল তার পিছনে।

চত্বরের ঠিক মাঝখানেই একটা চৌবাচ্চার মতো জায়গা। আকারে সেটা অনেকটা একটা ঘরের মতো। মন্দিরের চাতাল থেকে সেটা অন্তত দু-ফুট গভীর হবে। চাতালের ওপরে একটা অনুচ্চ প্রাচীর আছে সেই চৌবাচ্চার মতো গর্তটাকে ঘিরে। আর তার গায়েই আছে সিঁড়ির ধাপওয়ালা একটা বেদি। রাহুল পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল সেই গর্তটার মধ্যে কিন্তু কোনও জল নেই। দুজন লোক জল দিয়ে সেই বেদিটা আর গর্তটাকে ঘেরা কোমর সমান অনুচ্চ প্রাচীরটাকে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করছে।

লোকটার সঙ্গে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করল রাহুলরা। ছোটোবড়ো নানা প্রকোষ্ঠ মন্দিরের ভিতর। স্তম্ভ দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা আছে নানা বিচিত্র ছবি। বিভিন্ন অপদেবতার মুখ, ডাকিনী আর বেজির ছবি। শ্রীবাস্তব বললেন, 'বেজিকে এরা জম্ভলা দেবতার প্রতীক বলে মনে করে। তাই চারপাশে এত বেজির ছবি।'

এ অলিন্দ-সে অলিন্দ বেয়ে সিঁড়ি দিয়ে একটু নীচে নেমে একটা ছোটো ঘরে তাদের তুলল লোকটা। পাথরের মেঝে, কাঠের দেওয়াল। খোলা জানালা দিয়ে খাদ দেখা যাচ্ছে। মাটি অনেক নীচে। এটাই রাহুলদের রাত্রিবাসের জায়গা। তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কোঞ্চকের অনুচর। শ্রীবাস্তব দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে মন্দির দেখার পর গ্রামটা ঘুরে দেখব।'

ঘরে একটা চৌকিমতো আছে। রাহুল তার ওপর মালপত্র নামিয়ে রেখে বসল। শ্রীবাস্তব তাঁর ব্যাগ থেকে সেই কাঠের বাক্সটা বার করে সেটাকে চৌকির তলায় চালান দিয়ে তার ওপর একটা কাপড় ঢাকা দিলেন। তারপর পোশাক বদলাবার জন্য জ্যাকেট, জামা খুলে ফেললেন। যত দ্রুতই তিনি পোশাক পরিবর্তনের চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর দেহের ক্ষতচিহ্নগুলি কিন্তু রাহুলের নজর এড়াল না। ভদ্রলোক যদি কিছু মনে করেন—এই ভেবে সে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল। আধঘণ্টা সে ঘরে বিশ্রাম নেবার পর তারা দরজা খুলল। সেই লোকটা তখনও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। দরজায় তালা লাগালেন শ্রীবাস্তব। তারপর তারা রওনা হল লোকটার পিছনে।

ওপরে উঠে প্রথমে একটা বেশ বড়ো হলঘরে প্রবেশ করল তারা। সে ঘরের আনাচেকানাচে অসংখ্য অদ্ভুত ধরনের মূর্তি, প্রদীপদান, ধাতুর পাত্র রাখা আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর বসানো আছে ভেরিজাতীয় একটা বাদ্যযন্ত্র। আর তার পাশেই সেটা বাজাবার জন্য রাখা একটা হাড়। রাহুলের দেখে মনে হল, সেটা সম্ভবত মানুষের বাহুর হাড় হবে। সেই বড়ো ঘর অতিক্রম করে আরও বেশ কয়েকটা ছোটো ঘর পেরোল তারা। প্রত্যেক ঘরই নানা প্রাচীন জিনিসে পরিপূর্ণ। কোথাও মাথার ওপর সিলিং থেকে ঝুলছে বিচিত্র ধরনের ভয়ংকর দেখতে কাঠের মুখোশ, কোথাও আবার রাখা আছে রেশমের ওপর কাজ করা দেবদেবীর নানা ছবি দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো অবস্থায়। একটা ঘরে বিভিন্ন প্রাণীর মাথার খুলি, চামড়া ইত্যাদিও টাঙানো আছে। শেষ পর্যন্ত লোকটা রাহুলদের নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল গর্ভগৃহে। বিশাল একটা ঘর। কাঠের তৈরি মেঝে। দেওয়াল, থামের গায়ে চিত্রিত আছে নানা বিচিত্র মূর্তি। একটা জানলা দিয়ে বাইরের আলো ঢুকছে ঘরে। তবে তাতে ঘরের অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। চওড়া থামগুলোর আড়ালে অন্ধকার খেলা করছে। হলঘরের মতো ঘরটার শেষ প্রান্তে কয়েকটা ধাপের পর প্রশস্ত একটা বেদি। তার ওপর বসে আছেন জম্ভলা দেবতা। রাহুলরা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই বেদির সামনে। বিশালাকৃতির এক কাঠের তৈরি মূর্তি বসে আছে বেদির ওপর। উচ্চতা অন্তত আট ফুট হবে। স্ফীত উদর, গাত্রবর্ণ ঘন সবুজ। দেবতা সোনা-রুপোর নানা অলংকারে ভূষিত। মাথার মুকুটটাও সম্ভবত সোনারই হবে। বজ্রাসনে বসা দেবতার ডান পা বাইরের দিকে একটু উন্মুক্ত। নখরগুলো বেশ বড়ো বড়ো আর তীক্ষ্ণ। সেগুলোও সম্ভবত সোনার পাতে মোড়া। আর সেই পায়ের সামনে বাসে আছে পদ্মকোরক হাতে এক ডাকিনী। কাছেই কারুকাজ করা একটা রুপোর প্রদীপদানে প্রদীপ জ্বলছে। দেবতার পায়ের সামনে ধূপও জ্বলছে একগোছা। ধূপের ধোঁয়া আর প্রদীপের আলোতে অদ্ভুত লাগছে দেবতার মুখটা। জম্ভলা দেবতার ঠোঁটের কোণে জেগে আছে এক রহস্যময় হাসি। তাঁর হাতে ধরা বিরাট বেজিটার দাঁতগুলো প্রদীপের আলোতে মৃদু ঝিলিক দিচ্ছে। জ্বলজ্বল করছে তার লাল চোখ দুটো। রাহুল অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অদ্ভুত মূর্তিটার দিকে। এমন মূর্তি এর আগে সে কোনও দিন দেখেনি। মূর্তিটার দিকে তাকালে সম্ভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ভয়েরও উদ্রেক হয় দেবতার হাত-পায়ের ওই তীক্ষ্ণ নখর আর তাঁর হাসিটার জন্য। রাহুল এর পর দেখতে পেল সেই বিশালাকার মূর্তির বেদির ঠিক নীচের ধাপটাতেই

ছোটো ছোটো পাঁচটা সিংহাসন। তার একটা খালি। বাকি চারটের মধ্যে রাখা আছে লাল, হলুদ, সাদা, কালো চারটে ছোটো ছোটো জম্ভলামূর্তি। সেগুলোর প্রতি রাহুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে শ্রীবাস্তব চাপা স্বরে বললেন, 'বাচ্চা ছেলেটার কথাই মনে হয় ঠিক। মূর্তিটাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ওই কালো রঙের ছোটো জম্ভলামূর্তিটাই সম্ভবত আমরা মলমলের কাছে দেখেছিলাম।'

রাহুল ক্যামেরা বার করল সেই বিশালাকৃতি জম্ভলা দেবতার ছবি তোলার জন্য। ঠিক সেই সময় তাদের সামনের লোকটা রাহুলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিববতি ভাষায় কী যেন বলল। শ্রীবাস্তব রাহুলকে বললেন, 'ছবি তুলবেন না। ও নিষেধ করছে। বিগ্রহ বা মন্দিরের ছবি তোলা নিষেধ এখানে। কোনও ছবিই তোলা যাবে না।' —এ কথা শুনে রাহুল ক্যামেরা নামিয়ে নিল।

রাহুলরা এর পর ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল। দেওয়ালে, থামের গায়ে নানা অদ্ভুত অলংকরণ রয়েছে সারা ঘরে। বয়েসের কারণে সেগুলো কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেলেও এখনও বোঝা যায়। ডাকিনী-যোগিনীর ছবি তো আছেই, তার সঙ্গে আঁকা রয়েছে নানা ধরনের নানা ভঙ্গিমাতে নেউল বা বেজির ছবি। ঘরটাতে ঘুরতে ঘুরতে একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করল রাহুল। ঘরের মেঝেতে, থামের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে গোল গোল গর্ত। ভেঙে যাওয়ার কারণে গর্ত নয়, গোলাকৃতি গর্তগুলোকে নিপুণভাবে তৈরি করা হয়েছে। থামের গায়ের একটা গর্তে চোখ রাখল রাহুল। ভিতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না তার। গর্তগুলোর উপযোগিতা বুঝতে না পারলেও একটা জিনিস সে বুঝতে পারল, কাঠের তৈরি থাম ও কাঠের তৈরি মেঝেটা সম্ভবত ফাঁপা। টোকা দিলে বা মেঝেতে জোরে পা ফেললে তেমনই ঢপঢপ একটা ফাঁপা শব্দ হচ্ছে!

ঘরটায় কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর গর্ভগৃহ থেকে ওপরে উঠে এল তারা। লোকটা এবার তাদের নিয়ে প্রবেশ করল অন্য একটা ঘরে। সে ঘরের দেওয়ালে অজস্র কুলুঙ্গি। তাতে রাখা আছে বৌদ্ধ দেবদেবীদের অজস্র ছোটো ছোটো মূর্তি। তবে সেই মূর্তিগুলো কোনওটাই বুদ্ধমূর্তি নয়। পাথর, কাঠ বা ধাতুর তৈরি ছোটো ছোটো সেই মূর্তির কোনওটাই জম্ভলাদেবের মূর্তি নয়। তার কোনওটা মায়াদেবীর, কোনওটা মঞ্জুশ্রীর বা কোনওটা মহাকালের। তার মাঝে দু-একটা বুদ্ধমূর্তিও আছে। সেগুলো দেখিয়ে মন্দিরের লোকটা জানাল যে ইচ্ছা করলে রাহুলরা মূর্তিগুলো কিনতে পারে। তবে তার জন্য কথা বলতে হবে প্রধান পুরোহিতদের সঙ্গে।

শ্রীবাস্তব রাহুলকে বললেন, 'এই মূর্তিগুলো সত্যিই অ্যান্টিক। এরা জম্ভলা দেবতা ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করে না। তাই এই মূর্তিগুলো ওদের কাছে অপ্রয়োজনীয়, ওরা এগুলো বেচতে চায়।'

রাহুল জবাব দিল, 'একটা অ্যান্টিক মূর্তি সংগ্রহের আমার বহুদিনের শখ। আপনি কোঞ্চকের সঙ্গে কথা বলুন। দরে পোষালে আমি একটা মঞ্জুশ্রীমূর্তি কিনব।'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি গর্ভগৃহে জম্ভলা দেবতার পেটটা খেয়াল করেছেন?'

রাহুল বলল, 'দেখেছি। বেশ মোটা ভুঁড়ি। কিন্তু কেন?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'না, কিছু না। পেটটা বেশ বেঢপ, তাই আপনাকে বললাম।'

এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এল তারা। বাইরের চত্বরটাতে তখন আরও বেশ কয়েকজন লোক এসে জুটেছে। তারা দড়ি দিয়ে কাপড়ের পতাকা টাঙাচ্ছে

মন্দির চত্বরে। বিকালের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। প্রধান পুরোহিত কোঞ্চক সব কিছুর তদারকি করছেন। বাইরে বেরিয়ে তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শ্রীবাস্তব বললেন, 'গ্রামটা একটু ঘুরে আসি?'

কোঞ্চক বললেন, 'যান। তবে বিকালের মধ্যেই ফিরে আসবেন। জম্ভলা দেবতা দর্শন দেবেন আজ।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আমরা তার অনেক আগেই ফিরে আসব।'

চত্বর ছেড়ে এগোল রাহুলরা। এবার কিন্তু কোঞ্চকের সেই অনুচর আর তাদের সঙ্গী হল না।

পাঁচ

রাহুলের ঘড়িতে এগারোটা বাজে। বেলা দশটা নাগাদ মন্দিরে এসে পৌঁছেছিল তারা। মঠ চত্বর থেকে একটু নীচে নামার পর আবার ওপরে উঠে গ্রামের পথে এগোল তারা। পাহাড়ের গায়ে তিববতিদের গ্রামটা যেন পটে আঁকা। পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা গোটা তিরিশেক ছোটো ঘর। পাথরের দেওয়াল, কাঠের ঢালু ছাদ। আর তার পিছনেই সবুজ পাইনবন আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সময় মেঘ ভেসে যাচ্ছে পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িঘরগুলোর ছাদ ছুঁয়ে। যেন পটে আঁকা ছবি। গ্রামে ঢোকার মুখেই পাহাড়ি ঝোরা বা ঝরনা। স্বচ্ছ জলধারা পথের একপাশের পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে রাস্তার ওপর পায়ের পাতা ভিজিয়ে উলটো দিকের খাদে নেমে যাচ্ছে। শ্রীবাস্তব থমকে দাঁড়ালেন ঝরনাটার সামনে। কিছুক্ষণ ঝরনাটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর তিনি বললেন, 'এ জায়গাটা আমার খুব প্রিয় ছিল। এখানে স্নান করতাম আমি।'

রাহুল বলল, 'এর আগে আপনি এখানে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন বুঝি?'

তার প্রশ্নটা শ্রীবাস্তবের কানে পৌঁছোল কি না, রাহুল তা ঠিক বুঝতে পারল না। কারণ তার কথার জবাব না দিয়ে শ্রীবাস্তব সোজা হাঁটতে লাগলেন।

রাহুলরা প্রথমে গ্রামে পৌঁছোল। ঘরের জানালা দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে উৎসুক কয়েকজন পুরুষ-মহিলা। এক বৃদ্ধ দাওয়ায় বসে পাইপ টেনে ধোঁয়া ছাড়ছে। মাথায় লোমের ছুঁচোলো কানওয়ালা টুপি। অসংখ্য বলিরেখাময় মুখমণ্ডল। বাড়ির দেওয়ালে ঝোলাবার জন্য কাপড়ের ওপর আঁকা ঠিক এরকম তিববতিদের ছবি বহু দেখা যায় কালিম্পঙের হস্তশিল্পের দোকানগুলোতে। রাহুল একটা ছবি তুলল লোকটার। ফোকলা দাঁতে সে হাসল, আপত্তি করল না। রাহুলরা দেখতে পেল এক জায়গাতে বেশ কতকগুলো বাচ্চা ছেলে বেজির বাচ্চা নিয়ে খেলছে। সব দেখতে দেখতে চলল রাহুল। শ্রীবাস্তব কিন্তু গ্রামে দাঁড়ালেন না, গ্রাম ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গ্রামের পিছনের পাহাড়ের ঢালে পাইনবনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। সুঁড়িপথ এগিয়েছে পাইনবনের মধ্যে দিয়ে। বাতাস কানাকানি করছে বনের মধ্যে। তা ছাড়া চারপাশে কোনও শব্দ নেই। কোনও লোকজনও নেই। হঠাৎই সেই বনের মধ্যে একটা পুরোনো ঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। বাড়িটার চাল খসে গেছে, শুধু দেওয়ালগুলোই এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশের পাইন গাছগুলো থেকে ঝরে পড়া পাতার রাশি ছড়িয়ে আছে চারপাশে। সে জায়গাতে পৌঁছে থামলেন শ্রীবাস্তব। তারপর তাঁর পোশাকের ভিতর থেকে তাঁর ফোল্ডিং স্নেক হুকটা বার করলেন। রাহুল তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানেও সাপের সন্ধান আছে নাকি?'

শ্রীবাস্তব মৃদু হেসে বললেন, 'দেখা যাক পিছু পাওয়া যায় নাকি।' এই বলে তিনি ঢুকলেন পরিত্যক্ত পাথরের কাঠামোর মধ্যে। রাহুল তাঁকে অনুসরণ করল। ভিতরে ঢুকে একটা জায়গাতে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বোঝাই যাচ্ছে, সেটা একসময় একটা ঘর ছিল। তবে কাঁধ সমান উঁচু পাথরের দেওয়ালগুলোই শুধু এখন দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভেঙে যাওয়া ঘরের এক কোণে গিয়ে মেঝে থেকে স্নেক হুকটা দিয়ে পাতার রাশি সরাতে লাগলেন শ্রীবাস্তব। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের কোণে উন্মোচিত হল বেশ বড়ো একটা গর্ত। তার মুখে মাটি জমে আছে। হুকটা দিয়ে প্রথমে মাটি সরিয়ে দিলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে স্নেক হুকটা গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। রাহুল এবার বেশ খানিকটা তফাতে সরে এল। বলা যায় না, সাপটা থাকলে সেটা হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। শ্রীবাস্তব হুকটা প্রায় সম্পূর্ণই ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। রাহুলের মনে হল, হুকটার মাধ্যমে গর্তর ভিতর কিছু স্পর্শের অনুভব করছেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শ্রীবাস্তবের ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটে উঠল। রাহুল জানতে চাইল, 'পেলেন কিছু?'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, পেলাম। তবে ও এখন আপাতত শীতঘুমেই থাক। কাল ফেরার পথে ওকে নিয়ে যাব। আর একটা দিন মাটির গভীরে ঘুমোক ও।'

রাহুল জানতে চাইল, 'কী সাপ ওটা?'

শ্রীবাস্তব হেসে জবাব দিলেন, 'যখন ওকে বার করে আনব, তখন দেখবেন।'

এর পর আরও মিনিট পাঁচেক সেই পরিত্যক্ত পাথুরে কাঠামোর মধ্যে রইল রাহুলরা। শ্রীবাস্তব কাঠামোটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কোনও কোনও সময় হাত বোলালেন ভেঙে যাওয়া দেওয়ালগুলোর গায়ে। একটা ধাতুর তৈরি ছোটো প্রদীপও পাওয়া গেল দেওয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে। শ্রীবাস্তব বললেন, 'একসময় নিশ্চয়ই এই প্রদীপটা জ্বালানো হত।' —এই বলে তিনি রুমালে মুড়ে যত্ন করে প্রদীপটা পকেটে রেখে দিলেন।

রাহুলরা এর পর ফেরার পথ ধরল। তারা যখন আবার মন্দির চত্বরে উঠে এল, তখন মন্দির চত্বরটা নানান রঙিন পতাকায় সেজে উঠেছে। চত্বরের পাথুরে মেঝে ঘষে-মেজে সাফসুতরো করা হয়েছে। সেই চৌবাচ্চামতো জায়গাটার অনুচ্চ প্রাচীর ঘেঁষেও লাগানো হয়েছে ধর্মীয় মন্ত্র লেখা অনেক পতাকা। হিমেল বাতাসে উড়ছে সেগুলো। আর চৌবাচ্চা সংলগ্ন বেদিটাও মুড়ে দেওয়া হয়েছে নানা রঙের রেশমের কাপড় দিয়ে। প্রধান পুরোহিত কোঞ্চক সেখানে না থাকলেও কয়েকজন লোক এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। তারা একবার শুধু তাকাল রাহুলদের দিকে, কিন্তু কোনও কথা বলল না। রাহুলরা আর চত্বরে না দাঁড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে তালা খুলে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। রাহুল ঘরে ঢুকে শ্রীবাস্তবকে বলল, 'আপনার সঙ্গে না এলে এই অদ্ভুত সুন্দর জায়গাটা দেখা হত না। ধন্যবাদ আপনাকে।'

শ্রীবাস্তব শুধু জবাব দিলেন—'হুম।' পাইনবনের সেই বাড়িটা থেকে বেরোবার পরই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছেন শ্রীবাস্তব। ফেরার পথে একটাও কথা বলেননি। কী যেন গভীরভাবে চিন্তা করছেন তিনি। ব্যাপারটা রাহুলের নজর এড়াল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। কোঞ্চকের সেই অনুচর পোর্সেলিনের পাত্রে খাবার এনেছে। তাতে স্যুপের মতো ধোঁয়া ওঠা গরম পানীয় আর কোনও একটা পাখির ঝলসানো মাংস। ঘরে খাবার নামিয়ে রেখে লোকটা চলে গেল। খাবার খেতে খেতে শ্রীবাস্তব একবার শুধু বললেন, 'এই যে পোর্সেলিনের পাত্রগুলো দেখছেন, এগুলোও কিন্তু অ্যান্টিক। সম্ভবত মিং আমলের এগুলো। এক একটা প্লেটেরই বহু হাজার টাকা দাম হবে।'

খাওয়া শেষ হবার পর চৌকিতে শুয়ে পড়ল ওরা। বাইরে থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসছে না। সম্ভবত সাজানো শেষ করে চত্বর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছে লোকজন। খোলা জানলা দিয়ে উপত্যকার কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। আকাশের বুকে অনেক দূরে বিন্দুর মতো একটা পাখি উড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে রইল রাহুল। শ্রীবাস্তবের দৃষ্টি ঘরের সিলিং-এর দিকে নিবদ্ধ। কী যেন ভাবছেন তিনি। রাহুল তাঁর এই চুপচাপ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করবে ভাবল একবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সমীচীন মনে করল না। তবে একসময় তার আর ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে ভালো লাগল না। চৌকি থেকে নেমে সে বলল, 'আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'যান, কিন্তু চত্বরের বাইরে যাবেন না। অচেনা জায়গাতে পথ হারালে বিপদ হবে।'

রাহুল প্রথমে মন্দিরের বাইরে এল। সত্যিই চত্বরটা জনশূন্য। কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে। বাতাসে শুধু পতাকাগুলো উড়ছে। কিছুক্ষণ চত্বরে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার মন্দিরে প্রবেশ করল। মন্দিরের ভিতরেও কাউকে দেখতে পেল না সে। গর্ভগৃহে না নামলেও মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখতে লাগল রাহুল। কত বিচিত্র অ্যান্টিক সামগ্রী ছড়িয়ে আছে ঘরগুলোতে। কাঠের মুখোশ, পাথরের বা ধাতুর মূর্তি, পোর্সেলিনের পাত্র, রুপোর বাতিদান, আরও কত কিছু! ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাহুল মন্দিরের পিছনের অংশে চলে এল। একটা লম্বা বারান্দা ঝুলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। বারান্দার একপাশে সার সার কাঠের ঘর। বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়ালে অর্ধবৃত্তাকারে ল্যান্ডস্কেপ দেখা যায়। তা দেখার জন্যই রাহুল সেই বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পৃথিবীর সব সৌন্দর্য যেন উন্মুক্ত হয়ে গেল তার সামনে। নীল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের তুষারধবল শৃঙ্গগুলো। যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছোঁয়া যাবে। তন্ময়ভাবে রাহুল চেয়ে রইল সেদিকে। হঠাৎ একটা শব্দে রাহুলের মনঃসংযোগ ছিন্ন হল। একটা শব্দ আসছে কাছেই কোনও জায়গা থেকে। অনেকটা চাপা গোঙানির মতো। ভালো করে খেয়াল করেই সে বুঝতে পারল, শব্দটা আসছে সামনের ঘর থেকেই। ঘরটা বাইরে থেকে শিকল তোলা। তবে পাল্লা দুটোর মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক আছে। একটু দোনোমনো করে রাহুল সে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ঘরের ভিতর কে যেন গোঙাচ্ছে! কৌতূহলবশত রাহুল চোখ রাখল দরজার ফাঁকে। ঘরটা আধো-অন্ধকার। মাথার ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে শুধু একটু আলো আসছে। ঘরের মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে একজন—একটা বাচ্চা ছেলে! আধো-অন্ধকারের মধ্যে চোখ একটু সয়ে যেতেই রাহুল চিনতে পারল তাকে। আরে, এ যে ডং-পো! ওকে এভাবে এখানে আটকে রাখা হয়েছে কেন? ঘরের ভিতর ঢোকা সমীচীন হবে কি না, রাহুল ঠিক বুঝতে পারল না। শ্রীবাস্তবের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। রাহুল তাই দরজা ছেড়ে দ্রুত নিজেদের ঘরে ফেরার জন্য এগোল।

সিলিং-এর দিকে একইভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে তাকিয়ে ছিলেন শ্রীবাস্তব। রাহুল ঘরে ঢুকে উত্তেজিতভাবে তাঁকে বলল, 'জানেন, ডং-পো বলে সেই ছেলেটাকে একটা ঘরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। আমি দেখে এলাম। ঘরের আশপাশে কোনও লোকজন নেই। তাহলে মূর্তিটা ফিরে আসার পরও কি ওকে শাস্তি দেওয়া হল? ওটাই কি তাহলে জম্ভলা দেবতার ঘর? যে ঘরে ওকে আটকে রাখা হবে বলে ও শুনেছিল? মন্দিরের একদম পিছনের দিকে সেই ঘরটা।'

রাহুলের কথা শুনে শ্রীবাস্তব তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, ওটা জম্ভলা দেবতার ঘর নয়। সে ঘরে আমরা গেছি। আমার ধারণা, ছেলেটাকে সে ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তার আগেই ছেলেটাকে মুক্ত করতে হবে। আমাকে সে ঘরে নিয়ে চলুন।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার সেই অলিন্দের দিকে রওনা হল ওরা দুজন। মিনিটখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল সেখানে। রাহুলরা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই আতঙ্কে গোঙিয়ে উঠল বাচ্চাটা। শ্রীবাস্তব তার সামনে বসে চটপট তার বাঁধন খুলে দিতেই মেঝেতে উঠে বসল ছেলেটা। তার মুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। শ্রীবাস্তব তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে ওরা আটকে রেখেছে কেন?'

ডং-পো ভীতসন্ত্রস্তভাবে জবাব দিল, 'আমি গ্রামে ফিরে মন্দিরে ঢুকলাম। কোঞ্চকের সঙ্গে দেখা হতেই সে ধরে ফেলল আমাকে। সে বলেছে যে আজ রাতে আমাকে জম্ভলাদেবের ঘরে আটক করা হবে।'

তার কথা শুনে যেন মৃদু কেঁপে উঠলেন শ্রীবাস্তব। তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি এখনই পালাও। ও ঘরে তোমাকে ঢোকালে তুমি আর বাঁচবে না। পালাও, পালাও।'

সে ঘর থেকে এর পর দ্রুত বেরিয়ে এল ওরা তিনজন। বাইরে বেরিয়েই অলিন্দ দিয়ে ছুটে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটা। রাহুলরাও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করল।

শ্রীবাস্তব ঘরে ঢুকেই বেশ উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করলেন। রাহুল তাঁকে বলল, 'ছেলেটার কথা শুনে আপনি অমনভাবে ছুটে গেলেন কেন? জম্ভলা দেবতার ঘরে গেলে ও আর বাঁচাবে না কেন? আমরাও তো ও ঘরে গেছি। সেখানে তো তেমন কিছু চোখে পড়ল না।'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'চোখে পড়েনি, কারণ তাদের সাধারণত চোখে দেখা যায় না। আর যারা দেখে, তারা ওই ঘর থেকে আর বেরোতে পারে না।'

রাহুল বলল, 'আপনি কি তবে কোনও ভূতপ্রেত-অপদেবতার কথা বলছেন?'

শ্রীবাস্তব কী একটা উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। তারপর বাচ্চাদের মতো রাহুলের সামনে দুটো আঙুল মেলে ধরে বললেন, 'একটা আঙুল ধরুন তো। একটা সিদ্ধান্ত নেব কি নেব না তা ঠিক বুঝতে পারছি না!'

তাঁর এই কথা শুনে গম্ভীর পরিবেশের মধ্যেও হেসে ফেলল রাহুল। তারপর সে শ্রীবাস্তবের একটা আঙুল স্পর্শ করল। তিনি তাতে মৃদু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক আঙুলটাই ধরলেন। আমিও কাজটা করার ব্যাপারেই ভাবছিলাম।'

রাহুল বলল, 'আপনার কথাবার্তা, আচার-আচরণ কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না! আপনি কী কাজ করতে চাইছেন? জম্ভলা দেবতার ঘরের রহস্যটাই বা কী? খোলসা করে পুরো ব্যাপারটা বলুন।'

কিন্তু শ্রীবাস্তব তার প্রশ্নর জবাব দেবার আগেই বাইরে একটা শব্দ শোনা গেল। কাঠের মেঝেতে পা ফেলে কেউ যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে ঘরের দিকে। আর তারপরই দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ শোনা গেল।

শ্রীবাস্তব দরজা খুললেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান পুরোহিত কোঞ্চক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের ভিতরটা একবার বাইরে থেকে দেখে নিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, 'এ ঘরে কেউ এসেছিল?'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, ‘আপনার লোক শুধু ঘণ্টাখানেক আগে খাবার দিতে এসেছিল।’

কোঞ্চুক আবার প্রশ্ন করলেন, ‘আপনারা কেউ মন্দিরের পিছনের অংশে গিয়েছিলেন?’

রাহুলরা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল কোঞ্চুক কেন জিজ্ঞেস করছেন কথাটা। শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, ‘না আমরা যাইনি ওদিকে।’

কোঞ্চুক উত্তর শুনে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে রইলেন শ্রীবাস্তবের দিকে। যেন তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন শ্রীবাস্তবের কথা সত্যি কি না। তারপর আর কোনও কথা না বলে যেমন এসেছিলেন, তেমনই কাঠের মেঝেতে জুতোর শব্দ তুলে অন্যদিকে চলে গেলেন। শ্রীবাস্তব আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

রাহুল উৎসুকভাবে তাকাল শ্রীবাস্তবের মুখের দিকে। শ্রীবাস্তব তার উদ্দেশে বললেন, ‘আপাতত আপনাকে আমি শুধু এই কথাই বলি, এ মন্দিরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটা ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটাব আমি। বিকাল হয়ে আসছে। আর কিছু সময় পরই মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান শুরু হবে। নিজের চোখেই আপনি সব দেখতে-বুঝতে পারবেন।’

শ্রীবাস্তবের এ কথাগুলোরও কোনও মানে বুঝতে পারল না রাহুল। তবে সে আর কোনও প্রশ্ন করল না। খোলা জানলা দিয়ে সে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। সময় এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে মন্দির চত্বর থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসতে শুরু করল। সম্ভবত লোকজন জমতে শুরু করেছে সেখানে। তারই শব্দ কানে আসছে রাহুলদের।

ছয়

ঠিক বেলা চারটে নাগাদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চত্বরে এসে দাঁড়াল ওরা। ইতিমধ্যেই লোকজনে ভরে গেছে সারা চত্বর। গ্রামের সব লোক এসে উপস্থিত হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসবে শামিল হতে আর জম্ভলা দেবতার দর্শন পাবার জন্য। সবার পরনেই ঝলমলে রংচঙে পোশাক। কারও কারও হাতে মুখবন্ধ মাটির হাঁড়ি, আবার কারও হাতে দড়ি বাঁধা বেজি। বৃদ্ধ, নারী, শিশু সবাই আছে সেই ভিড়ের মধ্যে। সবচেয়ে বেশি ভিড় উঁচু বেদির সামনে সেই চৌবাচ্চাটাকে ঘিরে। চত্বরের এক কোনায় বসে একটা বিরাট ভেরী ধীর অথচ ছন্দোবদ্ধভাবে বাজিয়ে চলেছে একজন। তার গুমগুম শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার ফিরে আসছে। বাতাসে উড়ছে রঙিন পতাকাগুলো। কোলাহলমুখর মন্দির প্রাঙ্গণ।

শ্রীবাস্তব বললেন, ‘চলুন, আমরা বেদির কাছে ওই চৌবাচ্চাটার ওখানে দাঁড়াই।’ গ্রামের লোকেরা ওদের দেখে অবাক চোখে তাকাল ঠিকই, কিন্তু বিদেশি অতিথি বলেই হয়তো একটু সরে গিয়ে বেদির ঠিক সামনে চৌবাচ্চাটার গায়ে ওদের দুজনের দাঁড়াবার জায়গা করে দিল।

বেদির সামনের চৌবাচ্চার তলাটা খটখটে শুকনো। তার সাদা পাথর বিছোনো মেঝেটা ঝকমক করছে। সম্ভবত সেটাও ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। চৌবাচ্চাটাই সম্ভবত অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। সে জায়গাতে দাঁড়াবার জন্যই ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। সবাই যেন কীসের একটা প্রতীক্ষা করছে আর উৎসুকভাবে তাকাচ্ছে মন্দিরের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন প্রধান পুরোহিত কোঞ্চুক। জনতার মধ্যে তাঁকে দেখে একটা হর্ষধ্বনি উঠল। তিনিই তো উৎসব পরিচালনা করবেন। ভেরিটা বাজতে শুরু করল দ্রুতলয়ে।

কোঞ্চুকের পরনে বেশ জমকালো পোশাক। ঘন নীল রেশমের ওপর সোনালি জরির কাজ করা লম্বা ঝুলের আলখাল্লা। লাল রঙের কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে রুপোর পাতে মোড়া খাপসুদ্ধ একটা তলোয়ার। হাঁটু পর্যন্ত মোজায় ঢাকা পায়ে থ্যাবড়া নাকওয়ালা ধাতুর নাল লাগানো ধবধবে সাদা জুতো। মাথায় তেকোনা পশুলোমের তিববতি টুপি। সেটাও বিকেলের সূর্যালোকে ঝলমল করছে। তাঁর হাতে ধরা আছে রুপোর তৈরি একটা ছোটো লাঠি। তার বাঁকানো মাথাটা বেজির মাথার আদলে তৈরি। কোঞ্চুক দৃপ্ত ভঙ্গিতে সোজা এগিয়ে এসে উঠে দাঁড়ালেন চৌবাচ্চার সামনে বেদিতে ওঠার সিঁড়ির ধাপে। আবার হর্ষধ্বনি উঠল জনতার মধ্যে। হাতের ছড়িটা ওপর দিকে তুলে ধরে জনতাকে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন তিনি। সূর্যের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠল ছড়ির মাথায় বসানো বেজির লাল চোখ দুটো। সম্ভবত সেগুলো চুনি পাথরের। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল জনতার কোলাহল। বাজনাও থেমে গেল। পুরোহিত কোঞ্চুক এরপর তিববতি ভাষায় কী যেন বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষণ মন দিয়ে শুনতে থাকল জনতা। রাহুল অবশ্য তাঁর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না। শ্রীবাস্তব বললেন, ‘কোঞ্চুক জম্ভলা দেবতার মহিমা ব্যক্ত করছেন গ্রামবাসীদের কাছে। দেবতাকে মান্য করলে গ্রামবাসীরা সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, আর না মানলে দেবতার কোপে তাদের কী ভীষণরকম ক্ষতি হতে পারে, সেসব কথা বোঝাচ্ছেন পুরোহিত।’

একটানা প্রায় দশ মিনিট বলার পর থামলেন তিনি। উপস্থিত জনতা মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জানাল তাঁকে। কোঞ্চুক এরপর আবার তাঁর ছুরিটা প্রথমে মাথার ওপর তুলে ধরলেন, তারপর ছুরিটা দিয়ে দিকনির্দেশ করলেন চৌবাচ্চার দিকে। অনুষ্ঠান শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন তিনি। উল্লাসধ্বনি করে উঠল জনতা। ঢাকটা আবার বাজতে শুরু করল দ্রুতলয়ে। জনতা ঠেলাঠেলি করে ঝুঁকে পড়ল চৌবাচ্চার প্রাচীর ধরে।

একজন লোক প্রথমে একটা বেজিকে নামিয়ে দিল চৌবাচ্চার ভিতর। রাহুলদের পাশেই কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল মুখবন্ধ মেটে হাঁড়ি নিয়ে। রাহুলের প্রাথমিক অবস্থায় ধারণা হয়েছিল যে, হাঁড়িগুলোর মধ্যে হয়তো দেবতাকে নিবেদনের জন্য খাবার বা পুজোর কোনও উপকরণ আছে। বেজিটাকে নীচে নামাবার পর সেটা বিরাট চৌবাচ্চার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কয়েকবার ছোটাছুটির পর এক জায়গাতে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আর এর পরই একজন তার হাতের হাঁড়িটা ওপর থেকে ছুঁড়ে দিল চৌবাচ্চার ভিতর। সশব্দে পাথুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ে ফেটে গেল হাঁড়িটা। কোনও খাদ্যদ্রব্য নয়, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত তিনের লম্বা সাপ! ব্যাপারটা এবার কী হতে চলেছে বুঝতে পারল রাহুল। সাপ আর বেজির লড়াই!

সাপটা ভাঙা হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই খাড়া হয়ে উঠল বেজির লোমগুলো। সাপটাও তার চেরা জিভ বার করে কয়েকবার এদিক-ওদিক তাকাবার পরই দেখতে পেল বেজিটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজে ভর দিয়ে ফণা মেলে দাঁড়াল সাপটা। উত্তেজিত জনতা তা-ই দেখে চিৎকার করে উঠল।

জাতশত্রুর চিনতে ভুল হয়নি কারও। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লড়াই শুরু হয়ে গেল। সাপটাই প্রথমে আক্রমণ করল বেজিটাকে। কাছে গিয়ে সে ছোবল মারল তাকে। কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল বেজিটা। সাপের নিষ্ফল ছোবল আছড়ে পড়ল পাথরের মেঝেতে। বেজিটা এর পর পিছন থেকে আক্রমণ করল সাপটাকে। সে কামড়ে ধরল সাপের ল্যাজটা। সাপটা আবার ঘুরে গিয়ে ছোবল মারল। কিন্তু এবারও সরে গেল বেজি। বারবার এভাবেই আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ চলতে লাগল। সাপের ফোঁস ফোঁস আর বেজির

ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দে ভরে উঠল জায়গাটা। সবার সঙ্গে রাহুলও উত্তেজিতভাবে দেখতে লাগল সেই লড়াই। বোঝা যাচ্ছে যে, লোকজনের মধ্যে জম্ভলাদেবের অনুচরের প্রতিই সমর্থন বেশি। কারণ বেজিটা সাপকে আক্রমণ করলেই হর্ষধ্বনি উঠছে তাদের মধ্যে। কিন্তু বারবার ল্যাজে কামড় খেয়ে আর ছোবল মারতে মারতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল সাপটা। বেজিটা মনে হয় এ জন্যই অপেক্ষা করছিল। বেজিটা এর পর সাপটাকে আর না কামড়ে বৃত্তাকারে তার চারপাশে ঘুরতে লাগল। আর সাপটা এক জায়গাতে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে বেজিটাকে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎই বেজিটা আড়াআড়িভাবে একটা লম্বা লাফ দিল সাপের মাথার ওপর দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে একটা লাল দাগ যেন আঁকা হয়ে গেল সাপের ফণাতে। দেহটা ফণা সমেত পড়ে গেল মাটিতে। বেজির নখর দু-টুকরো করে দিয়েছে সাপের ফণা! মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর উল্লাসে চিৎকার করে উঠল জনতা। শুরু হল জম্ভলা দেবতার নামে জয়ধ্বনি। বেজিটা তখন আক্রোশে টুকরো টুকরো করতে শুরু করেছে মৃত সাপটাকে। তার কৌশলের কাছে পরাজিত কালসর্প।

সেই বেজি আর মৃত সাপটাকে তুলে এনে এরপর আর একজন একটি বেজি নামাল চৌবাচ্চায়। আবার একটা হাঁড়ি ফেলা হল। তার থেকে বেরিয়ে এল একটা সাপ। আবার লড়াই শুরু হল। খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ রাহুল খেয়াল করল, শ্রীবাস্তব তার পাশে নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার সে খেলা দেখতে লাগল। মিনিট তিনেকের মধ্যে এই সাপটারও একই পরিণতি হল। তারপর আবার নতুন বেজি, নতুন সাপ নামানো চলল। প্রতিবার খেলার স্থায়িত্বই পাঁচ থেকে সাত মিনিট। বেজির কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে সাপরা। জয়ধ্বনি উঠছে জম্ভলা দেবতার নামে। বেশ কয়েক দফা এ খেলা চলার পর একটা বেজি যখন মৃত সাপের দেহটাকে টুকরো টুকরো করছে, তখন খেলা থামাবার নির্দেশ দিলেন পুরোহিত কোঞ্চক। ঢাকের বাজনা, জনতার চিৎকার থেমে গেল কিছু সময়ের জন্য। রাহুল খেয়াল করল, মন্দিরের ভিতর থেকে এবার বাজনার শব্দ কানে আসছে। সমবেত জনতা যেন সে শব্দ শুনে ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। রাহুল দেখল শ্রীবাস্তব তার পাশে ফিরে এসেছেন। তিনিও আঙুল নির্দেশ করে রাহুলকে মন্দিরের দিকে দেখালেন।

বাজনার শব্দ ক্রমশ মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে। জনতা নিশ্চল নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে। মন্দির তোরণ থেকে প্রথমে শিঙা বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে এল একজন লোক। তার পিছনে পিছনে থালার মতো পিতলের ঝাঁজর বাজাতে বাজাতে দুজন। আর তারপরই আত্মপ্রকাশ করলেন জম্ভলা দেবতা। দুজন লোকের কাঁধে কাঠ আর রুপোর তৈরি ছোট্ট একটা পালকিতে মখমলের চাদরে আরাম করে বসে আছেন দেবতা। একটা লোক পালকির পাশে হাঁটতে হাঁটতে চামর দোলাচ্ছে পালকির দেবতার গায়ে। পালকির পিছনেও দুজন লোক আছে। তারা কাঁসর-ঘণ্টা বাজাচ্ছে। মিছিলটা বাইরে আসতেই তিববতিরা জয়ধ্বনি করতে লাগল জম্ভলা দেবতার নামে। দ্রুতলয়ে বাজতে শুরু করল ভেরি। কাঁসর-ঝাঁজর, ঢাক, জনতার উল্লাসধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ে। মিছিলটা এগিয়ে এল রাহুলদের কাছে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপর উঠে জম্ভলা দেবতার পালকিকে বসানো হল বেদির ওপর। জম্ভলা দেবতাকে দেখে কিন্তু অবাক হয়ে গেল রাহুল। না, পালকির ভিতরে কোনও বিগ্রহ নেই, সেখানে বসে আছে একটা বিরাট বড়ো বেজি! এত বড়ো বেজি কোনও দিন দেখেনি রাহুল। আকারে সেটা মোটাসোটা হুলো বেড়ালের চেয়েও বড়ো! দেহে ছাই রঙের লোম। তার লোমওয়ালা ল্যাজটা ঝালরের মতো ঝুলছে পালকির বাইরে। অর্ধ-উন্মীলিত চোখে লোকজনের

কোলাহল শুনে একবার হাই তুলল অদ্ভুত প্রাণীটা। দেখা গেল তার তীক্ষ্ণ দাঁতের মাড়ি। দেবতাকে বেদির ওপর বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা তার নামে জয়ধ্বনি করল, তারপর মাটিতে শুয়ে পড়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানাল। শ্রীবাস্তব চাপা স্বরে বললেন, 'ওই প্রাণীটাকেই জম্ভলা দেবতার জীবন্ত রূপ ভাবা হয়। লোকচক্ষুর অগোচরে ও প্রধান পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে থাকে। বছরে একবার ও জনতাকে দর্শন দেয়। সহজ সরল গ্রামবাসীরা ওকেই দেবতার অবতার বলে মানে। ভক্তির ঘটা দেখেছেন! কেমন সবাই শুয়ে পড়েছে দেবতাকে প্রণাম করার জন্য!'

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো। রাহুল একবার আকাশের দিকে তাকাল। আর ঘণ্টাখানেকর মধ্যেই অন্ধকার নামবে। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তুঙ্গ পাহাড় আর পাইনবনের ফাঁক গলে দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে পড়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর মুখে। ভক্তিভরে তাকিয়ে আছে তারা দেবতার দিকে। দেবতার দর্শনের সুযোগ বছরে এই একটা দিনই আসে।

এবার অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্ব শুরু হবে। তাই প্রধান পুরোহিত কোঞ্চক বেদির দিকে সিঁড়ির ওপর আরও এক ধাপ উঠে দাঁড়ালেন, যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পায়।

সমবেত জনতার উদ্দেশে কোঞ্চক বললেন, 'তোমরা সবাই দেবতার দাস, সবাই আমরা দেবতাকে মান্য করে চলব তা-ই-তো, পুরোহিতের নির্দেশ মান্য করে চলবে তো?'

সমবেত জনতা মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ।'

কোঞ্চক এরপর বললেন, 'আজ কিন্তু তোমাদের কাছে নতুন প্রধান পুরোহিত নির্বাচনের সুযোগ আছে। তোমরা কেউ দেবতাকে পরাস্ত করতে পারলে সে-ই প্রধান পুরোহিত হবে বা তাকে নির্বাচন করতে পারবে। যুগ যুগ ধরে পুরোহিত নির্বাচনের এই পদ্ধতি এখানে চলে আসছে।'

জনতা তাঁর কথা শুনে নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে রইল। স্বয়ং ভগবানের বিরুদ্ধে লড়াই! সে আবার হয় নাকি?

প্রধান পুরোহিতের চোখ ছুঁয়ে যাচ্ছে সবার মুখ। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর সবার চোখে-মুখে ফুটে আছে তাঁর প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা। কোঞ্চকের ঠোঁটের কোণে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল হালকা একটা হাসির রেখা। তাঁর কথাগুলো অবশ্য চাপা স্বরে রাহুলকে বুঝিয়ে দিলেন শ্রীবাস্তবই।

কোঞ্চক এরপর বললেন, 'তবে তো আবার আমাকেই প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব নিতে হবে। আমি শেষবারের জন্য জানতে চাইছি, জম্ভলাদেবের বিরুদ্ধে কেউ লড়াই দিতে আগ্রহী কি না? কেউ রাজি আছ?'

জনতা আবারও নিশ্চুপ হয়ে রইল।

পুরোহিত কোঞ্চকের ঠোঁটের হাসিটা আরও চওড়া হল। অতঃপর তিনি নিজেকে আবার মন্দিরের সর্বময় কর্তা ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেই সময় সবাইকে সচকিত করে শ্রীবাস্তব বলে উঠলেন, 'আমি আপনার দেবতাকে আহ্বান জানাচ্ছি লড়াইয়ের জন্য।'

অন্য সবাইয়ের মতো রাহুলও চমকে উঠে তাকাল শ্রীবাস্তবের দিকে। তিনি তাঁর একটা হাত উঁচু করে ধরেছেন। তাঁর সে হাতে ধরা আছে সেই কাঠের বাক্সটা! তিনি আবারও

বললেন, ‘আমি আহ্বান জানাচ্ছি লড়াইয়ে।’

তাঁর কথা শুনে কোঞ্চক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর মুখের হাসি মুহূর্তের জন্য মিলিয়ে গেলেও আবার তা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, ‘ও আপনারা! কিন্তু আপনারা বিদেশি। আপনারা আমাদের ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে পারবেন না। এটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার।’

এবারও শ্রীবাস্তব রাহুল আর অন্য সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন, ‘না, আমি বিদেশি নই। এ গ্রামেই আমার জন্ম। সে প্রমাণ আমি দেব।’

পুরোহিতের মুখটা যেন এবার গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, ‘কী প্রমাণ?’

শ্রীবাস্তব মুহূর্তের মধ্যে জ্যাকেট-জামা সব খুলে ফেললেন। তাঁর উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গে দিনশেষের সূর্যালোকে জেগে আছে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন! সেগুলো দেখিয়ে তিনি বললেন, ‘আমি যে এ গ্রামের লোক—এই তার প্রমাণ।’

রাহুল তাঁর কথা বুঝতে না পারলেও উপস্থিত জনতার মধ্যে এবার কেমন যেন চাঞ্চল্য শুরু হল। মৃদু কথাবার্তা শুরু করল তারা। কোঞ্চকের মুখ যেন আরও গম্ভীর হল। তবে যেন তিনি শ্রীবাস্তবের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখে তাঁর পরিচিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে বললেন, ‘বুঝলাম যে তুমি বিদেশি নও, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো যে জম্ভলা দেবতাকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে যদি তাঁকে পরাস্ত করতে না পারো—তবে জম্ভলা দেবতার ঘরে একরাত একদিন আটকে থাকতে হবে।’

শ্রীবাস্তব বলে উঠলেন, ‘আমি জানি, তার জন্য আমি প্রস্তুত। কিন্তু আপনি নিজে ভয় পাচ্ছেন নাকি? নইলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন কেন?’ স্পষ্ট বিদ্রুপ ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

জনতার মধ্যে আবারও একটা গুঞ্জন উঠল, ‘আরে, এ লোকটা বলে কী? তবে এ লোকটা যখন দেবতাকে সব জেনে-বুঝে লড়াইয়ের আহ্বান জানাচ্ছে, তখন লড়াইটা হওয়া উচিত। কারণ এটাই ধর্মীয় নিয়ম।’ তবে তাদের এও বিশ্বাস, দেবতাই জয়ী হবেন। আর কোঞ্চকই আবার প্রধান পুরোহিত থেকে যাবেন। কারণ, দেবতা তো অমর। গ্রামের লোকরা পুরুষের পর পুরুষ ধরে দেখে আসছে এই একই দেবতাকে।

কোঞ্চক মনে হয় পাঠ করতে পারলেন জনতার মনের ভাষা। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, ‘ঠিক আছে, তবে তা-ই হোক।’ এই বলে তিনি তাঁর অনুচরদের নির্দেশ করলেন দেবতাকে লড়াইয়ে অবতীর্ণ করার জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দড়ি বেঁধে পালকি সমতে সেই দানব দেবতাকে নামিয়ে দেওয়া হল চৌবাচ্চার মধ্যে।

শ্রীবাস্তবও প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাক্স খুলে স্নেক হুক দিয়ে তিনি বার করে আনলেন তাঁর কালো মানিককে। তারপর তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলেন চৌবাচ্চার ভিতর। সাপটার দৈর্ঘ্য দেখে বিস্মিত হয়ে গেল লোকজন। তারা ঝুঁকে পড়ল চৌবাচ্চাটাকে ঘিরে। কোঞ্চক নিজেও এসে দাঁড়ালেন চৌবাচ্চার সামনে। সবাই নিশ্চুপ। একটা পাতা পড়লেও যেন শব্দ শোনা যাবে!

জম্ভলাদেব আরামেই পালকির মধ্যে বসে ছিলেন, কিন্তু শ্রীবাস্তব তাঁর পোষ্যকে নীচে নামাতেই যেন ছোটো পালকি থেকে আড়মোড়া ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এলেন জম্ভলাদেব।

কোঞ্চক শ্রীবাস্তবের উদ্দেশে বললেন, ‘সাপ আর বেজির লড়াইতে সাপ জেতে না। ও বহু সাপকে টুকরো টুকরো করেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা শেষ হয়ে যাবে। আর তারপর...’

হিংস্র একটা হাসি ফুটে উঠল কোঞ্চকের ঠোঁটে।

শ্রীবাস্তব কোনও জবাব দিলেন না। তাঁর দৃষ্টি চৌবাচ্চার ভিতর নিবদ্ধ।

বেজিটা বেরিয়ে আসতেই তাকে দেখতে পেল সেই মহাসর্প। তার মোটা কালো দেহটা প্রথমে লাঠির মতো লম্বা হয়ে গেল, তারপর মাটি থেকে অন্তত পাঁচ ফুট খাড়া হয়ে সে তার থালার মতো ফণাটা মেলে ধরে গর্জন করে উঠল—হি-স-স-স! ঠিক যেন স্টিম ছাড়ল কোনও রেল ইঞ্জিন। সে শব্দ শুনে চমকে উঠল সবাই। আগে যে সাপগুলো লড়াইতে নেমেছে, তারা কেউই এ সাপের মতো বিশাল নয়। আর বেজিগুলোও এত বড়ো ছিল না। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল জম্ভলা দেবতার প্রতিরূপ সেই দানবীয় বেজি আর দশ ফুট লম্বা হিমালয়ান কিং কোবরা। যুগ যুগ ধরে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, জাতশত্রু!

লড়াই শুরু হয়ে গেল। সাপটাকে দেখেই বেজিটার পিঠের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল, থাবার আড়াল থেকে উঁকি দিল তীক্ষ্ণ নখর। প্রায় একই সঙ্গে পরস্পরকে আক্রমণ করল তারা। নখর বাগিয়ে বেজিটা ঝাঁপ দিল সাপটাকে লক্ষ্য করে। আর সাপটাও চাবুকের মতো ফণা ছুড়ল বেজির শরীরে বিষ ঢেলে দেবার জন্য। কিন্তু তাদের কারও দাঁত বা নখ প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীর স্পর্শ করল না।

আবারও ঘুরে গিয়ে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ হানল তারা। কিন্তু কেউ কাউকে আঘাত হানতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেল, এই লড়াই এত দ্রুত থামবার নয়। সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল দুই যোদ্ধার দিকে। মুহূর্ত, মিনিট কেটে যেতে লাগল। দু-পক্ষ মুহুর্মুহু আক্রমণ হানছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কারও নাগাল পাচ্ছে না। বেজির ডাক আর মহাসর্পের ক্রুদ্ধ গর্জনে মাঝে মাঝে চমকে উঠছে সবাই। শ্রীবাস্তব আর কোঞ্চক দুজনেই চোয়াল শক্ত করে তাঁদের ভাগ্যের লড়াই দেখছেন। উত্তেজনায় রাহুলের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হবার উপক্রম। যে কোনও মুহূর্তে কিছু ঘটতে পারে!

ব্যাপারটা ঘটল প্রায় আধঘণ্টা লড়াই চলার পর। হঠাৎ বেজিটা পিছন থেকে লম্বালম্বিভাবে ঝাঁপ দিল সাপটাকে লক্ষ্য করে। পরমুহূর্তেই সাপটার কালো অঙ্গের এক জায়গাতে লাল রেখা দেখা গেল। উৎসাহে চিৎকার করে উঠল জনতা। অবশেষে দেবতা আঘাত হেনেছেন মহাসর্পের শরীরে! এটাই তো হবার কথা। আবছা হাসি ফুটে উঠল কোঞ্চকের ঠোঁটের কোণে।

আঘাত খেয়েও নাগরাজ ঘুরে দাঁড়াল দেবতার দিকে। বাতাসে ছোবল দিয়ে সে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল—হি-স-স-স...। কিন্তু বেজিটা দ্রুত সাপটার পিছনে গিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য আঘাত হানল। এ আঘাতটা বড়ো মারাত্মক। রাজগোখরোর ল্যাজের দিকে প্রায় ইঞ্চি ছয় অংশ প্রথমে হাঁ হয়ে গেল। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে শুরু করল সেই ক্ষতস্থান থেকে। জনতার মধ্যে উল্লাসধ্বনি আরও তীব্র হল। এবার শেষ হতে চলেছে লড়াই।

আঘাত খেয়ে এর পর পিছু হটতে শুরু করল সাপটা। ধীরে ধীরে সে চৌবাচ্চার কোণে আশ্রয় নিল। তার কালো অঙ্গ লাল হয়ে উঠেছে। অবসন্ন হয়ে পড়ছে সে। চৌবাচ্চার কোনায় গিয়ে সে ফণাটাও নামিয়ে নিল। আর বেজিটা গিয়ে ওঁত পাতল তার সামনে। লোকজনের চিৎকারে এবার যেন কানে তালা লেগে যেতে লাগল রাহুলের। জনতা বুঝতে

পেরেছে, এবার খেলা শেষ। জয়ী হতে চলেছেন তাদের দেবতা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সাপটার শরীর।

বেজিটা কয়েক মুহূর্ত কুণ্ডলী পাকানো সাপটাকে জরিপ করে নিয়ে তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে সরে এল। সাপটাও ছোবল চালাল ঠিকই, কিন্তু সবাই দেখল এবারও সফল হয়েছেন দেবতাই। সাপের পেটের কাছে একটা জায়গা ফাঁক হয়ে গেছে বেজির নখ বা দাঁতের আঘাতে। জনতার উৎসাহে তাল মিলিয়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন কোঞ্চক। রাহুল শ্রীবাস্তবের দিকে তাকিয়ে দেখল, এই ঠান্ডাতেও টপটপ করে ঘাম ঝরছে তাঁর উন্মুক্ত শরীর থেকে।

পরপর দুটো মোক্ষম আঘাত খেয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল সাপটা। তার ফোঁসফোঁসানিও থেমে গেল। শুধু শোনা যেতে লাগল ক্রুদ্ধ দেবতার ফ্যাঁস ফ্যাঁস গর্জন। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে বেজিটা শেষ আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হল। জনতাও সেটা দেখার জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেবতার জয়ে উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়বে চারদিক।

শেষবার ঝাঁপাবার আগে ধনুকের মতো বেঁকে উঠল বেজির পিঠটা। তার লোমগুলো প্রচণ্ড আক্রোশে শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল। এই বুঝি সে ঝাঁপ দেবে। ছিন্নভিন্ন করে দেবে নেতিয়ে পড়া সাপের ফণাটা! উত্তেজনা আর সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলতে যাচ্ছিল রাহুল, কিন্তু সে চোখ বন্ধ করতে পারল না।

বেজিটা যেন বড়ো বেশি সময় নিচ্ছে ঝাঁপ দেবার আগে! রাহুল ভালো করে তাকাল বেজিটার দিকে। সে যেন কাঁপতে শুরু করেছে! হ্যাঁ, ঠিক তা-ই! কয়েক মুহূর্তমাত্র, তার আর ঝাঁপ দেওয়া হল না। টলতে টলতে পাশ ফিরে পড়ে গেলেন ভগবান। একটু কেঁপে উঠে চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে গেলেন তিনি! ঠিক এই সময় মহাসর্প আবার ফণা তুলে গর্জন করে উঠল—'হি-স-স-স...।' ঘটনাটা বুঝে উঠতে মুহূর্তখানেক সময় লাগল সবার। সাপটা আসলে কৌশলে পিছনে সরে গিয়েছিল, যাতে বেজিটা তাকে পিছন থেকে আক্রমণের সুযোগ না পায়। বেজিটা তার ওপর শেষবার আক্রমণ করার সময় তার দেহ চিরে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মহাসর্পও সেই সুযোগে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল জম্ভলা দেবতার পেটের নীচের রোমহীন অংশে। তার দেহে বিষ ঢেলে দিয়েছে হিমালয়ান কিং কোবরা, শ্রীবাস্তবের পোষ্য কালোসোনা।

একটা গাছের পাতা পড়লেও যেন শব্দ শোনা যাবে! জনতা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না ব্যাপারটা! পা উলটে পড়ে আছেন তাদের দেবতা! কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল শ্রীবাস্তবের উল্লাসধ্বনিতে। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তারপর এক লাফে চৌবাচ্চায় নেমে হাত দিয়েই তাঁর কালো সোনাকে ধরে নীচ থেকে তুলে আনলেন। সাপটার এক ছোবলেই যে তাঁরও ওই ভগবানের মতো দশা হতে পারে তা তাঁর খেয়ালই নেই। আর সাপটাও যেন আনন্দে জড়িয়ে ধরল শ্রীবাস্তবের দেহ। সাপটার ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে।

কোঞ্চক নির্বাক, হতভম্ব। তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে থাকা মৃত বেজিটার দিকে। এ ঘটনা যে ঘটতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি। উপস্থিত লোকজনও এবার একটু তফাতে সরে গিয়ে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল শ্রীবাস্তবের দিকে। এ লোকটাই তো এবার জম্ভলা দেবতার পুরোহিত হবেন অথবা নতুন পুরোহিত নির্বাচন করবেন। ধর্মের নিয়মকানুন তো মানতেই হবে।

সাত

পাহাড়ের মাথায় সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। অন্ধকার নামতে চলেছে চারপাশের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা পাইনবনের ভিতর। ঠান্ডা বাতাস বয়ে আসছে সেই বনের ভিতর থেকে। শ্রীবাস্তবের একসময় খেয়াল হল যে সাপটাকে তিনি গায়ে জড়িয়ে রেখেছেন। তিনি বাক্সে পুরে ফেললেন তাঁর পোষ্যকে। তারপর বাক্সটা রাহুলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে পুরোহিত কোঞ্চকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কোঞ্চকের হুঁশ ফিরল এবার। তিনি কাষ্ঠ হাসি হেসে শ্রীবাস্তবকে বললেন, 'তুমি তাহলে জিতে গেলে! তুমি যখন এখানে এলে, তখনই তোমাকে আমার চেনাচেনা লাগছিল। তুমি কে বলো তো?'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'সেসব পরিচয় পরে দেব। আমার দেহের ক্ষতচিহ্নগুলো নিশ্চয়ই প্রমাণ করছে আমি এ গ্রামেরই মানুষ। আর এই ক্ষতচিহ্নগুলো যে জম্ভলা দেবতার অভিশাপ, তাও তুমি জানো। যা-ই হোক, এসব কথা পরে হবে। অন্ধকার নামতে চলেছে, গ্রামবাসী তোমার শেষ কথা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করছে। তুমি আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের ফলাফল ও তোমার প্রধান পুরোহিতের পদ থেকে অপসারণের ব্যাপারটা ঘোষণা করো। নইলে কাজটা আমাকেই করতে হবে। সেটা তোমার পক্ষে সম্মানজনক হবে না।'

শ্রীবাস্তবের কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত কী ভাবলেন কোঞ্চক। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন ধীরে ধীরে বেদির ওপর গিয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গেই তাঁর পাশে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীবাস্তবও। কোঞ্চক একবার সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার পাশে দাঁড়ানো এই আগন্তুক এ গ্রামের বাসিন্দা বলে প্রমাণ দিয়েছে। সে পরাজিত করেছে জম্ভলা দেবতাকে। কাজেই ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে সে বা তার নির্বাচিত কোনও লোক কাল থেকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করবে। এই মন্দির বা গ্রামের যাবতীয় কার্য পরিচালিত হবে তার নির্দেশমতো। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি নিলাম।'

শ্রীবাস্তব তাঁর কথা শেষ হলে জনতার উদ্দেশে বললেন, 'আগামীকাল সকালে আপনারা আবার সমবেত হবেন এই চত্বরে। তখন প্রধান পুরোহিতের নাম ঘোষণা করা হবে। অনুষ্ঠান শেষ হল। এবার আপনারা ঘরে ফিরে যান।'

উপস্থিত জনতা একবার জয়ধ্বনি করে উঠল জম্ভলা দেবতার নামে, তারপর নিশ্চুপভাবে মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করতে লাগল। বিস্ময়ের ঘোর তখনও তাদের কাটেনি।

জনশূন্য হয়ে গেল মন্দির চত্বর। সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে রইল রাহুল, শ্রীবাস্তব, সদ্য অপসারিত পুরোহিত কোঞ্চক আর দু-চারজন মন্দিরের লোক। কোঞ্চক শ্রীবাস্তবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার ঘরে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাল থেকে তো তোমাকেই এ মন্দিরের দায়িত্ব নিতে হবে। ইচ্ছা করলে অবশ্য তুমি এখনই আমার প্রধান পুরোহিতের ঘরটারও দখল নিতে পারো। সে অধিকার তোমার এখন আছে।' কোঞ্চকের শেষের কথাগুলোতে স্পষ্ট ক্ষোভের আভাস ধরা দিল।

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'আমরা যে ঘরে আছি, সেখানেই থাকব।'

ঠিক এই সময় ঝুপ করে অন্ধকার নামল। রাহুল আর শ্রীবাস্তব মন্দিরের দিকে এগোল নিজেদের ঘরে ফেরার জন্য। কোঞ্চক আর অন্য লোকেরাও ঢুকে গেল মন্দিরে। শূন্য মন্দির প্রাঙ্গণে সেই চৌবাচ্চায় শুধু পড়ে রইল জম্ভলা দেবতার প্রতিরূপ সেই বেজিটা।

নিজেদের ঘরে ঢোকার পর রাহুল বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথার মধ্যে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!'

শ্রীবাস্তব একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা বোঝার জন্য এতটা সময় যখন অপেক্ষা করলেন, তখন না হয় কালকে সকাল পর্যন্ত আর একটু ধৈর্য ধরুন।'

রাহুল বলল, 'আপনি কি পুরোহিতের দায়িত্ব নিয়ে এখানেই থেকে যাবেন?'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'না, ও দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা আমার নেই। কাল সকালেই আমরা ফিরে যাব।'

তিনি এরপর তাঁর ব্যাগ থেকে কিছু ওষুধ-মলম ইত্যাদি বার করলেন, তারপর সাপটাকেও বার করলেন বাক্স থেকে। সাপটা কিন্তু রক্তক্ষরণের ফলে সত্যিই অবসন্ন হয়ে গেছে। সে নেতিয়ে পড়েছে। শ্রীবাস্তব তার ক্ষতস্থানগুলোতে মলম লাগাতে লাগাতে বললেন, 'আশা করি আমার এই বন্ধু সুস্থ হয়ে উঠবে। আজকে ঘটনার নায়ক তো ও-ই। একমাত্র হিমালয়ান কিং কোবরাই বেজির মহড়া নিতে পারে। আজকের দিনটার জন্যই ছোটোবেলা থেকে ওকে মানুষ করেছি আমি। ও আজ না জিতলে আপনি ফিরে যেতে পারলেও আমার হয়তো ফেরা হত না।'

রাহুল বলল, 'অত বড়ো বেজি কিন্তু আমিও দেখিনি। অবিশ্বাস্য রকমের আকার!'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'হিমালয়ের জঙ্গলে বেশ বড়ো একপ্রকার বেজি পাওয়া যায়। ওটা সেই প্রজাতিরই। জাপানে সুমো কুস্তিগিরদের যেমন বিভিন্ন আরক খাইয়ে দেহ বিশাল করা হয়, তেমনই বেজিটাকেও আরক খাইয়ে অমন বড়ো করা হয়েছে, যাতে লোকে ভাবে ও সত্যিই দেবতার প্রতিরূপ। প্রধান পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে খুব গোপনে কাজটা করা হয়। সারা বছর লোকচক্ষুর আড়ালে ওকে রাখা হয় ওই একটা দিন ছাড়া। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল ও অমর। কারণ ও দেবতারই অংশ। ওকে আমার বাবা দেখেছেন, ঠাকুরদা দেখেছেন। গ্রামের অনেকেই চার-পাঁচ পুরুষ দেখেছে ওকে। কিন্তু একটা বেজি তো এত বছর বেঁচে থাকতে পারে না। আসলে একটা বেজির মৃত্যু হলে গোপনে তার জায়গাতে আর একটা বেজি আনা হয়। তাকেও একইভাবে বিশালাকৃতি বানায় প্রধান পুরোহিত।'

নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল রাহুলরা। হঠাৎ দরজায় টোকা দেবার শব্দ হল। কথা নামিয়ে সাপটাকে বাক্সে পুরে দরজা খুললেন শ্রীবাস্তব। দরজার বাইরে কোঞ্চক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে পুরোহিতের জেল্লাদার পোশাক নেই, নিতান্তই সাদামাটা একটা পোশাক। তাঁকে দেখে শ্রীবাস্তব জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার?'

কোঞ্চক বললেন, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বরাবরের জন্য মন্দির ছেড়ে চলে যাব। সাত পুরুষ ধরে আমরা এ মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের কাজ করেছি, কাল থেকে অন্যের আজ্ঞাবহ হয়ে এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিববতে ফিরে যাব আমি। বাকি জীবনটা ওখানেই কাটাব।' শেষ কথাগুলো বলার সময় বেশ করুণ শোনাল প্রাক্তন পুরোহিত কোঞ্চকের গলা।

শ্রীবাস্তব বললেন, 'তুমি কিন্তু অনায়াসে থেকে যেতে পারো এখানে। তোমাকে বিতাড়িত করার কথা কিন্তু আমি বলিনি।'

কোঞ্চক বললেন, 'যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় এ মন্দির পরিচালনার জন্য যে নিয়ম আমরা বানিয়েছি, তার কোনওটা নতুন পুরোহিত এসে ভাঙলে তা আমি সহ্য করতে

পারব না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি যাব। এখন তোমাকে একবার আমার সঙ্গে জম্ভলা দেবতার ঘরে যেতে হবে।'

'ও ঘরে যেতে হবে কেন?' জানতে চাইলেন শ্রীবাস্তব।

প্রাক্তন পুরোহিত কোঞ্চক বললেন, 'দিনে দুবার, দ্বিপ্রহর আর সন্ধ্যায় পরমান্ন নিবেদন করা হয় জম্ভলা দেবতাকে। কাজটা প্রধান পুরোহিত অর্থাৎ আমাকেই করতে হত। অন্য কেউ দেবতাকে খাদ্য নিবেদন করতে পারে না। কিন্তু সে অধিকার এখন আর আমার নেই। তুমি সে ঘরে চলো। দেবতার সামনে তাঁর রুপোর দণ্ড আমি তোমার হাতে তুলে দিয়ে প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব অর্পণ করব। অবশ্য তুমি সে দণ্ড কাল অন্য কারও হাতে তুলে দিয়ে তোমার দায়িত্ব তাকে অর্পণ করতে পারো। তবে আজ তোমাকেই প্রধান পু%রোহিতের দায়িত্ব নিয়ে দেবতাকে পরমান্ন নিবেদন করতে হবে।'

তাঁর কথা শুনে একটু ইতস্তত করতে লাগলেন শ্রীবাস্তব।

তা-ই দেখে কোঞ্চক বললেন, 'ভবিষ্যতে এই মন্দিরে নানা অনাচার ঘটবে ঠিকই, কিন্তু যাবার আগে আমি দেখে যেতে চাই যে অন্তত শেষবারের খাবারটা জম্ভলা দেবতা পেয়েছেন। এতদিন ধরে আমি তাঁর সেবা করেছি, এটুকু যাবার আগে আমি চাইতেই পারি। এ চাওয়া কি তোমার কাছে খুব অযৌক্তিক মনে হচ্ছে?' এবার স্পষ্টতই শ্রীবাস্তবের প্রতি একটা অনাস্থা আর মৃদু বিদ্রুপ ফুটে উঠল কোঞ্চকের কণ্ঠস্বরে।

ব্যাপারটা অনুধাবন করলেন শ্রীবাস্তব। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন।'

কোঞ্চকের সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরিয়ে রাহুলরা এগোল জম্ভলা দেবতার কক্ষে যাবার জন্য। সারা মন্দিরে কোনও আলো জ্বলছে না। শ্রীবাস্তব জিজ্ঞেস করলেন, 'মন্দিরে অন্য সব লোকজন কই?'

কোঞ্চক জবাব দিলেন, 'সবাই গ্রামে ফিরে গেছে। আমার পদচ্যুতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে আমার অধীনস্থ অন্য পুরোহিত ও কর্মীদেরও পদচ্যুতি ঘটেছে। তুমি বা তোমার নির্বাচিত নতুন পুরোহিত তাদের আবার নিয়োগ করবে।'

অন্ধকার অলিন্দ পেরোতে পেরোতে কোঞ্চক এরপর প্রশ্ন করলেন, 'তোমার আসল নামটা বলো তো? তোমাকে আমার চেনা লাগছে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

একটু চুপ করে থেকে শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'তখন আমার নাম ছিল তাশি ডিং। তোমার বাবা পুরোহিত কর্মা রিনচেনের সময় আমি এ গ্রাম ত্যাগ করি। তখন তুমি যুবক ছিলে। কর্মার সহকারী পুরোহিত হিসাবে মন্দিরে কাজ করতে। তুমি আর তোমার বাবা মিলে...' কথাটা আর শেষ করলেন না তাশি ডিং ওরফে পদ্ম শ্রীবাস্তব।

কিন্তু এটুকু শুনেই যেন একবার থমকে দাঁড়ালেন কোঞ্চক। তারপর বললেন, 'তোমার বাবার নাম ছিল—ম্যাংগেল ডিং!'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ম্যাংগেল ডিং। এবার মনে পড়ল তবে?'

অন্ধকারে কোঞ্চকের মুখের অভিব্যক্তি ঠিক বোঝা গেল না। তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই জম্ভলা দেবতার গর্ভগৃহে নেমে এল ওরা। বড়ো একটা প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। তবে সেই প্রদীপের আলোতে কেমন যেন গা-ছমছমে লাগছে ঘরটা। স্তম্ভ, মাথার ওপর থেকে ঝুলন্ত ডাকিনী, অপদেবতাদের মূর্তিগুলো যেন

তাকিয়ে আছে রাহুলদের দিকে। খোলা জানালা দিয়েই বোধহয় একঝাঁক জোনাকি ঢুকেছে ঘরে। উড়ে বেড়াচ্ছে তারা। তাদের বিন্দু বিন্দু আলো ঘরের কোনা আর থামগুলোর আড়ালে জমে থাকা অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ় করে তুলেছে।

তিনজন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জম্ভলা দেবতার বেদির সামনে। ধূপের ধোঁয়ার আড়ালে প্রদীপের আভায় জম্ভলা দেবতার মুখে জেগে আছে রহস্যময় হাসি। তাঁর পদতলে বসে থাকা ডাকিনীও যেন ঘাড় ফিরিয়ে আছে রাহুলদের দিকে।

হঠাৎ রাহুলের মনে পড়ে গেল শ্রীবাস্তবের একটা কথা। সে তাকাল জম্ভলা দেবতার স্ফীত পেটের দিকে। তাঁর পেটে যেমন লম্বালম্বিভাবে একটা চেরা দাগ আছে। যদিও ধূপের ধোঁয়াতে সেটা ভালো করে খেয়াল না করলে বোঝা যায় না।

বেদির নীচেই এক কোনাতে একটা কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর জম্ভলা দেবতার রুপোর দণ্ডটা রাখা ছিল। রাহুল চিনতে পারল সেটা। বেজিমুখী এই দণ্ড বা রুপোর ছড়িটাই বিকালবেলা ধরা ছিল কোঞ্চকের হাতে। কোঞ্চক স্ট্যান্ড থেকে সেটা তুলে আনলেন। তারপর জম্ভলা দেবতার উদ্দেশে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ন্যায়দণ্ড আমি নতুন পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করছি।' ছড়িটা তিনি তুলে দিলেন শ্রীবাস্তবের হাতে। তারপর তাঁরা দুজনেই নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন জম্ভলা দেবতাকে। এ কাজ শেষ হবার পর কোঞ্চক তাশি ডিং ওরফে শ্রীবাস্তবকে বললেন, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি পরমান্ন নিয়ে আসছি। তুমি সেটা দেবতাকে নিবেদন করার পর তা দেখে আমি মন্দির ছেড়ে চলে যাব।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আচ্ছা।'

কোঞ্চক এগোলেন পরমান্ন আনার জন্য। রাহুলরা দাঁড়িয়ে রইল বেদির সামনে। ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একটা দরজা অতিক্রম করে তবে গর্ভগৃহে ঢুকতে হয়। কোঞ্চক সেই দরজাটা অতিক্রম করলেন, আর তারপরই হঠাৎ সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল সেই ভারী কাঠের দরজাটা! কী হল?

শ্রীবাস্তব সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন দরজার সামনে। হাতের দণ্ডটা দিয়ে বন্ধ কপাটে আঘাত করে তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি দরজা বন্ধ করলে কেন?'

বন্ধ কপাটের আড়াল থেকে কোঞ্চকের অট্টহাসি ভেসে এল। তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি তাশি। আমার সব ঘটনা মনে পড়ে গেছে। সেবার তুমি গর্ভগৃহ থেকে বেঁচে ফিরলেও এবার আর ফিরবে না। পরমান্ন নয়, তোমাদের দিয়েই ভোজ সারবেন জম্ভলা দেবতা আর তাঁর ডাকিনী। অনেকদিন তাঁরা নরমাংসের স্বাদ পাননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রদীপের আলো নিবে যাবে। কেউ কিছু জানার আগেই তোমাদের কঙ্কালগুলো আমি পুঁতে দেব। কাল ভোরে গ্রামবাসীরা যখন আসবে, তখন আমি তাদের বলব, তুমি আমার হাতেই আবার প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব সমর্পণ করে মন্দির ছেড়ে চলে গেছ। কেউ কিছু জানবে না...'

শ্রীবাস্তব তাঁর কথা শুনে উত্তেজিতভাবে হাতের দণ্ডটা দিয়ে দরজায় আঘাত করতে করতে বললেন, 'কী পাগলামি করছ কোঞ্চক? দরজা খোলো! ভুলে যেয়ো না, এখন আমি দেবতার প্রধান পুরোহিত। আমি তোমাকে শাস্তি দিতে পারি।' ওপাশ থেকে আবার অট্টহাস্য শোনা গেল কোঞ্চকের। তিনি বলে উঠলেন, 'মূর্খ। কাল সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তো তুমি আমাকে শাস্তি দেবে? কালকে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য তোমাদের আর হবে না। কাল থেকে আবার জম্ভলা দেবতার প্রধান পুরোহিত কোঞ্চক। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন আমিই এ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।'

শ্রীবাস্তব চিৎকার করে উঠলেন, 'শয়তান!!'

আবার অট্টহাস্য শোনা গেল কোঞ্চকের। তারপর ওপরে ওঠার সিঁড়িতে তাঁর নাল লাগানো বুটের শব্দ আর অট্টহাস্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। শ্রীবাস্তব পাগলের মতো বেশ ক'বার ঘা দিলেন দরজাতে। চেষ্টা করে দেখলেন দরজাটা কোনওভাবে খোলা যায় কি না। কিন্তু লোহার পাটা লাগানো ভারী কাঠের দরজা পাথুরে দেওয়ালের মতোই শক্ত। তাকে খোলা যাবে না।

রাহুল দেখতে পেল ঠান্ডাতেই ঘাম জমে উঠেছে শ্রীবাস্তবের কপালে। তাঁর মুখটা সাদা কাগজের মতো ফ্যাকশে হয়ে গেছে! রাহুলের উদ্দেশে তিনি বলে উঠলেন, 'আমরা ফাঁদে পড়ে গেলাম! জানি না এ ঘর থেকে বেঁচে ফিরব কি না।'

রাহুল বলল, 'কেন বেঁচে ফিরব না? এ ঘরে কী আছে?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ ঘরে ঢুকবে তারা। তারপর আমাদের ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে।'

রাহুল বলল, 'কারা তারা?'

তিনি জবাব দিলেন, 'জম্ভলাদেবের অনুচররা। ভয়ংকর হিংস্র ওরা। ওদের দীর্ঘদিন অভুক্ত রাখা হয়। কোনও জীবন্ত প্রাণীর দেখা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। স্তম্ভ, মেঝেতে যে ছিদ্রগুলো দেখছেন, ওখান দিয়েই বেরিয়ে আসে!'

হঠাৎই রাহুলদের পায়ের নীচের মেঝেতে একটা অদ্ভুত শব্দ হল। আর তার পরমুহূর্তেই দেওয়াল-থামগুলোর ভিতর থেকে অদ্ভুত খসখস শব্দ শুরু হল। যে শব্দ কানে যাওয়ামাত্রই শ্রীবাস্তব বলে উঠলেন, 'শয়তানটা মনে হয় এ ঘরের নীচে একটা কাঠের পাটাতন আছে, সেটা সরিয়ে দিয়েছে! মাটির নীচের ঘর থেকে দলে দলে উঠে আসছে তারা। ও তারই শব্দ! চলুন চলুন, দেবতার বেদিতে গিয়ে উঠতে হবে।' —এই বলে তিনি ছুটলেন জম্ভলা দেবতার বেদির দিকে। তাঁর পিছন পিছন ছুটে বেদিতে গিয়ে উঠে পড়ল রাহুলও।

ঝুপ ঝুপ! একটু শব্দ হল। রাহুল দেখল দুটো বেজি লাফ দিয়ে স্তম্ভের ফোকর থেকে মেঝেতে নামল! তারপর অন্য একটা স্তম্ভের গায়ে বসানো অপদেবতার মুখের ভিতর থেকে আরও তিনটে! মেঝে ফুঁড়েও যেন উঠে এল বেশ কয়েকটা! সারা ঘরে ছোটাছুটি শুরু করল তারা। বেজির সংখ্যা যেন বাড়তেই থাকল ঘরের মধ্যে। তারা কেউ নেমে আসছে স্তম্ভের ভিতর থেকে, কেউ বা আবার উদয় হচ্ছে মেঝের ভিতর থেকে। রাহুল আর শ্রীবাস্তব ওপর থেকে দেখতে লাগল তাদের। অসংখ্য আলোকবিন্দু ছোটাছুটি করে চলেছে আধো-অন্ধকার ঘরের মেঝেতে! ক্ষুধার্ত প্রাণীগুলোর চোখ যেন জিঘাংসায় জ্বলছে! বেশ কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর হঠাৎই যেন তারা শান্ত হয়ে ঘরের ঠিক মাঝখানে জড়ো হল। একসঙ্গে মাথা উঁচু করে তারা তাকাল বেদির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা রাহুলদের দিকে। তারপর ধীর অথচ ছন্দোবদ্ধভাবে, ঠিক যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা এগোয়, তেমনই এগোতে শুরু করল বেদির দিকে। রাহুল আতঙ্কে শিউরে উঠল।

বেদির ঠিক নীচে এসে থেমে গেল জম্ভলা দেবতার অনুচররা। তারপর কয়েকটা বেজি ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে। কিন্তু তারা বেদির কাছাকাছি পৌঁছোতেই শ্রীবাস্তব তাঁর হাতের ছড়িটা উলটো করে ধরে আঘাত হানতে শুরু করলেন। যে কয়েকটা বেজি ওপরে উঠে এসেছিল, তারা সে আঘাতে ছিটকে পড়ল নীচে। বিজাতীয় আর্তনাদ করে উঠল তারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও একটা দল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। শ্রীবাস্তব আবার আঘাত দিতে শুরু করলেন। আবারও নীচে পড়ে গেল বেজির দল। বারকয়েক এমন হবার পর পুরো দলটাই পিছু হটে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ছোটো ছোটো পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে তারা, নিশ্চলভাবে। ঠিক যেমন গর্ভগৃহ বা দেওয়ালের গায়ে বেজির মূর্তি খোদাই করা আছে, সেইভাবে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যেতে লাগল। একসময় রাহুল একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ওরা মনে হয় আর এগোবে না। মার খেয়ে ভয় পেয়ে গেছে। রাতটা এভাবে কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই ভোরে নিশ্চয়ই লোকজন চলে আসবে। আপনি তো এখন প্রধান পুরোহিত। তাই তারা নিশ্চয়ই এখন মুক্তি দেবে আমাদের।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আপনার ধারণা ভুল। ওরা অপেক্ষা করছে প্রদীপটা নিভে যাবার জন্য। তারপরই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার এ বিপদের জন্য আমি দায়ী। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আগে যা-ই ভাবনা থাক আমার, আপনি যখন আমার সঙ্গী হলেন, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কোনও ঝামেলায় জড়াব না আমি। কিন্তু যখন শুনলাম যে কোঞ্চক বাচ্চা ছেলেটাকে এ ঘরে ঢোকাবে, তখনই আবার মনে হল, কিছু একটা করতে হবে। তবুও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না, দোলাচলে ভুগছিলাম। শেষে আপনাকে দিয়ে আঙুল ধরালাম...।'

প্রদীপ শিখাটা এবার দপদপ করে উঠল। শ্রীবাস্তব বললেন, 'ধরে নিন যতক্ষণ প্রদীপটা জ্বলবে, ততক্ষণই আমাদের আয়ু।'

রাহুলরা বুঝে উঠতে পারছে না কী করা উচিত তাদের। এভাবেই কি মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনবে তারা? বেজিগুলো তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। মাঝে মাঝে হাই তোলার মতো মুখ খুলছে। আধো-অন্ধকারও ঝিকমিক করছে তাদের তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো। অজস্র, অগুনতি বেজি জড়ো হয়েছে গর্ভগৃহে!

শ্রীবাস্তবের অনুমানই ঠিক হল। প্রদীপটা দপদপ করতে করতে নিভু নিভু হয়ে এল একসময়। বেজির দল এগোতে শুরু করল আবার। শ্রীবাস্তব লাঠি চালাতে শুরু করলেন। নীচে ছিটকে পড়তে শুরু করল প্রাণীগুলো। এবার কিন্তু তারা আর পিছু হটল না। দলে দলে উঠতে শুরু করল বেদির দিকে। পাগলের মতো লাঠি চালাচ্ছেন শ্রীবাস্তব। রাহুলও লাথি ছুড়তে শুরু করল বেদির মুখে উঠে আসা প্রাণীগুলোকে লক্ষ্য করে। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ তারা ঠেকিয়ে রাখবে এত প্রাণীকে! একটা বেজি নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনটে প্রাণী উঠে আসছে! ইতিমধ্যে কীভাবে যেন একটা বেজি উঠে এসে কামড়ে ধরল শ্রীবাস্তবের ডান পা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে পা থেকে বেজিটাকে খুলে নিয়ে তিনি সজোরে ছুড়ে মারলেন একটা থামের গায়ে। বেজিগুলো তা-ই দেখে এবার প্রচণ্ড ফ্যাঁসফ্যাঁস চিৎকার শুরু করল বিজাতীয় আক্রোশে। ভয়ংকর সেই নারকীয় ধ্বনি!

প্রদীপটা প্রায় নিভে এসেছে। আর হয়তো কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরই তারা বেদিতে উঠে এসে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে তাদের দুজনকে!

হঠাৎ রাহুলদের পিছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ হল। প্রাণীগুলো কোনওভাবে পিছন থেকেও উঠে এসেছে নাকি? আতঙ্কে পিছনে ফিরে তাকাল রাহুল। জম্ভলা দেবতার মূর্তির গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে ছিল তারা। রাহুল দেখল জম্ভলা দেবতার পেটটা দু-ফাঁক হয়ে গেছে, তার তার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা মাথা! আরে, এ যে ডং-পো! মাথার পর সে তার দেহটাও অর্ধেক বার করে ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে তাকাল। তারপর পরিস্থিতি বুঝতে পেরে চিৎকার করে কী বলে উঠল। লাঠি চালাতে চালাতে পিছনে ফিরে তাকালেন

শ্রীবাস্তব। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'আপনি তাড়াতাড়ি দেবতার পেটের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরোন, আমি তারপর বেরোচ্ছি।'

সত্যিই জম্ভলাদেবের পেটের ভিতর মানুষ গলে যেতে পারে। ডং-পো-ও ইঙ্গিত করছে দ্রুত বাইরে বেরোবার জন্য। প্রদীপটা হয়তো এখনই নিভে যাবে। কালো শয়তানদের পুরো দলটাই যেন এবার উঠে আসছে বেদির দিকে। আর সময় নষ্ট করল না রাহুল। শরীরটাকে সে সেঁধিয়ে দিল জম্ভলা দেবতার পেটের ভিতর। আর তারপর শ্রীবাস্তবও ঢুকে পড়লেন সে পথে। ওপাশে একটা আধো-অন্ধকার ঘর। তবে সে ঘরে বাইরে যাবার জন্য দরজাটা খোলা আছে। শ্রীবাস্তব ডং-পো-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে এলে কীভাবে?'

সে জবাব দিল, 'আমি মন্দির থেকে গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলা শুনলাম তুমি নাকি দেবতাকে মেরে পুরোহিত হয়েছ। তাই দেখা করতে এলাম তোমার সঙ্গে। কিন্তু মন্দিরের কোথাও তোমাকে পেলাম না। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম কোঞ্চককে। অন্ধকারে আমি তার পিছু নিলাম। দরজা খুলে সে ঢুকল এ ঘরে। আমি দরজার আড়াল থেকে তাকে দেখতে লাগলাম। সে প্রথমে দেওয়ালের গায়ের ওই বড়ো হাতলটা ঘুরিয়ে কী যেন করল, তারপর তোমরা যেখান দিয়ে বেরোলে, এই জায়গায় দেওয়ালের গায়ে চোখ রেখে কী যেন দেখতে লাগল। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই ওপাশে জম্ভলা দেবতার ঘরের ভিতর থেকে তোমাদের চিৎকার আর বেজির ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর কোঞ্চক দরজা বন্ধ করে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি ঘরে ঢুকে এই দেওয়ালের কাছে চলে এলাম। কাঠের দেওয়ালের গায়ে দেখি একটা দরজার পাল্লার মতো দাগ। সে জায়গা ধরে টানতেই সেটা একপাশে সরে গিয়ে একটা ফোকর বেরিয়ে গেল। সেটা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিতেই তোমরা দেখতে পেলে আমাকে।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল ডং-পো।

শ্রীবাস্তব কথাগুলো রাহুলকে তরজমা করে দিয়ে বললেন, 'দেওয়ালের গায়ের ওই হাতল ঘুরিয়েই সম্ভবত মাটির তলার কাঠের পাটাতন সরিয়ে নীচ থেকে বেজিগুলোকে ওপরে ওঠানো হয়, আর দেওয়ালের গায়ের এই ছিদ্র দিয়ে গর্ভগৃহের ভিতরটা লক্ষ করা হয়। আজ সকালে যখন আমরা গর্ভগৃহে ঢুকেছিলাম, তখনই ধূপের ধোঁয়ার মধ্যেই একবার যেন মনে হয়েছিল যে জম্ভলা দেবতার পেটটা মৃদু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া পেটের ওই দাগটা দেখে আমার কেন জানি মনে হয়েছিল যে দেবতার পেটটা ফাঁপা হতে পারে। যে কারণে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি দেবতার পেটটা খেয়াল করেছেন কি না।'

হঠাৎই জম্ভলা দেবতার ফাঁপা পেটের গহ্বর থেকে একটা বেজি লাফিয়ে নামল রাহুলরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তার সামনেই। রাহুল ফোকরটা বন্ধ করতে গেল, কিন্তু সেটা আর বন্ধ হচ্ছে না। ইতিমধ্যে আরও দুটো বেজি বেরিয়ে এল সেখান থেকে। তাদের একটা তো প্রায় রাহুলের বুকের ওপরই ঝাঁপ দিল। শ্রীবাস্তব বললেন, 'এখনই আমাদের ঘর ছাড়তে হবে। বেজির দল আসতে শুরু করেছে। সংখ্যায় বেশি হলেই তখন ওরা আমাদের আক্রমণ করবে।'

শ্রীবাস্তবের কথা শেষ হতে না হতেই আরও কয়েকটা বেজি বেরিয়ে এল ফোকর দিয়ে। রাহুলরা আর দাঁড়াল না সেখানে। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে বেজিগুলো যাতে আর বাইরে বেরোতে না পারে, সেজন্য সে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

সামনে একটা আধো-অন্ধকার বারান্দা। দু-পাশে সার সার অন্ধকার ঘর। কোঞ্চক মন্দিরের ভিতর কোথায় আছে কে জানে? সন্তর্পণে ওরা তিনজন এগোতে লাগল সেই বারান্দা ধরে। সে বারান্দা সম্ভবত শেষ হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে। কিছুটা এগোবার পরই হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল রাহুলদের। কাঠের মেঝেতে লোহার নাল লাগানো জুতোর শব্দ! বাইরের চত্বরটা মনে হয় সামনেই। কারণ, সামনের বাঁকের মুখেই আবছা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজন থেমে গেল। তারপরই ওরা দেখল বাঁক ফিরে কোঞ্চক সোজা এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা তিনজন ঢুকে পড়ল অলিন্দ লাগোয়া একটা অন্ধকার ঘরে। কোঞ্চক তাদের দেখতে পেলেন না। সে ঘরটার সামনে দিয়েই তিনি জুতোর শব্দ তুলে এগোলেন রাহুলরা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে। সম্ভবত তিনি যাচ্ছেন গর্ভগৃহের লাগোয়া ঘরটাতে। জম্ভলা দেবতার পেটের ছিদ্র দিয়ে রাহুলদের অবস্থা দেখার জন্য।

এগিয়ে গেলেন তিনি। রাহুলরা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিক থেকে যেন ভেসে এল একটা শব্দ। সম্ভবত দরজা খোলার শব্দ। তারপর কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। শ্রীবাস্তব বললেন, 'চলুন, আমরা বেরিয়ে যাই। রাতটা বাইরে কোথাও আত্মগোপন করে থাকি। ভোর হলে ফিরে আসব। তারপর আমি শাস্তি দেব কোঞ্চককে।'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কোঞ্চকের প্রচণ্ড আর্ত চিৎকার কানে গেল রাহুলদের। বীভৎস এক চিৎকার! তারপর দেখা গেল চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন কোঞ্চক। রাহুলদের ঘরের সামনে দিয়েই চিৎকার করতে করতে বাইরের দিকে ছুটে গেলেন তিনি। সেই আধো-অন্ধকারেও রাহুলরা দেখতে পারল কোঞ্চকের দেহ কামড়ে ঝুলছে বেশ কয়েকটা বেজি। আর তাঁর পিছন পিছন ছুটছে বেজির ঝাঁক। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না রাহুলদের। বেজির দল গর্ভগৃহ ছেড়ে জম্ভলা দেবতার পেটের ছিদ্র দিয়ে এসে জমা হয়েছিল রাহুলরা যে ঘর দিয়ে বেরিয়েছে, সে ঘরে। কোঞ্চক সে ঘরে দরজা খুলে ঢুকতেই অন্ধকারে বুভুক্ষু হিংস্র বেজির দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর ওপর। নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে গেছেন কোঞ্চক। বেজির দল আর কোঞ্চক সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবাস্তব বললেন, 'চলুন, বাইরে গিয়ে দেখি কোঞ্চককে কোনওভাবে বাঁচানো যায় কি না। হয়তো ও আমাদের খুন করতে চেয়েছিল, ও অমানুষ হলেও আমরা তো মানুষ। কোঞ্চক যত বড়ো অপরাধীই হোক, তার জীবন বাঁচানো আমাদের কাজ।' এই বলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোলেন তিনি। জম্ভলা দেবতার মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে তখন ভেসে আসছে কোঞ্চকের আর্ত চিৎকার। শ্রীবাস্তবের পিছনে ছুটতে শুরু করল ডং-পো আর রাহুলও। সামনে এগিয়ে বাঁক ঘুরতেই তারা বেরিয়ে এল মন্দির প্রাঙ্গণে। জ্যোৎস্নায় আলোকিত মন্দির প্রাঙ্গণ। রাহুলরা দেখল চত্বর পেরিয়ে ছুটে চলেছেন কোঞ্চক। তাঁর পিছনে ছুটে চলেছে বেজির ঝাঁক। কোঞ্চক তখন চত্বরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছেন। শেষ একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল রাহুলদের কানে। আর তারপরই কোঞ্চক চত্বর ছেড়ে ঝাঁপ দিলেন নীচের দিকে। তাঁর পিছন পিছন অদৃশ্য হল বেজির দলও। শ্রীবাস্তব বলে উঠলেন, 'দিনের আলো ফুটে ওঠার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। কোঞ্চককে আর অন্য কোনও শাস্তি দিতে হল না। বংশপরম্পরায় গ্রামবাসীদের নিজেদের বশে রাখার জন্য যে পাপ ওরা করেছে, তার জন্য পেল কোঞ্চক।' এরপর তিববতি ভাষায় ডং-পো-র সঙ্গে কথা শুরু করলেন শ্রীবাস্তব ওরফে তাশি ডিং। মন্দির প্রাঙ্গণে বসেই রাতটা কেটে গেল রাহুলদের। একসময় দূরে পাহাড়ের মাথায় লাল আভা ফুটে উঠতে শুরু করল।

বেলা প্রায় আটটা বাজে। তার মধ্যেই মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছে গ্রামবাসীরা। ভিড়টা গতকালের থেকে যেন আজকে বেশি। গ্রাম ভেঙে পড়েছে নতুন পুরোহিতকে দেখার জন্য। তবে সে ভিড়ের মধ্যে প্রাক্তন পুরোহিত কোঞ্চক নেই। তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শুয়ে আছেন মন্দিরের ভিতরেই এক ঘরে। মন্দির প্রাঙ্গণের নীচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে ওপরে তুলে আনা হয়েছে। শ্রীবাস্তবের নির্দেশে তাঁর প্রয়োজনীয় পরিচর্যাও শুরু হয়েছে। তাঁর অবস্থা দেখে রাহুলদের মনে হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাবেন তিনি। কিন্তু গ্রামবাসীদের দয়ার ওপরই বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। কারণ, হিংস্র বেজিগুলোর আক্রমণে তাঁর দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেছে।

ঢাক বাজতে শুরু করেছে মন্দির প্রাঙ্গণে। হিমেল বাতাসে উড়ছে রঙিন পতাকাগুলো। দিনের প্রথম সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত মন্দির প্রাঙ্গণ। সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে জম্ভলা দেবতার মন্দিরের সোনালি চূড়াগুলো। জনতার মধ্যেও যেন খুশির উচ্ছ্বাস। যেন তারা এক দম বন্ধ করা আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়েছে। রাহুলের এক একসময় মনে হতে লাগল যে গতকাল রাতের ঘটনাটা যেন নেহাতই একটা দুঃস্বপ্ন ছিল।

ঢাক বাজতে শুরু করল দ্রুতলয়ে। তার সঙ্গে ঝাঁজর, ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। সমবেত জনতা গিয়ে উপস্থিত হল সেই বেদিটার নীচে। রাহুলরাও এগোল সেদিকে। ডং-পো-কে নিয়ে বেদির ওপর উঠলেন শ্রীবাস্তব। তারপর সবাইকে চমকে দিয়ে তার হাতে তুলে দিলেন জম্ভলা দেবতার বেজিমুখী সেই রুপোর ছড়ি। জম্ভলা দেবতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করল ডং-পো। তার জন্যই তো রাহুলরা প্রাণে বাঁচল। সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল ডং-পো আর জম্ভলা দেবতার নামে। দায়িত্বগ্রহণের পর ডং-পো কয়েকটা কথা বলল তিববতি ভাষায়। ছোট্ট অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। জম্ভলা মন্দিরের নতুন পুরোহিতকে নিয়ে আনন্দ উৎসব শুরু হল। শ্রীবাস্তব নীচে নামার পর রাহুল তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ডং-পো তার বক্তৃতায় কী বলল?'

শ্রীবাস্তব বা তাশি ডিং হেসে বললেন, 'ও বলল, এবার থেকে আর বেজি পোষা হবে না মন্দিরে। জম্ভলা দেবতার ঘরেও কাউকে আটকে রাখা হবে না। বেজি আর সাপের লড়াইও বন্ধ এবার থেকে। এ ব্যাপারগুলো বন্ধ করবে বলে সে কথা দিয়েছিল আমাকে।'

রাহুলরা ঘর থেকে তাদের জিনিসপত্র আগেই নিয়ে এসেছিল। শ্রীবাস্তব এরপর বললেন, 'চলুন, সবাই এখন নতুন পুরোহিতকে নিয়ে যেতে আসছে। এই সুযোগে আমরা চত্বর ছাড়ি। নইলে ভালোবাসার টানে ডং-পো আমাদের আটকে দিতে পারে।' এরপর প্রায় সবার অলক্ষেই চত্বর ছাড়ল ওরা দুজন।

সে জায়গা থেকে নীচে নেমে শ্রীবাস্তব বললেন, 'ফিরে যাবার আগে আমি একটু গ্রামের দিকে যাব। আমি আর কোনও দিন হয়তো জন্মভূমিতে ফিরে আসব না। আমার কাজকর্ম, সংসার, পরিজন এখন সব কিছুই কলকাতাতে। আমি তো আর তাশি ডিং নই, পদ্ম শ্রীবাস্তব। তাই যাবার আগে শেষ কাজটা সেরে যাই।'

রাহুলরা এরপর এগোল গ্রামের দিকে। গত দিনের মতোই কিন্তু গ্রামে থামল না ওরা। গ্রাম ছাড়িয়ে পিছনের পাইনবনে গিয়ে ঢুকল। প্রাচীন পাইনবনে বাতাসের কানাকানি। রাহুলরা উপস্থিত হল সেই বাড়ির ধ্বংসাবশেষের কাছে। শ্রীবাস্তব তাঁর ব্যাগ থেকে স্নেক হুকটা বার করে ঢুকে পড়লেন ছাদহীন সেই কাঠামোটার মধ্যে। রাহুল প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ফেরার সময় এখান থেকে সাপ ধরে নিয়ে যাবেন নাকি?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'দেখি কী পাওয়া যায়।'

ছাদহীন সেই ঘরের কোণে গত দিনের সেই গর্তটার সামনে ঝুঁকে বসলেন তিনি। স্নেক হুকটা ঢুকিয়ে দিনের গর্তের মধ্যে। তারপর বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় যেটা বাইরে আনলেন, সেটা সাপ নয়, মাটি মাখা কী একটা জিনিস।

ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে জিনিসটা তিনি ধুতে শুরু করলেন। মাটি খসে গেল তার গা থেকে। রাহুল অবাক হয়ে দেখল শ্রীবাস্তবের হাতে ধরা রয়েছে একটা সবুজ রঙের জম্ভলা দেবতার মূর্তি!

মূর্তিটা তুলে ধরলেন তিনি। পাইনবনের ফাঁক গলে আসা সূর্যের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার সবুজ অঙ্গ। ঝলমল করছে শ্রীবাস্তবের চোখও। মূর্তিটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এটা একটা দুর্লভ অ্যান্টিক। এই মূর্তিটার বয়স অন্তত হাজার বছর। আমার পূর্বপুরুষরা তিববত থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এটা মন্দিরের নয়, আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি। জম্ভলা দেবতার যেসব মূর্তি আছে, তার মধ্যে সবুজ জম্ভলা দেবতাই সবচেয়ে দুর্লভ। আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন যে গর্ভগৃহে যে সিংহাসনগুলোতে ছোটো ছোটো জম্ভলা দেবতার মূর্তি আছে, তার মধ্যে একটা সিংহাসন ফাঁকা। সেটা ফাঁকা রাখা আছে সবুজ জম্ভলা দেবতার জন্যই। সিংহাসনের ছোটো মূর্তিগুলোকেই আসলে পূজা করা হয়। কোঞ্চকের পূর্বপুরুষরা কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারেনি সবুজ পাথরের তৈরি তিববতি জম্ভলামূর্তি। তবে কীভাবে তারা যেন একদিন জেনে গেল আমাদের বাড়িতে আছে এই মূর্তি। কোঞ্চকের বাবা তখন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। তিনি প্রথমে লোভ দেখালেন, তারপর ভয় দেখাতে শুরু করলেন এ মূর্তিটা তাঁর হাতে তুলে দেবার জন্য। কিন্তু আমার বাবা ম্যাংগেল ডিং কিছুতেই রাজি হলেন না পারিবারিক বিগ্রহকে কর্মা রিনচেনের হাতে তুলে দিতে। আমার মা আমার ছোটোবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। বাবা আর আমি এ বাড়িতেই থাকতাম। আমার একটা ছোট্ট বেজিও ছিল। একরাতে মূর্তিটাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য কোঞ্চকের বাবা কর্মা, কোঞ্চক আর অন্য লোকজনকে নিয়ে হানা দিল আমাদের বাড়িতে। আমি তাদের আসতে দেখেই মূর্তিটা লুকিয়ে ফেললাম বেজির গর্তে। তারা এসে মূর্তিটা খুঁজে না পেয়ে বাড়িতে আগুন লাগাল। আমাদের ধরে নিয়ে ঢোকানো হল জম্ভলা দেবতার ঘরে! সে কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা!' সে ঘটনার কথা বলতে বলতেই যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন তিনি। এরপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'পরদিন আমাদের দুটো দেহ গ্রামের বাইরে ফেলে আসা হল। মৃত ভেবেই ফেলে আসা হয়েছিল। আমার বাবার দেহটা অবশ্য একরাতেই কঙ্কালে পরিণত হয়েছিল। এক ভদ্রলোক সাপ ধরতে এসেছিলেন এখানে। তিনি দেখতে পান দেহ দুটো। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হলেও আমার দেহে তখনও প্রাণ ছিল। তিনি আমাকে তুলে নিয়ে যান হাসপাতালে। একটু সুস্থ হবার পর কলকাতায়। তাঁর পদবি ছিল শ্রীবাস্তব। নিঃসন্তান সেই শ্রীবাস্তব দম্পতি আমাকে মানুষ করেন। নাম-পদবি দেন। তাশি ডিং থেকে আমি হয়ে যাই পদ্ম শ্রীবাস্তব।'

কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। রাহুল তাঁকে কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। এরপর তিনি রাহুলকে অবাক করে দিয়ে সবুজ জম্ভলা দেবতার মূর্তিটা রাহুলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার একটা অ্যান্টিক মূর্তির শখ ছিল তা-ই না? এটা আমি আপনাকে উপহার দিলাম।'

রাহুল চমকে উঠে বলল, 'এ কী করছেন? এর দাম তো পয়সা দিয়ে মাপা যাবে না!'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'যে বিশ্বাস নিয়ে আপনি আমার সঙ্গী হয়েছিলেন, আমার পাশে বিপদে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারও কোনও দাম হয় না। মূর্তিটা আপনার কাছেই রাখুন।'

শ্রীবাস্তব এরপর ভাঙা দেওয়ালগুলোতে একবার পরম মমতায় হাত বুলিয়ে ফেরার জন্য রওনা হলেন।

সেই পাইনবন, তিববতি গ্রাম, জম্ভলা দেবতার মন্দিরকে পিছনে ফেলে কিছু সময়ের মধ্যেই ওপরে ওঠার জন্য পাকদণ্ডি ধরল ওরা। যে পথ ওদের নিয়ে যাবে পাহাড়ের মাথার রাস্তায়, যেখান থেকে নীচে নেমেছিল ওরা। জিপটা যেখানে রেখে আসা হয়েছে। হঠাৎ একটা বাঁকের আড়ালে একটা শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। পরমুহূর্তেই সেই বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ডং-পো। তার পরনে সেই শতচ্ছিন্ন পোশাকের বদলে রেশমের ঝলমলে পোশাক, কাঁধে রেশমের ঝোলা, পায়ে জুতো। সে এখন জম্ভলা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

বিষণ্ণভাবে সে বলল, 'তোমরা আজই চলে যাচ্ছ?'

শ্রীবাস্তব জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি। তুমি ভালো থেকো।'

ডং-পো তার কাঁধের ঝোলা থেকে তার সেই বেজির বাচ্চাটা বার করে বলল, 'এটা তোমাদের আমি উপহার দিলাম। নিয়ে যাও। আমি তো আর এটাকে আমার সঙ্গে রাখতে পারব না।'

শ্রীবাস্তব সম্ভবত হাত বাড়িয়ে ডং-পো-র উপহার গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যাগের ভিতর সেই কাঠের বাক্স থেকে একটা শব্দ শোনা গেল—'হি-স-স-স...!' ঠিক যেন কানাডিয়ান রেল ইঞ্জিন স্টিম ছাড়ল! হাতটকে গুটিয়ে নিলেন শ্রীবাস্তব। তারপর হেসে বললেন, 'মন্দিরে একটা বেজি থাকলে তেমন অসুবিধা নেই।' ডং-পো-র মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। সে ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল দুজনের হাতে।

রাহুল আর শ্রীবাস্তব আবার হাঁটতে শুরু করল সবুজ পাইনবন ঘেরা পাকদণ্ডি বেয়ে।

মৎস্যকন্যার খোঁজে

জাহাজটা দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। এ ধরনের জাহাজ সে আগে কখনও দেখেনি। কেপটাউন বন্দরের মূল জেটিতে যেখানে বিরাট বিরাট পণ্যবাহী জাহাজ বা যাত্রীবাহী জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তার থেকে বেশ কিছুটা তফাতে একলা দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজটা। ছোট একটা জাহাজ। লম্বাটে ধরনের। তার সামনের আর পিছনের অংশটা অত্যন্ত সরু আর ছুঁচোলো মাকুর মতো দেখতে। ডেকের ওপরটা প্রায় ন্যাড়া বললেই চলে। ক্যাপ্টেনের একটা কেবিন আছে সেখানে। আর ডেকের ঠিক সামনে বসানো আছে কামানের নলের মতো একটা নল। সেটা সম্ভবত চারপাশে, ওপর-নীচে ঘোরানো যায়। নলের পিছন থেকে লম্বা কাছি বেরিয়ে একটা লোহার স্তম্ভকে ময়াল সাপের মতো আলিঙ্গন করে আছে। সাত-আটজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল ডেকে। যেন সুদীপ্ত আর হেরম্যানের জন্যই প্রতীক্ষা করছিল তারা। হেরম্যান অবশ্য তাঁর মালপত্র আগেই জাহাজে উঠিয়ে ফেলেছিলেন, সুদীপ্তকে জাহাজে নিয়ে আসার জন্য একজন লোককে নিয়ে একটা ছোট নৌকোয় জেটিতে গেছিলেন। সুদীপ্তকে নিয়ে হেরম্যান ডেকের উপর উঠে আসতেই একজন লোক এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। লোকটার বয়স আনুমানিক বছর ষাট। গায়ে তিমি মাছের ছবি আঁকা হাফহাতা গেঞ্জি। পেশিবহুল ডান বাহুতে একটা 'অ্যাঙ্কর' অর্থাৎ নোঙরের উল্কি আঁকা আছে। লোকটা শ্বেতাঙ্গ, তবে তার মুখ রোদে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। গায়ের রংও তামাটে বর্ণের। লোকটাকে দেখে পাকা জাহাজি বলেই মনে হয়। লোকটা সামনে এসে দাঁড়াতেই হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'ইনি হলেন এই সিগাল জাহাজের ক্যাপ্টেন ও মালিক মিস্টার হ্যামার', আর সুদীপ্তকে দেখিয়ে লোকটাকে বললেন, 'আর এ-ই হল আমার বন্ধু সুদীপ্ত। ফ্লাইট পাঁচ ঘণ্টা লেট করেছে। তাই ওর আসতে দেরি হল। সারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমরা একসঙ্গেই ঘুরে বেড়াই।' ক্যাপ্টেন হ্যামার সুদীপ্তর দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যালো। সিগালে আপনাকে স্বাগত জানাই।' সুদীপ্ত ক্যাপ্টেনের সঙ্গে করমর্দন করে বুঝতে পারল ক্যাপ্টেনের খসখসে হাতের বেঁটে বেঁটে আঙুলগুলো বেশ শক্তি ধরে। হেরম্যান এরপর চারপাশে তাকিয়ে বললেন, 'মিস ক্যাথলিন কোথায় গেলেন?'

হ্যামার জবাব দিলেন, 'তিনি খোলের ভিতর তাঁর কেবিনে বিশ্রাম নিচ্ছেন।' তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাড়ে চারটে বাজে। পাঁচটা বেজে গেলে হারবার মাস্টার আর আজকের মতো জাহাজ ছাড়ার অনুমতি দেবেন না। আমি যাই। হারবার মাস্টারকে ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠিয়ে জাহাজ ছাড়ার ব্যবস্থা করি। তারপর কথা হবে।'— এই বলে তিনি এগোলেন তাঁর কেবিনের দিকে। সুদীপ্তর এখনও জানা নেই কোথায় পাড়ি জমাচ্ছে তারা, আর কেনই বা সেখানে যাচ্ছে। হেরম্যানের ডাক পেয়ে মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে কলকাতা থেকে কেপটাউনে সে উড়ে এসেছে। স্বাভাবিক- ভাবেই তারা কোথায় পাড়ি দিচ্ছে তা জানার জন্য সুদীপ্তর মনে উত্তেজনা কাজ করছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেরম্যান হেসে বললেন, 'তোমাকে বেশিক্ষণ আর রহস্যের মধ্যে রাখব না। তবে তার আগে তোমাকে একবার কেবিন থেকে ঘুরিয়ে আনি। পোশাক পালটে ফ্রেশ হয়ে নাও। ততক্ষণে সূর্যের তাপও আর- একটু কমে যাবে। ডেকে বসে গল্প হবে।' এই বলে হেরম্যান সুদীপ্তকে তার মালপত্র সমেত নিয়ে চললেন খোলের ভিতরে নামার সিঁড়ির দিকে।

বেশ কয়েকটা তল আছে কেবিনে। একেবারে নীচের তলের কেবিনে সুদীপ্তদের থাকার ব্যবস্থা। বেশ কয়েকটা কেবিন রয়েছে সেখানে। নিজেদের কেবিনে ঢোকার আগে পাশের একটা কেবিন দেখিয়ে হেরম্যান বললেন, 'ওটা মিস ক্যাথলিনের কেবিন। পেশায় প্রকৃতিবিদ। স্কটিশ নাগরিক। আমাদের সফরসঙ্গী। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার মৃদু সৌজন্য বিনিময় হয়েছে।'

সুদীপ্তদের কেবিনটা বেশ সাজানো- গোছানো। ধবধবে সাদা বিছানা, চেয়ার- টেবিল, ওয়ার্ড্রোব সবই আছে। এমনকি একটা লম্বাটে ধরনের কাঠের সিন্দুকও ডালা খোলা অবস্থায় রাখা আছে। ঘরের একপাশের দেওয়ালের গায়ে একটা বৃত্তাকারের কাচের জানলা বা পোর্ট হোল আছে। বাইরের সূর্যের আলো সেখান দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছে। দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জলরাশি। কেবিনটা বেশ পছন্দ হল সুদীপ্তর। হেরম্যান বললেন, 'কেবিনে পাখার ব্যবস্থা নেই ঠিকই, তবে শীতকাল বলে এখানে থাকতে কষ্ট হবে না। তা ছাড়া আমরা যেদিকে যাব সেদিকটা এখন বরফের রাজ্য।'

সুদীপ্ত তার জিনিসপত্র ওয়ার্ড্রোবে সাজিয়ে পোশাক পালটে ফ্রেশ হতে হতেই জাহাজটা দুলে উঠল, ইঞ্জিনের শব্দও কানে আসতে শুরু করল। সুদীপ্তরা যখন তাদের কেবিন ছেড়ে আবার ওপরে ডেকে উঠে এল, ততক্ষণে জাহাজটা জেটি ছেড়ে সমুদ্রের গভীরে এগোতে শুরু করেছে। সাত-আটজন লোক ডেকের নানা জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। শক্তপোক্ত চেহারার মাল্লা শ্রেণির লোক। কালো গাত্রবর্ণের আফ্রিকান। গায়ে ডোরাকাটা পোশাক, কারও মাথায় আবার বারান্দাওলা জাহাজি টুপি। জাহাজটা যন্ত্রচালিত হলেও একটা মাস্তুল আছে। তার গায়ে দড়াদড়ি দিয়ে গোটানো আছে বিরাট একটা পাল। সুদীপ্তদের দেখে একজন মাল্লা ভাঁজ করা দুটো কাঠের চেয়ার পাতল মাস্তুলের নীচে। হেরম্যান সুদীপ্তকে নিয়ে সেখানে বসলেন। বেলা পড়ে এসেছে। দিনের শেষ আলো খেলছে সমুদ্রের বুকে। একদল গাঙচিল খাবারের লোভে জেটি থেকে জাহাজটার পিছু ধাওয়া করেছে। ডেকের মাথার ওপর সাদা ডানা মেলে ওড়াউড়ি করছে তারা। বাতাসে মৃদু ঠান্ডা ভাব। যাত্রার শুরুটা বেশ মনোরম। জল কেটে এগোচ্ছে জাহাজ। সামনের দিকে তাকিয়ে ডেকে বসানো কামানের নলের মতো সেই নলটা দেখিয়ে সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ওটা কী?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'ওটা হল যন্ত্রচালিত হারপুন। তিমি শিকার ছাড়াও বড় আকৃতির সিল, সিন্ধুঘোটকও শিকার করা হয় এই হারপুন দিয়ে। এ জাহাজটা তিমি শিকারের জাহাজ। শিকার করতে চলেছে সাব আন্টার্কটিকায়, ভারত মহাসাগরে। ওখানে মারিয়ান নামের একটা দ্বীপ আছে। এই শীতকালে দ্বীপসংলগ্ন সমুদ্রতট বরফে ঢাকা থাকে। সমুদ্রের জলের উপরিভাগও কোথাও কোথাও পাতলা বরফে পরিণত হয়। তিমি, সিল, সিন্ধুঘোটক আর প্রচুর পেঙ্গুইন আছে সেখানে। আন্টার্কটিকা না হলেও আমরা যাচ্ছি সাব আন্টার্কটিকায়।'

কথাটা শুনে বিস্মিত হল সুদীপ্ত। সে বলল, 'এটা তিমি শিকারের জাহাজ! আমরা কি তবে কোনো দানবীয় তিমি বা জলচর প্রাণীর খোঁজে যাচ্ছি?'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'দানবীয় নয়, তবে জলচর তো বটেই।'—এই বলে তিনি তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে তার ভাঁজ খুলে সেটা সুদীপ্তর হাতে দিলেন। 'হারবার নিউজ' নামে একটা ইংরেজি কাগজের একটি অংশের প্রতিলিপি সেটা। সংবাদপত্রের তারিখ ঠিক এক বছর আগের। সুদীপ্ত পড়তে শুরু করল কাগজটা—

মারমেড দর্শন! মৃত্যু নাবিকের।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেপটাউন বন্দর তিমি শিকারের কাজ শেষ না করেই নাবিকের মৃতদেহ নিয়ে বন্দরে ফিরে এল সিগাল নামের জাহাজ। তিমি শিকারের এই জাহাজ ভারত মহাসাগরের মারিয়ান দ্বীপে নোঙর করেছিল তিমি ও সিল শিকারের জন্য। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক, সিগাল জাহাজের নাবিক গার্থের মৃতদেহ ফিরিয়ে এনেছে জাহাজ। নাবিকের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর ব্যাপার জানিয়েছেন জাহাজের ক্যাপ্টেন হ্যামার। ১২ ডিসেম্বর তারিখে ডেকে রাতপাহারার দায়িত্বে ছিল বৃদ্ধ নাবিক গার্থ। সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে নিজেদের কেবিনে ঘুমোতে গেছিলেন ক্যাপ্টেন সহ অন্যরা। মাঝরাতে গার্থের আতঙ্কিত চিৎকারে ঘুম ভেঙে ডেকে উঠে আসেন সবাই। তাঁরা দেখেন চন্দ্রালোকে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে গার্থ। ক্যাপ্টেন তাকে আতঙ্কের কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে কোনোমতে জানায়, তীরের কাছে জলের ভিতর থেকে মাথা তোলা একটা বরফ মোড়া পাথরের ওপরে সে একজন মৎস্যকন্যাকে বসে থাকতে দেখেছে। চাঁদের আলোতে সেই মৎস্যকন্যা নাকি হাত নেড়ে জলে নামার জন্য ডাকছিল তাকে। ক্যাপ্টেন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তার দৃষ্টিবিভ্রম। অনেক সময় সিলেরা জল থেকে পাথরের ওপর উঠে বসলে তাকে মানুষের মতো দেখতে লাগে। তেমনই কোনো কিছু দেখেছে নাবিক। কিন্তু নাবিক দৃঢ়ভাবে জানায় সে একজন মারমেডকেই দেখেছে। তার দেহের ওপরের অংশ মানবীর মতো, আর কোমরের নীচের অংশ মাছের মতো আঁশে ঢাকা পাখনাযুক্ত। যুগ যুগ ধরে মারমেড বা মৎস্যকন্যা নিয়ে নানা কুসংস্কার প্রচলিত আছে নাবিকদের মধ্যে। এই মৎস্যকন্যারা নাকি সুরের টানে নাবিককে ডুবিয়ে মারে সমুদ্রের জলে। মারমেডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে জাহাজ তাকে অনুসরণ করে, তাকেও কৌশলে ডুবোপাহাড়ে বা সমুদ্রস্রোতে ফেলে ডুবিয়ে দেয়। অনেক নাবিক মনে করে মারমেড দর্শন মানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গার্থ নামের এই নাবিকের মনেও সম্ভবত এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। কারণ, ক্যাপ্টেন তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে একসময় আতঙ্কে জ্ঞান হারায়। এবং ভোরের আলো ফোটার আগেই সে অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে। জাহাজের ক্যাপ্টেন হ্যামার ও সিগালের অন্য নাবিকদের জেরা করে গার্থের মৃত্যু সম্বন্ধে অন্য কোনো তথ্য পায়নি বন্দর কর্তৃপক্ষ। ময়নাতদন্তের পর নাবিক গার্থের মৃতদেহ কেপটাউনের ব্রিটিশ দূতাবাসের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। মারমেড দর্শনে বৃদ্ধ নাবিকের মৃত্যু হোক বা না হোক, এ ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বন্দর অঞ্চলে, বিশেষত স্বল্পশিক্ষিত নাবিকদের মধ্যে। যে কারণে ‘সি হক’ নামে অন্য একটি জাহাজের ওই অঞ্চলে যাত্রা বাতিল হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওই মারিয়ান দ্বীপের কাছেই বছর দশেক আগে আলেকজান্ডার নামের সিল-শিকারি জাহাজের এক নাবিক মৎস্যকন্যা দেখার দাবি করেছিলেন। ওই মারিয়ান দ্বীপেই কি তবে মৎস্যকন্যাদের বাস?

কাগজটা পড়ে সুদীপ্ত বলল, ‘এবার বোধগম্য হল ব্যাপারটা। আমরা চলেছি মৎস্যকন্যার খোঁজে!’

হেরম্যান হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, ঠিক তাই। মৎস্যকন্যার খোঁজেই এ জাহাজে উঠে বসেছি আমরা।’

।।২।।

‘তাহলে আপনারাও মৎস্যকন্যার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন!’—নারীকণ্ঠের শব্দ শুনে সুদীপ্ত কাগজটা থেকে মুখ তুলে দেখল, তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক মহিলা। বয়স মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। পরনে শার্ট-ট্রাউজার, গায়ের রং ইওরোপীয়দের মতো ফর্সা। কোমর পর্যন্ত নেমে আসা সোনালি চুল আর নীল চোখের মহিলার চোখে-মুখে বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব আছে। হেরম্যান সুদীপ্তর সঙ্গে ভদ্রমহিলার পরিচয় করিয়ে দিলেন, ‘ইনিই মিস ক্যাথলিন। সেই স্কটিশ ভদ্রমহিলা।’

আরও একটা চেয়ার আনা হল। ক্যাথলিন বসল সেখানে। তারপর মুক্তোর মতো ঝকঝকে হেসে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রশ্নটা করল, ‘আপনারা বিশ্বাস করেন যে মৎস্যকন্যা বলে কিছু আছে?’

হেরম্যান হেসে জবাব দিলেন, ‘মৎস্যকন্যা বা মারমেডের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে এখনও প্রমাণিত না হলেও তা থাকতেও তো পারে। আমাদের চেনা পৃথিবীর বাইরে আমরা কতটুকুই বা জানি? এই মহাবিশ্ব তো এক অসম্ভবের দুনিয়া। কত রহস্যই যে এর আনাচেকানাচে লুকিয়ে আছে! আর আমরা দুজন তার সন্ধানেই ঘুরে বেড়াই!’

‘তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াই মানে?’ জানতে চাইল ক্যাথলিন।

সুদীপ্ত জবাব দিল, ‘ক্রিপটিভ খুঁজে বেড়াই আমরা। হেরম্যান হলেন ‘ক্রিপ্টোজুলজিস্ট’। —এ শব্দের অর্থ জানেন?’

ক্যাথলিন তাদের এ পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ভাবে বলল, ‘হ্যাঁ, জানব না কেন? ‘ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা রূপকথা, লোককথা বা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রাণী খোঁজেন, যেমন হিমালয়ের ইয়েতি, ড্রাগন বা ডায়ানোসর। ঠিক বললাম?’

সুদীপ্ত হেসে বলল, ‘হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছেন।’

হেরম্যান বললেন, ‘আমরা মৎস্যকন্যার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কি না, করলে কেন করি আপনি জানতে চাইছেন তো? তাহলে এ ব্যাপারে কিছু কথা বলি আপনাকে।’

সূর্য ডুবতে চলেছে সমুদ্রের বুকে। জল কেটে গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। মৃদু চুপ করে থেকে হেরম্যান বলতে শুরু করলেন, ‘দেখুন, মারমেড বা মৎস্যকন্যার কাহিনি বহু প্রাচীন। পুরাণ, কিংবদন্তিতেও এর উল্লেখ আছে। শুধু একটা দেশে নয়, গ্রিক, ভারতীয়, স্কটিশ, আইরিশ, আফ্রিকান, নানা দেশের প্রাচীন রচনাতে। যেমন তার একটা উদাহরণ হল গ্রিক মহাকবি হোমারের লেখা ‘ওডিসি’। হাজার হাজার বছরের নৌ অভিযানের ইতিহাসেও নানাসময় মারমেড বা মৎস্যকন্যার কথা উঠে এসেছে। এর মধ্যে কিছু প্রামাণ্য বক্তব্যও আছে। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের লগবুক থেকে জানা যায়, তিনি যখন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করছিলেন, তখন এক নির্জন দ্বীপের সমুদ্রতটে এক অর্ধমানবী-অর্ধমৎস্যকে একটা পাথরের ওপর বসে থাকতে দেখেছিলেন। তাঁর মতো বহু নাবিকই মৎস্যকন্যা দেখার কথা দাবি করেন। এমন কি আধুনিক পৃথিবীতেও নানাসময় এ দাবি উঠে এসেছে। আঠেরোশো নববই সালে আপনার স্কটল্যান্ডের সমুদ্রতটেই বহু মানুষ একসঙ্গে মৎস্যকন্যা দেখার দাবি করেছিলেন। তার কিছুকাল আগে স্কটল্যান্ডেরই এন্টাকুলা আইল্যান্ডে শ্যাওলা সংগ্রহ করতে গিয়ে ধীবররা মৎস্যকন্যা দেখেছিলেন বলে দাবি জানান। হাল আমলে মাত্র বছরখানেক আগে অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতটে এক ফটোগ্রাফার দূর থেকে একজনের ছবি তুলেছিলেন। যাকে অর্ধমানবী-অর্ধমৎস্য বলেই মনে হয়। যারা সারা পৃথিবীর সামনে পশুপাখি-জীব জগতের জীবননাট্য তুলে ধরে টেলিভিশনের মাধ্যমে, সেই বিখ্যাত ‘অ্যানিম্যাল প্লানেট’ সম্প্রতি

একটা টিভি শো সম্প্রচারিত করেছে মৎস্যকন্যা নিয়ে। তাতে তারা বলেছে, মৎস্যকন্যার ব্যাপারে তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ না থাকলেও এখনই তারা ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে রাজি নয়। আর এর পিছনে প্রধান কারণ হল মৎস্যকন্যা সম্পর্কে এতদিন ধরে চলে আসা বহু মানুষের দাবি। তাঁদের সবারই কি দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল? সবাই কি মিথ্যা বলেছেন? যার কথা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে, শুধু কুসংস্কারগ্রস্ত জাহাজি মাল্লারাই নয়, হোমার, শেক্সপিয়র থেকে কলম্বাস যার কথা লিখেছেন, তার সবটাই কি কল্পনা?

এবার নিশ্চয়ই আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেলেন?' একটানা কথাগুলো বলে থামলেন হেরম্যান।

ক্যাথলিনের মুখমণ্ডলে স্পষ্ট একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে। সে বলল, 'এ ব্যাপারে এত কথা আমার জানা ছিল না। আমি এতদিন জানতাম মৎস্যকন্যার ব্যাপারটা নিছকই অশিক্ষিত মাল্লাদের গালগল্প। এর সঙ্গে যে কলম্বাসের মতো মানুষেরও নাম জড়িয়ে আছে, তা জানতাম না। ক্যাপ্টেন হ্যামার আমার কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছিলেন আপনি পশুপাখি নিয়ে গবেষণা করেন বলে। আমি ভেবেছিলাম আপনারা ও অঞ্চলে যাচ্ছেন সিল, পেঙ্গুইন এসব দেখবেন বলে। ঠিক যেমন আমি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে যাচ্ছি ওখানে।'

ক্যাপ্টেন হ্যামারের নাম নিতে না নিতেই একটা চেয়ার নিয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। ক্যাথলিন এরপর হেরম্যানকে প্রশ্ন করল, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে কি মৎস্যকন্যার দেখা মেলার সম্ভাবনা আছে? এর আগে কেউ দেখেছিলেন?'

হেরম্যান, ক্যাপ্টেন হ্যামারের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'গত বছর ওই মারিয়ান দ্বীপে ও জাহাজেরই এক বৃদ্ধ নাবিক মৎস্যকন্যা দেখেছেন বলে দাবি করেছিলেন। ওই একই জায়গাতে বছর দশেক আগে অন্য এক জাহাজের নাবিকও নাকি মৎস্যকন্যা দেখতে পান। একই জায়গাতে দুবার মৎস্যকন্যা দেখার দাবি করা হয়েছে।'

হেরম্যানের কথা শুনে ক্যাথলিন ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও কি মৎস্যকন্যার ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন?'

ক্যাপ্টেন হ্যামার একটা কড়া জাহাজি চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমার যখন দাড়ি-গোঁফ গজায়নি তখন থেকে আমি সমুদ্রে ভাসতে শুরু করেছি। জাহাজিদের দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রে একঘেয়ে জীবন কাটাতে হয়। গল্পগুজবই হয়ে ওঠে তাদের মনোরঞ্জনের একমাত্র বিষয়। অনেক সময় মাল্লারা গল্প বানিয়ে সঙ্গীদের কাছে তা সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করে। নিরক্ষর, অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত মাল্লারা অনেকসময় বিশ্বাসও করে সেসব কথা। তবে আমি কিন্তু সে দলের নই। কিশোর বয়স থেকে যেমন হাতে-কলমে সমুদ্র অভিযানে বেরিয়েছি, তেমনই পড়াশোনাও করেছি। কেপটাউন মেরিন ইউনিভার্সিটি থেকে নৌবিদ্যা সম্বন্ধে ডিগ্রিও আছে আমার। আর তার নিরিখে আমি বলতে পারি, মৎস্যকন্যার ব্যাপারটা আমার মতে নিছকই গল্পগাথা। আমার জাহাজের যে বুড়ো নাবিক গত শীতে মারিয়ান দ্বীপে মৎস্যকন্যা দেখে আতঙ্কে মারা পড়েছিল, সেটা নিছকই পাথরের ওপর বসা একটা সিল ছিল বলেই আমার ধারণা। বুড়োটা নেশা করেছিল। সে কোনোভাবে কোনোদিন মৎস্যকন্যার গল্প শুনে থাকবে। একটা সিল বা সিন্ধুঘোটক, মৎস্যকন্যা হিসাবে ধরা দিয়েছিল তার চোখে। হেরম্যান, আপনি আমাকে টাকা দিয়েছেন, তাই আমি আপনাকে সঙ্গী করেছি। আপনি মৎস্যকন্যার সন্ধান পাবেন, এ ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই। হ্যাঁ, একজন পাকা নাবিক হয়েও আমি এ কথা আপনাদের বলছি।'

এরপর একটু থেমে চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'তবে একটা কথা —আমি এসব গালগল্পে বিশ্বাস না করলেও আমার জাহাজের নিগ্রো নাবিকরা কিন্তু এসব ব্যাপারে অল্পবিস্তর বিশ্বাসী। জানেনই তো, অনেকে মনে করে যে মৎস্যকন্যা দর্শন ঘোর অমঙ্গলের প্রতীক। কাজেই ওদের সামনে এ ব্যাপার নিয়ে কোনো আলোচনা করবেন না। মোটা অর্থের বিনিময়ে এদের রাজি করে জাহাজে তুলেছি। গতবার মাঝপথে ফিরে যাবার ফলে আমার প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল। সেটা এবার পুষিয়ে নিতে হবে।'

হেরম্যান বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, এ ব্যাপারে ওদের সামনে কোনো আলোচনা হবে না।'

ক্যাথলিনও বলল, 'আমার দিক থেকেও এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেন আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

ক্যাপ্টেন হ্যামার বললেন, 'ধন্যবাদ। তবে আপনাদের নিয়ে আমার একটা ভয়ের কারণ আছে। বিশেষত মিস ক্যাথলিনকে নিয়ে।'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু বিস্মিত ভাবে সুদীপ্ত আর ক্যাথলিন একসঙ্গে বলে উঠল, 'ভয়ের কি কারণ?'

ক্যাপ্টেন হ্যামার মৃদু চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখুন, তিমি শিকার, সিল শিকার আমার পেশা। আমার ও বহু মানুষের পেট চলে এই শিকারে। বিরাট বিরাট তিমি বা সিলকে লক্ষ্য করে হারপুন ছুটে যায়। রক্তে লাল হয়ে ওঠে সমুদ্রের জল। বড় প্রাণী তো, প্রচুর রক্ত থাকে ওদের দেহে। হারপুন গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে ওরা মরে না। খাবি খায়, বেশ অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করে, নিষ্ফল চেষ্টা করে বাঁচার জন্য। আপনারা পশুপ্রেমী, প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। সেসব দৃশ্য আপনারা সহ্য করতে পারবেন তো? আমি যখন কিশোর বয়সে প্রথম তিমি শিকারের জাহাজে উঠি, তখন তিমি হত্যার দৃশ্য দেখে বেশ কয়েক রাত ঘুমাতে পারিনি। কলের হারপুন নয়, বেশ কয়েকজন শিকারি মিলে হাতে ছোড়া হারপুন দিয়ে শিকার করেছিল বিশাল একটা তিমি। তার রক্তে লাল হয়ে গেছিল আমাদের জাহাজের চারপাশ। দৃশ্যটা এখনও আমার চোখে ভাসে। তবে সেদিন ভয় পেলেও পেটের তাগিদে ভবিষ্যতে তিমি শিকারকেই পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম আমি।'— এই বলে মৃদু হাসলেন ক্যাপ্টেন হ্যামার।

কথাটা শুনে মিস ক্যাথলিন বলল, 'হ্যাঁ, খারাপ আমার লাগবে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছু করার তো নেই। আমি তো এটা শিকারি জাহাজ জেনেই আপনাদের সঙ্গী হয়েছি। বলা যেতে পারে বাধ্য হয়েই হয়েছি। কারণ, অন্য কোনো জাহাজ ওই মারিয়ান দ্বীপের ওখানে যায় না। যদি যেত তবে সে জাহাজেই যেতাম।'

ক্যাপ্টেন হ্যামার হাসলেন ক্যাথলিনের কথা শুনে।

হেরম্যান এবার ক্যাথলিনকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তো স্কটল্যান্ডে থাকেন, এ জাহাজ যে মারিয়ান দ্বীপের ওদিকে যাচ্ছে তা জানলেন কীভাবে?'

ক্যাথলিন হেসে বলল, 'সম্ভবত আপনি যেভাবে জেনেছেন সেভাবেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে। জাহাজ ছাড়ার পঁয়তাল্লিশ দিন আগে নিয়মমাফিক বন্দর কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁদের গেজেট প্রকাশ করেছিলেন ইন্টারনেটেও। তাই দেখে আমি যোগাযোগ করি ক্যাপ্টেন হ্যামারের সঙ্গে।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও অনেকটা এভাবেই খবরটা পাই। মিস ক্যাথলিন, আপনার কর্মপদ্ধতিটা কী ধরনের?'

ক্যাথলিন জবাব দিল, 'বিশেষ জটিল কিছু নয়, দ্বীপটা ঘুরে দেখব। ওখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে নোট নেব, ছবি তুলব। আপনারা?'

হেরম্যান বললেন, 'আমরাও দ্বীপের চারপাশটা, বিশেষত সমুদ্রতটটা ঘুরে দেখার চেষ্টা করব। দেখি যদি মৎস্যকন্যার কোনো সন্ধান করতে পারি।'

হ্যামার বললেন, 'একটা কথা জানিয়ে রাখি। জাহাজ কিন্তু দ্বীপ থেকে কিছুটা তফাতেই থাকবে। নাব্যতা কম ও বরফ থাকায় তটে ভেড়া যাবে না। আপনাদের নৌকা নিয়ে দ্বীপে যেতে হবে। আমার কোনো লোকও কিন্তু আপনাদের সঙ্গী হবে না। আর জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে নামার পর কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় একান্তভাবেই আপনাদের ওপর বর্তাবে।'

হেরম্যান কথাটা শুনে ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অচেনা পরিবেশে কীভাবে চলতে হয় সে শিক্ষা আমাদের আছে। আফ্রিকার আদিম অরণ্য থেকে নিষ্প্রাণ মরুভূমি, বরফ ঢাকা হিমালয় পর্বতাঞ্চল থেকে মুক্তো- সন্ধানী ডুবুরিদের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশ, সর্বত্রই আমরা দুজন ঘুরে বেড়িয়েছি নানা প্রাণীর খোঁজে। আর এসব অভিযানে বহুবার সাক্ষাৎ মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ হাসি হেসেছি আমরাই। যদি এবারের যাত্রাতে নিতান্তই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তার দায় আমাদের ওপরই বর্তাবে।'

মিস ক্যাথলিন বলল, 'আমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে আশা করি তেমন কিছু ঘটবে না। ওই দ্বীপ সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয় দ্বীপের পরিবেশ শান্তই। যে কারণে সিল, সিন্ধুঘোটক, পেঙ্গুইনের দল বাসা বাঁধে ওখানে। মাংসাশী প্রাণী বলতে ছোটো শিয়াল আছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সোসাইটির একটা দল ওখানে গেছিল। তাদের রিপোর্ট পড়ে ব্যাপারটা জেনেছি।'

এ কথা বলে ক্যাথলিন হ্যামারকে প্রশ্ন করল, 'আপনি ও দ্বীপ ঘুরে দেখেছেন?'

ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, 'দ্বীপের বেলাভূমিতে নামলেও দ্বীপের ভিতর ঘুরে দেখার প্রয়োজন হয়নি। দ্বীপটা বিশাল। আসলে অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি। নানা খাঁড়ি চলে গেছে তার ভিতর দিয়ে। ছোটো ছোটো পাহাড়ও আছে ও দ্বীপে।'

কথা চলতে লাগল। একসময় সূর্য ডুবে গেল সমুদ্রের বুকে। অন্ধকার নামার পর ঠান্ডাও পড়তে শুরু করল। ডেক থেকে নেমে নিজেদের কেবিনে ফিরে গেল সুদীপ্তরা।

।।৩।।

সুদীপ্তরা এর আগে সমুদ্রযাত্রা করলেও জাহাজে চেপে এমন দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করেনি। বিভিন্ন বইতে সুদীপ্ত পড়েছিল যে সমুদ্রযাত্রা বড় একঘেয়ে। এবার সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল। সকালে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর থেকেই তেতে উঠতে শুরু করে ডেক। সূর্যালোক সমুদ্রের জলে এমন ভাবে প্রতিফলিত হয় যে সেদিকে তাকানো যায় না। চোখে পীড়া দেয়। দিকচিহ্নহীন সমুদ্র, চারপাশে শুধু জল আর জল। সারাদিন খোলের কেবিনের মধ্যেই কাটাতে হয় বিকেলের প্রতীক্ষাতে। দিনের মধ্যে ওই সময়টুকুই শুধু একটু আরামদায়ক। সুদীপ্তরা ডেক ছেড়ে ওপরে উঠে আসে। ক্যাথলিনও আসে। ক্যাপ্টেন

হ্যামারও কখনও কখনও কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এসে যোগ দেন তাদের সঙ্গে। নানা ধরনের গল্প, আলোচনা হয়। সেই সূত্র ধরে ক্যাথলিনের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে সুদীপ্তরা। ক্যাথলিনের জন্ম লন্ডনের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বাবা-মার একমাত্র সন্তান সে। যদিও সে একলাই থাকে। ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি-পরিবেশের ওপর তার খুব টান। ক্যাথলিনের পড়াশোনাও লন্ডনে। পরিবেশবিদ্যাতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছে ক্যাথলিন। বর্তমানে ভারত মহাসাগরে জনহীন দ্বীপগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে গবেষণা করছে সে। ঠাকুর্দার ব্যাংকে রেখে যাওয়া কিছু অর্থ আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত স্কলারশিপের টাকাতেই তার দিন চলে। সুদীপ্ত আর হেরম্যান তাদের অভিযানের বেশ কিছু গল্প শুনিয়েছে ক্যাথলিনকে। সেসব শুনে ক্যাথলিন তো একদিন বলেই ফেলল, 'এই ক্রিপ্টোজুলজি ব্যাপারটা এত ইন্টারেস্টিং আর রোমাঞ্চকর বিষয় তা আগে জানা ছিল না। থাকলে এ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতাম।'

তার কথা শুনে হেরম্যান হেসে বললেন, 'তা করতে পারতেন ঠিকই, তবে এ কাজের জন্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পাওয়া যায় না। বরং ব্যঙ্গবিদ্রুপই জোটে। অথচ ইন্দোনেশিয়ার কোমোডো ড্রাগন থেকে শুরু করে সমুদ্রতলে বাস করা জায়েন্ট স্কুইডদের খুঁজে বের করেছেন কিন্তু ক্রিপ্টোজুলজিস্টরাই। যেসব প্রাণীকে একদিন তথাকথিত পণ্ডিতরা নিছক রূপকথার প্রাণী বলেই ভাবতেন। ঠিক যেভাবে তাঁরা মারমেড বা মৎস্যকন্যাকেও রূপকথার প্রাণী ভাবেন।'

ডেকে বসে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য এই বৈকালিক আড্ডা ছাড়া বাকি সময়টা বলতে গেলে বই পড়ে আর ঘুমিয়েই কাটাতে হল সুদীপ্তদের। একটা জিনিস খেয়াল করল সুদীপ্তরা। একটা একটা করে দিন যত এগোচ্ছে, ঠান্ডা যেন তত বাড়ছে। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। খোলের ভিতরেও ঠান্ডা নামছে। মোটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুতে হচ্ছে সুদীপ্তদের।

সপ্তম দিন বিকালে ডেকে উঠে নাবিকদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য লক্ষ করল সুদীপ্তরা। বিরাট বিরাট বেশ কয়েকটা ধাতব চৌবাচ্চা বা বাথটবের মতো পাত্র খোলের ভিতর থেকে তুলে এনে ডেকে রাখা হয়েছে। আর রাখা হয়েছে বেশ কিছু কাঠের পিপে আর মুখ বন্ধ করা টিনের ড্রাম। ড্রামগুলোর গায়ের লেবেল দেখে বোঝা গেল তার ভিতরের রাসায়নিক দিয়ে শিকার করা মাছ সংরক্ষণ করা হবে। হারপুন ছোড়ার কামানটার কাছে বেশ কিছু নাবিক দাঁড়িয়ে ছিল। আর তার কাছিটা যে লোহার স্তম্ভের গায়ে জড়ানো, সেটা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করছিলেন ক্যাপ্টেন হ্যামার। সুদীপ্তরা বুঝতে পারল ওই দণ্ডায়মান স্তম্ভটা একটা লাটাইয়ের মতো। ক্যাথলিনও সুদীপ্তদের সঙ্গেই ডেকে উঠে এসেছিল। তারা তিনজন হ্যামারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হ্যামার হেসে বললেন, 'কাল সকাল নাগাদ আমরা মারিয়ান দ্বীপে পৌঁছে যাব। দেখছেন বাতাস কেমন ঠান্ডা হয়ে এসেছে! যন্ত্রপাতিগুলো সব আর-একবার পরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য হারপুন ছোড়া হবে এখন। এর ওপরই আমাদের সব কিছু নির্ভর করছে।'—এ কথা বলে সুদীপ্তদের নিয়ে হারপুন ছোড়ার কামানটার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। কামানটার সামনেই মাটিতে নামানো আছে বেশ অনেক ক-টা হারপুন। দশ ফিট মতো লম্বা সরু অথচ মজবুত স্টিলের তৈরি দণ্ড। তার সামনের অংশটা অনেকটা দেখতে তিরের ফলার মতো। দুপাশে খাঁজ আছে। ঝকঝকে ধারালো ফলাটা শিকারের গায়ে বিদ্ধ হবার পর পিছনে যাতে বেরিয়ে না আসে, তার জন্য অমন খাঁজ। লৌহদণ্ডের শেষ মাথায় কাছি বা দড়ি পরাবার জন্য ছিদ্রও আছে। সুদীপ্তরা হারপুন ছোড়ার প্রস্তুতি দেখতে লাগল। হারপুন কামানের ঠিক পিছনে একটা লোহার ছোট খাঁচা আছে, যে হারপুন ছুড়বে

তার বসার জন্য। সেই খাঁচায় বসে একজন শিকারি কামানটাকে গিয়ারের মতো লিভারের সাহায্যে নববই ডিগ্রি কোণে এপাশ-ওপাশে ঘোরাতে লাগল সমুদ্রের দিকে নল তাক করে। এরপর একটা হারপুন তুলে তার পিছনে কাছি পরানো হল। তারপর সেটাকে ঠেসে দেওয়া হল কামানের মুখে। হেরম্যান, সুদীপ্তকে বললেন, 'কামানের ভিতরে সম্ভবত শক্তিশালী ধাতব স্প্রিং ধরনের কিছু আছে। যা হারপুনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। নলের গায়ে পিছনের দিকে যে লিভারের মতো অংশ দেখছ, সম্ভবত ওটাই হল ট্রিগার।' কামানে হারপুন ভরা হয়ে গেলে ক্যাপ্টেন একজনকে জাহাজের ইঞ্জিন বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে সুদীপ্তদের বললেন, 'আপনারা ডেকের ওপর আঁকা ওই লাল দাগটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ান। হারপুন যখন ছোড়া হবে, এখন হোক বা মাছ শিকারের সময়, কখনও ওই লাল দাগ অতিক্রম করে এগিয়ে আসবেন না। দড়ি যখন হারপুনের সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে সমুদ্রের দিকে ছুটে যায়, তখন দড়িতে পা পড়লে হয় সমুদ্রেতে ছিটকে পড়বেন অথবা দড়ির চাপে মাংসের দলা হয়ে যাবেন নিমেষের মধ্যে। তিমি বা সিল শিকারের জাহাজে অসতর্কতার কারণে হারপুনের দড়িতে বহু নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন। শিকারের সময় আপনারা যদি ডেকে থাকেন তখন আমরা এমন ব্যস্ত থাকব যে আপনাদের ওপর নজর রাখতে পারব না। তাই আগাম সতর্ক করে দিলাম।'

ক্যাপ্টেনের সতর্কবাণী মেনে সেই লাল দাগ অতিক্রম করে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়াল ওরা তিনজন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ থেমে গেল। সমুদ্রের ঢেউয়ে শুধু মৃদু দুলতে থাকল জাহাজটা। এবার হারপুন পরীক্ষা করা হবে। হারপুন চালকের পাশ থেকে ক্যাপ্টেন আর অন্য নাবিকরাও বেশ খানিকটা তফাতে দড়ির উল্টোদিকে সরে গেল। একজন নাবিক এরপর একটা কাঠের ফাঁকা পিপে ছুড়ে ফেলল জলে। মন্থর গতিতে ভাসতে ভাসতে সেই পিপেটা জাহাজ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। কামানের পিছনে যে হারপুন থ্রোয়ার বসে আছে, সে নলটাকে এবার ঘোরাতে শুরু করল ভাসমান পিপেটাকে লক্ষ্য করে। পিপেটা তখন বেশ অনেকটা দূরে চলে গেছে। ক্যাপ্টেন হ্যামার চিৎকার করে উঠলেন, 'চার্জ।'

একটা ধাতব শব্দ হল। সুদীপ্তরা দেখল হারপুনটা বিদ্যুৎগতিতে দড়িসমেত ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। অব্যর্থ নিশানায় হারপুনটা গিয়ে আঘাত হানল পিপেটার গায়ে। তার গায়ের কাঠগুলো চুরমার হয়ে জলের সঙ্গে ছিটকে উঠল আকাশের দিকে। অকল্পনীয় ওই নিশানা! চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। ব্যাপারটা দেখে আনন্দে বিস্ময়ে তালি দিয়ে উঠল ক্যাথলিন। সম্ভবত সেই শব্দ কানে যেতেই হারপুনচালক তার আসন ছেড়ে উঠে সুদীপ্তদের দিকে তাকিয়ে হাসল। মাঝবয়সি লোকটা জাতিতে সম্ভবত একজন আফ্রিকান। গায়ের রং কালো হলেও দাড়ি- গোঁফ, মাথার চুল লালচে ধরনের। অর্থাৎ লোকটার শরীরে সাদা চামড়ার লোকের রক্তও আছে।

একজন মাল্লা এরপর যে লৌহদণ্ডের গায়ে দড়িটা জড়ানো ছিল তার গায়ে নীচের দিকে একটা হাতল টানল। লাটাইয়ের মতো ঘুরতে শুরু করল দণ্ডটা। গুটাতে শুরু করল কাছি। হারপুনটা আবার ফিরে আসতে লাগল জাহাজের দিকে।

পরীক্ষা শেষ। ক্যাপ্টেন হ্যামার এসে দাঁড়ালেন। সুদীপ্তদের উদ্দেশে তিনি হেসে বললেন, 'কি, কেমন দেখলেন?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'দারুণ লক্ষ্যভেদ।'

হ্যামার বললেন, ‘ওর নাম মরগ্যান স্মিথ। লোকে ডাকে ‘হারপুন স্মিথ’ নামে। অসাধারণ শিকারি। বলতে গেলে এ জাহাজের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লোক। যেখানে বরফের জন্য জাহাজ এগোতে পারে না, সেখানে ছোট নৌকা নিয়ে হাত দিয়ে হারপুন ছুড়েও শিকার করতে পারে ও। আগেকার দিনে যেভাবে শিকার করা হত সেভাবে।’

হেরম্যান বললেন, ‘কাল থেকেই কি শিকারের কাজ শুরু করবেন?’

ক্যাপ্টেন বললেন, ‘তেমনই পরিকল্পনা আছে। আমরা শিকারের কাজ করব। আর আপনারা বোটে করে দ্বীপে যাবেন। বিকালে আবার জাহাজে ফিরে আসবেন। মাইল তিনেক জায়গা জুড়ে সারাদিন চক্কর কাটবে জাহাজটা। তবে প্রতিদিন রাত্রিবাসের জন্য একই জায়গাতে নোঙর করা থাকবে।’

হেরম্যান জানতে চাইলেন, ‘গতবার যে জায়গাতে আপনার নাবিক সেই মৎস্যকন্যাকে দেখেছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই জাহাজ নোঙর করবে কি?’

একটু ভেবে নিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, ‘আচ্ছা তাই হবে।’—এ কথা বলে ক্যাপ্টেন তাঁর কেবিনের দিকে এগোলেন। জাহাজের ইঞ্জিন আবার চালু হয়ে গেল। জল কেটে এগোচ্ছে জাহাজ। সূর্য ডুবতে চলেছে সমুদ্রের বুকে। বাতাস যেন আরও ভারী আর ঠান্ডা হয়ে আসছে। রেলিং-এর গায়েই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। ক্যাথলিন হঠাৎ জলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আরে ওই দেখুন!’

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদীপ্তরা জলের দিকে তাকিয়ে দেখল ছোট ছোট বরফের টুকরো জলে ভাসছে! তুষারসমুদ্রের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে গেছে তারা!

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নেমে এল সমুদ্রেতে। সুদীপ্তরা পা বাড়াল খোলে নামার জন্য।

।।৪।।

পরদিন ভোরে এক অদ্ভুত ঘসঘস শব্দে ঘুম ভাঙল সুদীপ্তদের। পোর্ট হোল দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সব কিছু যেন সাদা মনে হল। বাইরেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পোর্ট হোলের কাচে যেন তুষার জমে আছে। শীতের পোশাক পরে তৈরি হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই খোল ছেড়ে ডেকে উঠে এল তারা। কনকনে ঠান্ডা ডেকে। চারদিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছে দুজন, কিন্তু এমন জায়গাতে তারা কোনোদিন আসেনি। এ এক বরফের দেশ। চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ! বরফের চাদরে মোড়া সমুদ্র। পাতলা চাদরের মতো বরফ তো আছেই, আবার কোথাও ভেসে চলেছে জাহাজের চেয়েও উঁচু হিমশৈল বা আইসবার্গ! সূর্যের আলো সেই আইসবার্গে বিচ্ছুরিত হয়ে বর্ণালির সৃষ্টি করেছে! অপূর্ব দৃশ্য! কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাথলিনও ডেকে উঠে সুদীপ্তদের পাশে এসে দাঁড়াল। বিমোহিত হয়ে সেও তাকিয়ে রইল এই অচেনা পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে।

খুব ধীর গতিতে জাহাজটা এগোচ্ছে সামনের বরফের চাদর কাটতে কাটতে। ড্রেজার বসানো আছে জাহাজের সামনের অংশের তলদেশে। খসখস ঘসঘস শব্দটা ওই ড্রেজারের বরফ সরানোর শব্দ। জাহাজের মাল্লারা ডেকের এককোণে রেলিংয়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে সেই হারপুন স্মিথও আছে।

দুপাশে বিরাট দুটো আইসবার্গের মধ্যে দিয়ে পথ ধরল তিমি-শিকারি জাহাজটা। পাহাড়ের মতো হিমশৈল দুটো জাহাজের প্রায় গা ঘেঁষে ভাসছে। যেন ডেকের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেই তাদের ছোঁয়া যায়! হুড়মুড় করে যেন ডেকের ওপর তারা যে-কোনো সময় ভেঙেও পড়তে পারে। খুব ধীরে আর সন্তর্পণে জাহাজটা অতিক্রম করল সেই হিমশৈল দুটোর মধ্যবর্তী পথ। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন হ্যামার এসে দাঁড়ালেন সুদীপ্তদের কাছে। সুদীপ্তদের প্রভাতী সম্ভাষণ জানাবার পর যেদিকে জাহাজ এগোচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘আমরা প্রায় এসে গেছি। ওই দেখুন মারিয়ান দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। আর মাত্র ঘণ্টা দুই সময় লাগবে।’

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদীপ্তরা দেখল দূরে একটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে।

এগোতে থাকল জাহাজ। ক্রমশ বাড়তে লাগল সেই কালো বিন্দুর আকার। বিন্দু থেকে সেটা ক্রমশ চওড়া হয়ে উঠতে লাগল দুপাশে বিস্তৃত কালো দাগের মতো। এক ঘণ্টা পর দ্বীপটা মোটামুটি ভেসে উঠল সুদীপ্তদের চোখে। বিশাল এক দ্বীপ।

জাহাজ যত দ্বীপের দিকে এগোতে লাগল ততই যেন উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল নাবিকদের মুখে। সুদীপ্তরাও বেশ উত্তেজিত। চারপাশে বরফের চাদর মোড়া। আর তা গিয়ে মিশেছে দ্বীপে। হঠাৎ একজন মাল্লা সমুদ্রের দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যামারকে কী যেন বলল। হ্যামারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি সুদীপ্তদের সে জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, ‘ওই দেখুন।’

বরফের চাদরের মাঝখানে একটা ফাটলের ভিতর থেকে ফোয়ারার মতো জল ছিটকোচ্ছে আকাশের দিকে! হেরম্যান তা দেখে জানতে চাইলেন, ‘কী ওটা?’

ক্যাপ্টেন হেসে জবাব দিলেন, ‘ওখানে জলের নীচে তিমি আছে। সে-ই জল ছেটাচ্ছে। যত এগোব তত এ দৃশ্য দেখতে পাবেন। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আশা করি শিকারের অভাব হবে না।’

হ্যামারের কথা সত্যি প্রমাণিত হল। বরফের চাদরের আড়াল থেকে মাঝে মাঝেই ফোয়ারার মতো জল ছিটকানোর দৃশ্য চোখে পড়তে লাগল তাদের।

বেলা দশটা নাগাদ নির্দিষ্ট স্থানে দ্বীপের কাছে পৌঁছে জাহাজ থেমে গেল। দ্বীপটা তখন সুদীপ্তদের সামনে স্পষ্ট। ছোটখাটো পাহাড় সম্মিলিত দ্বীপটা ঢালু হয়ে এসে মিশেছে বরফমোড়া সমুদ্রের সঙ্গে। কিছু পাথুরে খাঁড়িও নেমে এসেছে সমুদ্রের অনেক ভিতর পর্যন্ত। জাহাজটা যেখানে থামল তার আশেপাশেও বরফমোড়া ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড উঁকি দিচ্ছে সমুদ্রের ভেতর থেকে। এরই কোনো একটার ওপর হয়তো চাঁদের আলোতে মৎস্যকন্যাকে বসে থাকতে দেখেছিল সেই বৃদ্ধ নাবিক। ক্যাপ্টেন হ্যামার সুদীপ্তদের উদ্দেশে বললেন, ‘জাহাজ আর এগোবে না। এই সেই জায়গা। দেখছেন কাছেপিঠে কত শিকার তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে!’

সত্যিই জাহাজটা যেখানে থেমেছে তার কাছে-দূরে নানা জায়গাতে সমুদ্রের মধ্য থেকে জলের ফোয়ারা উঠছে।

ক্যাপ্টেন এরপর হেরম্যানকে বললেন, ‘শুনুন, আমাদের একটা সংস্কার আছে। প্রথম প্রাণীটা শিকার না করা পর্যন্ত কাউকে নীচে জলে নামতে দেওয়া হয় না। সে কাজটা মিটলে আপনারা নৌকা নিয়ে দ্বীপে যাবেন।’

দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, ‘বেশ, তাই হবে।’

শিকারের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। মাল্লারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল হারপুন ঠিক করতে এবং আরও নানা কাজে। সেই লাল দাগের অন্যপাশে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তরা তিনজন দেখতে লাগল সব কিছু। একসময় শিকারিদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। জায়গাটার আনুমানিক একশো মিটার দূরে মাঝে মাঝে বেশ বড় ফোয়ারা উঠছে। সেদিকে তাক করা হল হারপুন কামান। এরপর হঠাৎই কয়েক মুহূর্তের জন্য ডেকটা যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মাল্লারা সব চেয়ে রইল ফোয়ারাটার দিকে। আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্তরাও। অত বড় জাহাজটাতে তখন একটা পিন পড়লেও যেন শব্দ শোনা যাবে।

লোহার খাঁচায় হারপুন তাক করে বসা সেই হারপুন স্মিথের উদ্দেশে ক্যাপ্টেন হ্যামার চিৎকার করে উঠলেন, 'চার্জ' বলে। ট্রিগার টানল শিকারি। একটা ধাতব শব্দ। উল্কার গতিতে হারপুন ছুটল তার লক্ষ্যে। দড়িসমেত হারপুনটা গিয়ে অদৃশ্য হল বরফের চাদরের ফাটলের মাঝে যেখান থেকে জলের ফোয়ারাটা উঠছিল ঠিক সে জায়গাতে। নাবিকরা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে। খুব বেশি হলে আধ মিনিট। সমুদ্রের সে অংশের জল লাল হতে শুরু করল। আর তারপরই বরফের চাদরের আড়াল থেকে ছটফট করতে করতে ভেসে উঠতে লাগল উল্টানো নৌকার মতো তিমির কালো পিঠ। আর সেটাকে দেখামাত্রই একসঙ্গে উল্লাসধ্বনি করে উঠল ডেকে দাঁড়ানো তিমি-শিকারিরা। সফল হয়েছে তাদের প্রথম শিকার কার্য। জলের ফোয়ারা নয়, রক্তের ফোয়ারা উঠছে হারপুনবিদ্ধ তিমির পিঠ থেকে। আর তা রাঙিয়ে দিচ্ছে তার আশেপাশের বরফের চাদরকে। আস্তে আস্তে পুরো তিমিটাই ভেসে উঠল। দূর থেকে সুদীপ্ত অনুমান করল আকারে অন্তত সেটা কুড়ি-পঁচিশ ফুট হবে। হেরম্যানের পাশে দাঁড়ানো ক্যাথলিন বলে উঠল, 'ও মাই গড! এত বড় প্রাণীটাকে ওরা মেরে ফেলল!' হেরম্যান মন্তব্য করলেন, 'কী আর করা যাবে! আমাদের চোখে খারাপ লাগলেও ওদের এটাই জীবিকা।' ক্যাপ্টেন হ্যামার এসে দাঁড়ালেন সুদীপ্তদের সামনে। তাঁর মুখে হাসি। তিনি বললেন, 'প্রথম তিমিটাকে যখন ঠিকভাবে শিকার করা গেল তখন বরাতটা ভালোই হবে মনে হচ্ছে। আশা করি গতবারের ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে পারব।'

হেরম্যান বললেন, 'কীভাবে অতবড় প্রাণীটাকে জাহাজে ওঠাবেন? এমন কতগুলো তিমি শিকার করবেন আপনারা?'

হ্যামার বললেন, 'নৌকা নিয়ে গিয়ে প্রথমে তিমিটাকে জাহাজের কাছে টেনে আনা হবে। তারপর ক্রেনে বেঁধে ডেকে তুলে করাত দিয়ে মাথা বাদ দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে মাংসগুলো বরফ আর রাসায়নিক দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। যতক্ষণ না খোল ভরবে ততক্ষণ শিকার চলবে। ছোট-বড় মিলিয়ে আনুমানিক চল্লিশটা তিমি শিকার করতে হবে। তিমি শিকারের কাজ যদি ভালোভাবে মেটে, তবে কয়েকটা সিন্ধুঘোটকও মারব ভাবছি। ওর চর্বি ওষুধ তৈরিতে লাগে। চড়া দামে বিক্রি হয়। ওদের মারার জন্য অবশ্য দ্বীপে যেতে হবে। দেখি কী করি! আর হ্যাঁ, আপনারা তো দ্বীপে যাচ্ছেন, সিন্ধুঘোটক থেকে একটু সাবধানে থাকবেন। পুরুষ সিন্ধুঘোটক অনেকসময় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। লেজের ঝাপটায় মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে তলোয়ারের ফলার মতো দাঁত বিঁধিয়ে দেয়। ওদের কারো কারো ওজন দু-টনও হয়।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কয়েকটা নৌকা নামানো হল জলে। তার একটাতে সুদীপ্তরা তিনজন রওনা হল দ্বীপের দিকে। আর দড়িদড়া নিয়ে অন্য নৌকাগুলো রওনা হল তিমিটাকে টেনে আনার জন্য। ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে বিশাল সেই প্রাণীটা। লাল জলের মধ্যে ভেসে আছে তার দেহ।

জলে কোনো স্রোত নেই। দাঁড় টানছেন হেরম্যান। সুদীপ্ত প্রয়োজনে একটা লগি দিয়ে ভাসমান বরফের টুকরোগুলো সরাতে লাগল। ক্যাথলিন চারপাশের ছবি তুলতে থাকল। এগিয়ে আসতে লাগল দ্বীপ। ক্যামেরায় চোখ রেখে একসময় ক্যাথলিন মৃদু বিস্মিত ভাবে বলল, 'দ্বীপে ওরা কারা? মানুষ নাকি?'

হ্যাঁ, একদল মানুষ যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে দ্বীপের তটে। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য স্পষ্ট হল আসল ব্যাপারটা। মানুষ নয়, পেঙ্গুইনের দল। দূর থেকে প্রায় মানুষের মতোই লাগছে তাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপের কাছে এসে ভিড়ল সুদীপ্তদের ছোট নৌকাটা। একটা পাথরের সঙ্গে নৌকাটা বেঁধে হাঁটুজল ভেঙে তারা তিনজন দ্বীপে উঠে এল।

চারপাশে পেঙ্গুইনের দল হেলতে- দুলতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চিৎকারে চারপাশ মুখরিত। বেশ কয়েকটা সিলও এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। পেঙ্গুইনের দঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল সুদীপ্তরা। কিছুটা এগিয়ে বিশালাকৃতির একটা সিন্ধুঘোটকও দেখতে পেল তারা। সুদীপ্তদের এই প্রথম জীবন্ত সিন্ধুঘোটক দর্শন। একটা পাথরের ওপর অলসভাবে শুয়ে আছে সিন্ধুঘোটকটা। গুম্ফাধারী প্রাণীটার তলোয়ারের ফলার মতো দাঁত দুটো অন্তত চার ফুট লম্বা হবে। ক্যাথলিন তার দিকে এগোল ছবি তোলার জন্য। হেরম্যান তাকে সাবধান করে বললেন, 'বেশি কাছে যাবেন না। ক্যাপ্টেন হ্যামারের কথাটা খেয়াল রাখবেন।' ক্যাথলিন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে ফিরে আসার পর সুদীপ্ত হেরম্যানকে বললেন, 'দ্বীপটা কীভাবে দেখবেন? কীভাবে অনুসন্ধান চালাব আমরা?'

হেরম্যান বললেন, 'দ্বীপটা বেশ বড়। আমার ধারণা এর পরিধি অন্তত দশ মাইল হবে। আপাতত প্রথমে দ্বীপের তটরেখা বরাবর অনুসন্ধান চালাব আমরা। আজ পর্যন্ত যাঁরা বিভিন্ন সময় মৎস্যকন্যা দেখার দাবি করেছেন, তার মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ বলেছেন বিভিন্ন দ্বীপের সমুদ্রতটেই তাঁরা বসে থাকতে দেখেছেন মৎস্যকন্যাদের। হয়তো বা এই সিল বা সিন্ধুঘোটকদের মতোই জল থেকে উঠে সমুদ্রতটে বসে রোদ পোহাতে ভালোবাসে মৎস্যকন্যারা।'

এ কথা বলার পর হেরম্যান ক্যাথলিনকে বললেন, 'আপনি কীভাবে কাজ শুরু করবেন?'

ক্যাথলিন জবাব দিল, 'আপনাদের আপত্তি না থাকলে আজ আমি আপনাদের সঙ্গেই ঘুরব। তটরেখাটা দেখা হয়ে যাবে। কাল থেকে অবশ্য কিছু যন্ত্রপাতি নেব প্রকৃতি বীক্ষণের জন্য।'

হেরম্যান বললেন, 'আমাদের আপত্তি নেই। চলুন তবে।'

তটরেখার পশ্চিম দিক বরাবর এগোল সুদীপ্তরা। দ্বীপটা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। টিলার মতো ছোট ছোট পাহাড় সম্মিলিত দ্বীপ। বাইরের দিকে গাছপালা বেশি নেই। পাহাড়ের ঢালে জায়গাতে জায়গাতে ছিট ছিট তুষার জমেছে। ঢালগুলো এসে মিশেছে সমুদ্রতটে। কোথাও আবার অনুচ্চ কোনো পাহাড়ের শিরা নেমে গেছে সমুদ্রেও। ছোট ছোট গুহাও আছে সেই শিরাগুলোর ভিতর। সমুদ্রর জল প্রবেশ করছে গুহায়। দ্বীপের তটরেখাটা ছোট-বড় কালচে পাথরে পরিপূর্ণ। পাহাড়গুলোও ওই পাথরেরই তৈরি। ক্যাথলিন বলল, 'এ দ্বীপটার নীচে সম্ভবত সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আছে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই একসময় এ দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। এ পাথরগুলো হল আগ্নেয় পাথর।' হেরম্যানও সহমত পোষণ করলেন তার সঙ্গে। কখনও তটরেখা ধরে হেঁটে আবার যেখানে পাথুরে শিরাগুলো সমুদ্রে

নেমেছে সেখানে জলে নেমে এগোতে থাকল তিনজন। ক্যাথলিন তার ডায়েরিতে মাঝে মাঝে কী সব যেন নোট নিতে লাগল। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও দেখা মিলছে পেঙ্গুইনদের ছোট ছোট ঝাঁকের। কখনও তারা সুদীপ্তদের দেখে কাছে এগিয়ে আসছে, আবার কখনও বা ভয় পেয়ে বরফমোড়া সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিচ্ছে। সিল বা সিন্ধুঘোটকও মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে দু-একটা। মানুষ দেখে অবশ্য তাদের খুব একটা ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজেদের মতো তারা শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে তটের ঠিক গায়ে সমুদ্র ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ঠিক টেবিলের মতো পাথর। হেরম্যান তেমনই একটা পাথর দেখিয়ে সুদীপ্তকে বললেন, 'কে বলতে পারে, হয়তো বা ওর ওপরই বসে থাকে কোনো মৎস্যকন্যা!'

তবে ঘণ্টা তিনেক তটরেখা বরাবর হেঁটেও তেমন কারও দর্শন মিলল না সুদীপ্তদের। হেরম্যান বললেন, 'চলো এবার ফেরা যাক। নইলে সূর্যাস্তের আগে জাহাজে পৌঁছোতে পারব না। কাল এগোব দ্বীপের পূর্ব দিকে।'

।।৫।।

বিকাল চারটে নাগাদ তারা ফিরে এল যে জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানে। আগের মতোই সে জায়গা পেঙ্গুইনের প্যাঁকপ্যাঁকানিত মুখরিত। জলে নেমে নৌকা নিয়ে তারা ভেসে পড়ল জাহাজের দিকে। দাঁড় টেনে জাহাজটার কাছে পৌঁছোতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল তারা। জাহাজের গায়ে বেশ অনেকটা অংশ জুড়ে জলের রং ঘন লাল! না, তা বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ নয়। তিমির রক্ত। তীব্র আঁশটে গন্ধ ছড়াচ্ছে জাহাজের চারপাশে। ক্যাথলিন নাকে রুমাল চাপা দিল। নৌকা জাহাজের গায়ে ভিড়তেই ওপর থেকে দড়ির মই নেমে এল। ডেকে উঠে পড়ল তিনজন। সারা ডেক তিমির রক্তে মাখামাখি। আর তার সঙ্গে তেমনই আঁশটে গন্ধ। বিরাট একটা ট্রেতে বরফ চাপা দেওয়া তিমির মাংস ধরাধরি করে খোলের ভিতর নামাচ্ছে কয়েকজন মাল্লা। সুদীপ্তদের দেখে ক্যাপ্টেন হ্যামার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওই ট্রেটা খোলে নামালেই আজকের মতো কাজ শেষ। প্রথম দিনই এগারোটা প্রাণী শিকার করা হল।'

হেসে কথা শেষ করে তিনি হেরম্যানকে প্রশ্ন করলেন, 'যার খোঁজে গেছিলেন তার দর্শন মিলল?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'না, আপাতত মেলেনি। দ্বীপের পশ্চিম তটরেখা বরাবর আমরা গেছিলাম। কাল যাব পূর্বদিকে।'

হ্যামার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই জাহাজের উল্টোদিকের রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন নাবিকদের মধ্যে একজন আফ্রিকান ভাষায় চিৎকার করে কী যেন বলল, তারপর হাত দিয়ে রেলিংয়ের নীচে জলের দিকে দেখাল।

ক্যাপ্টেনের পিছনে তারা তিনজনও এগোল সেদিকে। জাহাজের যে পাশ দিয়ে সুদীপ্তরা ডেকে উঠেছে তার অন্য পাশে রেলিংয়ের কাছে পৌঁছোতেই নীচ থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ। সেখানে পৌঁছে রেলিং ধরে নীচে তাকাতেই সুদীপ্তদের চোখে পড়ল বিরাট আকারের একটা মৃত তিমি লোহার শিকল দিয়ে জাহাজের গায়ে বাঁধা। আকারে সেটা অন্তত তিরিশ ফুট হবে। ক্যাপ্টেন হ্যামার সুদীপ্তদের বললেন, 'আপনারা জাহাজে ফেরার কিছুক্ষণ আগেই ওকে শিকার করেছি। এতবড় তিমিটাকে ডেকে তুলে কেটে ট্রেতে ভরতে অন্ধকার নেমে যাবে। কাল সকালে ওকে ডেকে তোলা হবে।' আর এরপরই

আসল দৃশ্যটা চোখে পড়ল সুদীপ্তদের। শিকলবাঁধা মৃত তিমিটার গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরও একটা ছোট তিমি। অদ্ভুত একটা শব্দ তুলছে সেই ছোট্ট প্রাণীটা। আর মাঝে মাঝে এসে ঘা দিচ্ছে মৃত তিমিটার পেটে। হ্যামার বললেন, 'যাকে শিকার করা হয়েছে তার শাবক ওই ছোট তিমিটা। মাকে সমুদ্রতে ফিরিয়ে নেবার জন্য ও চেষ্টা করছে। অথবা স্তন্যপান করার জন্য।'

যে নাবিকরা সুদীপ্তদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা হাসছে দৃশ্যটা দেখে। স্পষ্টতই ব্যাপারটাতে বেশ আমোদ পাচ্ছে তারা।

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'তিমির বাচ্চাটার কী হবে?'

হ্যামার জবাব দিলেন, 'ওকে মেরে আমাদের লাভ নেই। গায়ের মাংস এখনও খুব নরম আছে। তবে ও বাঁচবে না। জানেনই তো তিমি স্তন্যপায়ী প্রাণী। বাচ্চাটার আকার দেখে অনুমান ও এখনও দুধ ছাড়েনি। কাজেই ক'দিনের মধ্যেই মারা পড়বে ও।'

জলের মধ্যে অদ্ভুত শব্দ করছে বাচ্চা তিমিটা। ঠিক যেন ক্রন্দনধ্বনি। এই করুণ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ক্যাথলিন বলে উঠল, 'আমার আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি কেবিনে চললাম।' সুদীপ্তদের কাছেও দৃশ্যটা বেশ পীড়াদায়ক। তা ছাড়া শরীরও পরিশ্রান্ত। কাজেই তারাও ক্যাথলিনের সঙ্গে নিজেদের কেবিনে ফেরার রাস্তা ধরল। ডেক ছেড়ে নীচে নেমে নিজের কেবিনে প্রবেশ করার আগে ক্যাথলিন বেশ ক্ষুব্ধস্বরে বলল, 'কীভাবে ওরা অত বড় বড় নিরীহ প্রাণীগুলোকে শিকার করছে! এরা কি মানুষ! নাকি নরপিশাচ? মাল্লাগুলো যখন মৃত তিমি আর বাচ্চাটাকে দেখে হাসছিল তখন মনে হচ্ছিল ওদের গালে চড় কষিয়ে দিই। ব্যাপারটা এত নৃশংস আগে জানলে কিছুতেই এ জাহাজে উঠতাম না।'

সুদীপ্ত বলল, 'আমাদেরও খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু আমাদের তো কিছু করণীয় নেই এ ব্যাপারে। যথাসম্ভব এসব দৃশ্য না দেখে আমাদের নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

হেরম্যান বললেন, 'কাল সকালে আলো ফোটার পরই আমরা জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে রওনা হব।'

ক্যাথলিন বলল, 'হ্যাঁ, যতক্ষণ এ জাহাজে না থাকা যায় ততই ভালো। ভোরের আলো ফুটলেই আমি তৈরি হয়ে থাকব।'—এই বলে কেবিনে ঢুকে দরজা দিল ক্যাথলিন।

রাত আটটা নাগাদ খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ার আগে একটু টাটকা অক্সিজেন ঘরে ঢোকাবার জন্য কেবিনের পোর্ট হোল অর্থাৎ গোলাকার কাচের জানলা খুললেন হেরম্যান। বাইরে জ্যোৎস্না আলোকিত বরফ-মোড়া সমুদ্র। এখানে সমুদ্রের নাব্যতা খুব কম বলে, জাহাজের নীচের অংশের অনেকটাই জলের ভিতরে ডুবে আছে। আর জলতল পোর্ট হোলের অনেকটাই কাছে চলে এসেছে। মাত্র হাত তিন-চার ব্যবধান। ছোট ছোট বরফের পাত ভাসছে জলে। কিন্তু জানলাটা খুলতেই প্রবল ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে তিমির রক্তের আঁশটে গন্ধ প্রবেশ করতে লাগল কেবিনে। তিনি তাই পোর্ট হোলের পাল্লাটা আবার বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় বাইরে হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়তেই তিনি বললেন, 'সুদীপ্ত, দেখবে এসো!'

সুদীপ্ত পোর্ট হোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল ব্যাপারটা। সেই তিমির বাচ্চাটা জাহাজের অন্যপাশে তার মাকে ছেড়ে এবার এদিকে এসে উপস্থিত হয়েছে! সুদীপ্তরা দেখতে লাগল তাকে। একবার তো সেই ছোট্ট তিমিটা পোর্ট হোলের একদম কাছে চলে এল। কয়েক বিন্দু জল ছিটকে উঠে সুদীপ্তদের মুখেও লাগল। তারপর সম্ভবত জাহাজের অন্যদিকে যাবার জন্য রওনা হল সে। যেমন ঠান্ডা, তেমনই আঁশটে গন্ধ। এরপর আর পোর্ট হোল খোলা রাখা সম্ভব হল না। পোর্ট হোলটা বন্ধ করার সময় হেরম্যান আক্ষেপের স্বরে বললেন, 'মানুষের লালসার জন্য এমন কত নিরীহ প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়। আমার ক্ষমতা থাকলে মা-হারা এই প্রাণীটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম।'

সুদীপ্তরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন মধ্যরাত। হঠাৎ কেবিনের দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাদের। হেরম্যান বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে কেবিনে প্রবেশ করল সেই হারপুন স্মিথ। তার হাতে একটা লম্বা টর্চ। 'এত রাতে ঘুম ভাঙালাম বলে ক্ষমা করবেন।'—এ কথা বলেই সে সোজা এগিয়ে গিয়ে পোর্ট হোল খুলে জলের ওপর টর্চের আলো ফেলতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ বাইরেটা দেখার পর পোর্ট হোল বন্ধ করে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সুদীপ্ত তাকে প্রশ্ন করল, 'কী দেখলে?'

লোকটা যা জবাব দিল তা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন সুদীপ্ত আর হেরম্যান। স্মিথ বলল, 'যে নাবিক ডেকে রাত-পাহারা দিচ্ছিল, সে নাকি মারমেড দেখেছে। এদিকে এসে অদৃশ্য হয়ে যায় প্রাণীটা। তাই দেখলাম কিছু আছে নাকি!'

স্মিথ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই হেরম্যান আক্ষেপের স্বরে বললেন, 'আমরা বোকামি করেছি। যত কষ্টই হোক না কেন, আমাদের উচিত ছিল ডেকে রাত কাটানো। আগের সেই বুড়ো নাবিক তো রাতে ডেক থেকেই মৎস্যকন্যার দর্শন পেয়েছিল। আজ ডেকে থাকলে আমরাও পেতাম। চলো ডেকে চলো।'

হারপুন স্মিথের প্রায় পিছন পিছন ঘরের বাইরে এল তারা। ওপরে ওঠার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোতে গিয়ে পাশের কেবিনের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত বলল, 'ক্যাথলিনকে ডাকব নাকি?'

হেরম্যান বললেন, 'থাক। মাঝরাতে মেয়েটাকে ডেকে লাভ নেই। ওপরে গিয়ে ব্যাপারটা কী ঘটেছে জানি।'

ডেকে উঠে এল সুদীপ্তরা। প্রায় সব নাবিকই ডেকে জড়ো হয়েছে। একজন নাবিককে ঘিরে তারা চাঁদের আলোতে উত্তেজিতভাবে জটলা করছে। সুদীপ্তরা ডেকে উঠতেই ক্যাপ্টেন এগিয়ে এলেন। সিঁড়ির মুখটাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। সুদীপ্তদের কাছে চাপাস্বরে তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনারা কি নাবিকদের সামনে মৎস্যকন্যা সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন? আমি তো আপনাদের বারণ করেছিলাম।'

হেরম্যান বেশ দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন, 'না, কারও সামনে আমরা ও ব্যাপারে আলোচনা করিনি।'

তাঁর কথা শুনে যেন আশ্বস্ত হয়ে ক্যাপ্টেন এগোলেন জটলার দিকে। তাঁর পিছনে হেরম্যান আর সুদীপ্ত। ছোটখাটো যে মাল্লাকে ঘিরে জটলা হচ্ছে, তার চোখে- মুখে বেশ ভয়ার্ত ভাব। আর তাকে যারা ঘিরে আছে তাদের মুখেও উত্তেজনা। ক্যাপ্টেন হ্যামার নাবিকদের বলয়ের মধ্যে থাকা লোকটাকে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ হেনরি। এমন ঘটনা হতেই পারে না। মারমেড বলে কোনো প্রাণী থাকতে পারে না।'

হেনরি নামের লোকটা বলল, 'না, আমি ভুল দেখিনি। মরা তিমিটার গায়ে ও ভেসে উঠল। মাছের মতো লেজটা ওপরে তুলে তাকাল জাহাজের দিকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কোমর থেকে ছুরিটা খুলে ছুড়ে মারলাম তাকে লক্ষ্য করে। আর সেই মুহূর্তেই ডুব দিল প্রাণীটা। জলের তরঙ্গ দেখে মনে হল সে যেন জাহাজটাকে বেড় দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমার ধারণা যদি তুমি কিছু দেখে থাকো তবে সেটা ওই তিমির বাচ্চাটাই।'

নাবিক আবারও বলল, 'না, ওটা মৎস্যকন্যাই। চাঁদের আলোতে ঝলমল করছিল ওর বিরাট লেজটা। আমার খুব ভয় করছে।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন নাবিক বলল, 'মারমেড দর্শন খুব অশুভ ব্যাপার। আমাদের ফিরে যাওয়াই ভালো।' আর তাকে সমর্থন করে অন্য একজন নাবিক বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে দেখে ক্যাপ্টেন হ্যামার চিৎকার করে উঠলেন, 'চোপ! আর একটা কথা বলবে না কেউ।'

এ কথা বলার পর তিনি সুদীপ্তদের চমকে দিয়ে কোমর থেকে একটা রিভলবার বার করে সমবেত নাবিকদের দিকে সেটা উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'ফের যদি কেউ ফিরে যাবার কথা বলো বা এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করো তবে তাকে গুলি করে মেরে জলে ফেলে দেব। যাও, যে যার কেবিনে ফিরে যাও। কাল সূর্যের আলো ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করতে হবে।'

যে লোকটা মারমেড দেখেছে বলে দাবি করছে, হেরম্যানের তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও এ পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা সম্ভব হল না। ক্যাপ্টেনের হুমকি শুনে নাবিকের দল জটলা ভেঙে নিজেদের কেবিনের পথ ধরল। আর তাদের সঙ্গে সুদীপ্ত আর হেরম্যানও নিজেদের কেবিনে ফিরে এল।

।। ৬।।

পরদিন সকালে সুদীপ্তরা যখন দ্বীপে যাবার জন্য তৈরি হয়ে ডেকে উঠে এল, তার অনেকক্ষণ আগেই সূর্যোদয় হয়েছে। নাবিকরা ইতিমধ্যে যে যার কাজে নেমে পড়েছে। মৃত তিমিটাকে শিকল বেঁধে ডেকে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সুদীপ্তরা ডেকে উঠে দেখল ক্যাথলিন তাদের আগেই তৈরি হয়ে ডেকে উপস্থিত হয়েছে। একটা সিন্দুকের ওপর বসেছিল সে। সুদীপ্তদের ঘরে যেমন সিন্দুক আছে, ঠিক একইরকমের সিন্দুক। সুদীপ্তদের দেখে ক্যাথলিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সিন্দুকটা কেবিন থেকে আনলাম। দ্বীপে নিয়ে যাব। টেলিস্কোপ আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি আছে। কিছু খাবার, ব্যক্তিগত কিছু জিনিসও আছে। দ্বীপেই এটা রেখে আসব। ওখানে তো আর চুরি যাবার ভয় নেই। শেষ দিন আবার ফিরিয়ে আনব।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন মাল্লা দড়ি বেঁধে সিন্দুকটা সুদীপ্তদের নৌকাতে নামিয়ে দিল। সুদীপ্তরা দাঁড় বাইতে শুরু করল দ্বীপের দিকে। জাহাজ থেকে কিছুটা দূরে যাবার পর হেরম্যান ক্যাথলিনকে বললেন, 'কাল রাতের ঘটনা জানো কিছু?'

ক্যাথলিন বলল, 'কী ঘটনা? কাল কেবিনে ঢোকার পর আমি আর বাইরে বেরোইনি।'

হেরম্যান গতরাতের ঘটনাটা সংক্ষেপে তাকে ব্যক্ত করতেই ক্যাথলিন বিস্মিতভাবে বলল, 'এত ব্যাপার ঘটে গেছে আমি বুঝতেই পারিনি। তবে মৎস্যকন্যা দর্শনের ভয়ে ওরা যদি তিমি শিকার বন্ধ করে তবে বেশ ভালো হয়।'

সুদীপ্ত বলল, 'তা হলে কিন্তু আমরাও সমস্যাতে পড়ব। শিকার বন্ধ হলে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন আমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করবেন না। আমাদেরও ফিরে যেতে হবে।'

কথা বলতে বলতে দ্বীপে পৌঁছে গেল তারা। সিন্দুকটা বেশ ভারী। হেরম্যান আর সুদীপ্ত সেটাকে ধরাধরি করে জল থেকে ডাঙায় টেনে তুলল। আগের দিনের মতোই পেঙ্গুইনের দল ডাক ছেড়ে মারিয়ান দ্বীপে স্বাগত জানাল তাদের।

হেরম্যান ক্যাথলিনকে বললেন, 'আমরা তো আজ দ্বীপের পুবদিকের তটরেখা বরাবর যাব। তুমি কী করবে?'

গতকাল যে পাথরের ওপর সিন্ধুঘোটকটা শুয়ে ছিল সেখানে আজ আর প্রাণীটা নেই। ক্যাথলিন পাথরটা দেখিয়ে বলল, 'ওর ওপর টেলিস্কোপ বসিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করব। আমি এ জায়গাতেই থাকব। চিন্তা নেই। আপনারা ফিরে এলে জাহাজের দিকে রওনা হব।'

ক্যাথলিনকে সে জায়গাতে রেখে তটরেখা বরাবর হাঁটতে লাগলেন হেরম্যান আর সুদীপ্ত। গতরাতের ঘটনার পর হেরম্যান বেশ উজ্জীবিত। তিনি বললেন, 'আমার ধারণা মৎস্যকন্যারা দ্বীপের গভীরে যায় না। কারণ মাটিতে নিশ্চয়ই তাদের অনেকটা সিল বা সিন্ধুঘোটকদের মতো বুকে ভর দিয়ে লাফিয়ে যেতে হয়। পাহাড়ের গায়ে যে গুহাগুলো সমুদ্রে এসে নেমেছে, তার ভিতরেও ওদের বাস হতে পারে।'

গতদিনের মতোই তারা এগিয়ে চলল। পথটা মোটামুটি আগের দিনের মতোই। নির্জন তটরেখা, গিরিশিরা কোথাও বা তটরেখা অতিক্রম করে সমুদ্রে নেমেছে। কোথাও কোথাও জটলা করছে পেঙ্গুইনের দল, পাথরের ওপর আড়মোড়া ভাঙছে সিল। ঘণ্টাখানেক চলার পর তটরেখাটা এক জায়গাতে নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে। সেটা অতিক্রম করেই হেরম্যান বলে উঠলেন, 'আরে! একটা জাহাজ মনে হচ্ছে!'

হ্যাঁ, একটা জাহাজের অবয়ব যেন দূর থেকে চোখে পড়ছে! সুদীপ্তরা তটরেখা ধরে দ্রুত এগোল সেদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের অবয়বটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করল তাদের চোখের সামনে। একসময় জাহাজটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা দুজন। জলে নয়, জল থেকে বেশ অনেকটা তফাতে ডাঙার মধ্যে রয়েছে কিছুটা হেলে পড়া বিশাল জাহাজটা। অবশ্য এখন তাকে কোনো দানব জাহাজের কঙ্কাল বলাই ভালো। কাঠের অংশ অধিকাংশই খসে পড়েছে, লোহার কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজটা যে প্রাচীনকালের পালবাহিত জাহাজ তা তার ভেঙে পড়া সার সার মাস্তুলদণ্ডের অবশিষ্ট অংশ দেখে বোঝা যাচ্ছে। বর্তমানে রেলিংবিহীন ডেকটাতে বেশ কয়েকটা কামান রয়েছে। কয়েকটা আবার ডেক থেকে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কিছুটা তফাতে থেকে জাহাজটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর হেরম্যান বললেন, 'এ জাহাজ হয় যুদ্ধজাহাজ অথবা জলদস্যুদের জাহাজ ছিল বলে মনে হয়। নইলে কামানের এত আধিক্য থাকত না। ছবির বইতে এ ধরনের জাহাজের ছবি হয়তো বা তুমিও দেখেছ। বাষ্পীয় জাহাজ আসার আগে সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতকে এ ধরনের জাহাজ ব্যবহার করা হত।'

সুদীপ্ত বলল, 'সম্ভবত সামুদ্রিক ঝড় জাহাজটাকে ডাঙায় টেনে তুলেছিল। অথবা সমুদ্র দ্বীপের আরও গভীরে বিস্তৃত ছিল, এখন কিছুটা দূরে সরে এসেছে। নইলে এত বড়

জাহাজকে কিছুতেই ডাঙায় টেনে তোলা সম্ভব নয়।'

হেরম্যান বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়। খোলটার আয়তন দেখেছ! আমাদের জাহাজের মতো তিনটে জাহাজ ঢুকে যাবে ওর পেটে!'

এ কথা বলার পর হেরম্যান বললেন, 'হয়তো এই অজানা দ্বীপে এসে খাদ্যাভাব বা রোগে ভুগে মারা পড়েছিল এ জাহাজের নাবিকরা, অথবা অন্য কোনো জাহাজ এসে তাদের উদ্ধার করেছিল। আজ শুধু সেদিনের কোনো অজানা নৌ-অভিযানের সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে জাহাজটা। অনেকসময় কিন্তু এসব জাহাজে গুপ্তধন পাওয়া যায়। কাছে গিয়ে একবার জাহাজটা ঘুরে দেখবে নাকি?'

শেষ কথাগুলো যে হেরম্যান মজা করে বললেন, তা বুঝতে অসুবিধা হল না সুদীপ্তর। সহজে বড়লোক হবার ইচ্ছা বা আগ্রহ কোনোটাই যে হেরম্যানের নেই, তা এতদিন তাঁর সঙ্গে থেকে জানে সুদীপ্ত। হেরম্যান এরপর নিজেই বললেন, 'আমরা যেভাবে এগোচ্ছিলাম, চলো সেভাবেই এগোনো যাক। এর মধ্যে কোনোদিন সুযোগ-সুবিধা পেলে জাহাজটা ঘুরে দেখা যাবে।'

সুদীপ্তরা এগোতে লাগল। এ জায়গাতে কিছুটা তফাতে তফাতেই গিরিশিরাগুলো সমুদ্রতে এসে মিশেছে। অন্ধকার সব গুহা। সমুদ্রের জল এসে মিশেছে সেখানে। একটা সময় যাত্রাপথ রুদ্ধ হল তাদের। একটা উঁচু গিরিশিরা এমনভাবে সমুদ্রের বেশ ভিতরে প্রবেশ করেছে যে সমুদ্রে নৌকা নিয়ে গিরিশিরাটাকে বেড় দিয়ে ওপাশে যেতে হবে।

একটু ভেবে নিয়ে হেরম্যান বললেন, 'আজকের মতো তবে ফিরে চলো। দেখা যাক কাল কী করতে পারি?'

তারা ফেরার পথ ধরল। যে জায়গা থেকে তারা রওনা হয়েছিল, গতদিনের থেকে অনেক আগেই, বেলা দুটো নাগাদ তারা সে জায়গাতে ফিরে এল।

কিন্তু ক্যাথলিন কই? সমুদ্রতটে শুধু রয়েছে তার সিন্দুকটা। একই জায়গায় সেটা রয়েছে, যেখানে হেরম্যান আর সুদীপ্ত সেটা নামিয়ে রেখেছিলেন। হেরম্যান বেশ কয়েকবার হাঁক দিলেন, 'ক্যাথলিন, ক্যাথলিন' বলে। সুদীপ্তও বেশ কয়েকবার হাঁক দিল ক্যাথলিনের নাম ধরে, কিন্তু তার কোনো সাড়া মিলল না। সুদীপ্তদের হাঁকডাকে ভয় পেয়ে একদল পেঙ্গুইন শুধু লাফিয়ে পড়ল বরফগলা সমুদ্রে।

হেরম্যান বললেন, 'মেয়েটা কোথায় গেল? ও কি দ্বীপের ভিতরে ঢুকল? অবশ্য আমাদের তো এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল না। হয়তো বা ও নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসবে বিকাল নাগাদ। চলো আপাতত ওই সিন্দুকটার ওপরে কিছুক্ষণ বসি। তবে আজকে থেকে পালা করে ডেকে রাত জাগতে হবে। বলা যায় না, হয়তো আবার মৎস্যকন্যা এসে যদি হাজির হয় জাহাজের কাছে?'

কথা বলতে বলতে তারা হাজির হল সিন্দুকটার কাছে। তার ডালাটা খোলা। ভিতরে কিছু নেই। সুদীপ্তরা বেশ অবাক হল। এত মালপত্র নিয়ে ক্যাথলিন কোথায় গেল? সিন্দুকটার ভিতরটাও যেন কেমন ভেজা ভেজা। সিন্দুকটার ডালা বন্ধ করার জন্য একটু ঝুঁকতেই সিন্দুকের ভিতর একটা জিনিস চোখে পড়ায় হেরম্যান সেটা তুলে নিলেন। ঝিনুকের একটা মালা। হয়তো বা সেটা ক্যাথলিনেরই হবে। মালাটা নেড়েচেড়ে একটু পরীক্ষা করে ক্যাথলিন ফিরলে সেটা তাকে ফেরত দেবার জন্য জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলেন হেরম্যান। ডালা বন্ধ করে সিন্দুকের ওপর বসে ক্যাথলিনের ফেরার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন তাঁরা। সময় এগিয়ে চলল।

বিকেল হয়ে এল একসময়। সমুদ্রে ভাসমান পেঙ্গুইনের ঝাঁকগুলো একে একে ডাঙায় উঠে আসতে লাগল। হেরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো তো, আশেপাশে একটু দেখে আসি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না!

খোঁজ শুরু করল সুদীপ্তরা। তটরেখা থেকে কিছুটা তফাতে একটা পাথুরে টিলা আছে। তার ওপর সুদীপ্তরা চড়ে বসল। দ্বীপের ভিতরটা বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সুদীপ্তদের যতদূর চোখ যাচ্ছে তাতে দ্বীপের ভিতর গাছপালা বিশেষ নেই। পাথুরে টিলা, পাহাড় আর গিরিশিরা সমন্বিত দ্বীপ। কোথাও কোথাও খাত বেয়ে নালা বা ছোট ছোট খালের মতো সমুদ্রের জল দ্বীপের ভিতরেও প্রবেশ করেছে। উঁচু টিলা বা পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ জমে আছে। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সুদীপ্ত আর হেরম্যান বেশ কয়েকবার ডাক দিলেন ক্যাথলিনের নাম ধরে। তাঁদের ডাক টিলাগুলোর গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। কিন্তু ক্যাথলিনের কোনো সাড়া মিলল না। অগত্যা টিলা থেকে নেমে এল সুদীপ্তরা। তারা যখন টিলা থেকে নেমে সমুদ্রতটে তাদের আগের জায়গাতে ফিরে এল তখন সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করেছে সমুদ্রের বুকে। দূরে একটা দেশলাই বাক্সর মতো দেখা যাচ্ছে জাহাজটা। মৃদু বাতাসে কিছুটা তফাতে জলের মধ্যে দোল খাচ্ছে নৌকোটা।

হেরম্যান বললেন, 'কী হতে পারে বলো তো?'

সুদীপ্ত বলল, 'যতদূর মনে হয়, এ দ্বীপে হিংস্র জন্তু বিশেষ নেই। নইলে এই নিরীহ পেঙ্গুইনের দল এখানে বাসা বাঁধত না। এমন হতে পারে যে ক্যাথলিন টিলার গোলকধাঁধায় পথ হারিয়েছে, অথবা কোনোভাবে চোট পেয়েছে বা আহত হয়েছে। কিছু একটা তো হয়েইছে।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, দ্বীপের ভিতর ঢুকে ভালো করে খোঁজ চালাতে হবে। কিন্তু সেটা কাল সকালের আগে হবে না। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। কিন্তু জাহাজেও ফেরা যাবে না। বলা যায় না, সূর্যাস্তের পর হয়তো ক্যাথলিন ফিরে এল।'

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ। আমরা জাহাজে এখন ফিরব না। এখানেই ক্যাথলিনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। আমরা ফিরছি না দেখে হয়তো বা জাহাজ থেকে ক্যাপ্টেন কাউকে পাঠাতে পারেন আমাদের খোঁজ করার জন্য।'

হেরম্যান বললেন, 'তেমন হলে আরও ভালো। ক্যাথলিন না ফিরলে ওকে খোঁজার জন্য তাদেরও সাহায্য পাওয়া যাবে।'

কিছু সময়ের মধ্যেই বরফসমুদ্রে সূর্য ডুবে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল কনকনে ঠান্ডা বাতাস। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই পেঙ্গুইনের দলও তাদের চিৎকার থামিয়ে আশ্রয় নিতে থাকল সমুদ্রতটে পড়ে থাকা পাথরগুলোর খাঁজে। হেরম্যান বললেন, 'ওভাবে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা নির্ঘাত মারা পড়ব। চলো, কোনো পাথরের আড়ালে আশ্রয় নেওয়া যাক।'

যে বিরাট পাথরটার ওপর আগের দিন একটা সিন্ধুঘোটক বসে ছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল সুদীপ্তরা। তার আড়ালে একটা গর্ত মতো জায়গাতে বসেছিল এক পেঙ্গুইন দম্পতি। সেটা মনে হয় তাদের স্থায়ী আস্তানা। ব্যাপারটা অভদ্রজনোচিত হলেও শীত থেকে বাঁচতে তাদের হঠিয়ে সে জায়গার দখল নিল সুদীপ্তরা। বেশ কিছু সময়ের জন্য অন্ধকারে ঢেকে গেল চারপাশ।

।। ৭ ।।

চাঁদ উঠতে শুরু করল একসময়। ধীরে ধীরে চারদিক স্পষ্ট হতে লাগল। একসময় ভরা চাঁদের আলোতে ভরে গেল চারদিক। গুটি গুটি পায়ে নিজেদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল পেঙ্গুইনের দল। তারা একে একে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল, খেলে বেড়াতে লাগল চাঁদের আলোতে উচ্ছ্বসিত ধবধবে দুধের মতো বরফসমুদ্রে। সেই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ক্যাথলিনের কথাও ভুলে গেল সুদীপ্তরা। ঘণ্টাখানেক ধরে জলক্রীড়া সাঙ্গ করে অবশেষে আবার পাড়ে উঠে এল পেঙ্গুইনের দল রাত্রিযাপনের জন্য। আগের মতোই নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক। পাথরের আড়ালে বসে সুদীপ্তরা চেয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। অপেক্ষা করতে লাগল ক্যাথলিনের ফিরে আসার জন্য।

এখন মাঝরাত। হেরম্যানকে ঘুমোতে বলে জেগে ছিল সুদীপ্ত। তার চোখেও ঘুমের ভাব নেমে আসছিল। মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল চোখের পাতা। হঠাৎ তার চোখে ধরা দিল একটা দৃশ্য। সমুদ্র জল থেকে বুকে হেঁটে কী যেন একটা ডাঙায় উঠছে! চোখ কচলে ভালো করে সেদিকে তাকাল সুদীপ্ত। প্রথমে তাকে সিল মনে হলেও ডাঙার ওপর বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে সে থামতেই সুদীপ্তর ভুল ভেঙে গেল। সিল কোথায়! এ যে একটা মেয়ে! দু-হাতের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে সে যেন কিছু খুঁজছে! আর তারপরই মেয়েটা একদিকে পাশ ফিরতেই চমকে উঠল সুদীপ্ত। নিজের চোখকেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে মেয়েটার কোমরের নীচ থেকে মাছের মতো রুপোলি আঁশে ঢাকা অংশটা। আর তার শেষপ্রান্তে মাছের মতো পাখনাটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুদীপ্ত! মারমেড! মৎস্যকন্যা!! প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হেরম্যানকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলে সুদীপ্ত চাপাস্বরে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'সামনে দেখুন, সামনে দেখুন!'

চোখ মেলে সুদীপ্তর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকিয়ে হেরম্যানও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। একপাশ ফিরে এদিকে-ওদিকে মাথা ফিরিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে মৎস্যকন্যা! একরাশ চুল তার কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ভালো করে তাকে দেখার জন্য হেরম্যান উঠে দাঁড়াতেই একটা ঘটনা ঘটল। হেরম্যানকে ওভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখেই কাছেই শুয়ে থাকা একজোড়া পেঙ্গুইন দম্পতি হঠাৎই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। আর সে শব্দ কানে যেতেই আশেপাশে ঘুমিয়ে থাকা পেঙ্গুইনরাও একযোগে ডাকতে শুরু করল। মৎস্যকন্যা ফিরে তাকাল সুদীপ্তরা যে পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। সুদীপ্তদের উপস্থিতি সে বুঝতে পারল কি না কে জানে, কিন্তু কিছু একটা হয়তো অনুমান করল সেই মৎস্যকন্যা। কারণ, এরপরই সে অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে পিছু ফিরে বুকে, হাতে ভর দিয়ে ছুটতে শুরু করল সমুদ্রের দিকে। তার দেহের পিছনের অংশটা স্পষ্ট দৃশ্যমান। হ্যাঁ, পাখনাঅলা মাছেরই দেহ! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে সে ঝাঁপ দিল সমুদ্রের জলে। সাঁতার কাটতে লাগল মৎস্যকন্যা। মাঝে মাঝে তার লেজটা চাঁদের আলোতে জলের নীচ থেকে জেগে উঠছে। উত্তেজনার বশে সুদীপ্তরা কখন যেন পাথরের আড়াল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে তা তাদের খেয়াল নেই। সামান্য সময়ের মধ্যেই তটরেখার সমান্তরালে সাঁতার কেটে একটা গিরিশিরার কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল মৎস্যকন্যা। হেরম্যান আর সুদীপ্তও এবার ছুটে এসে জলে নেমে পড়ে সেদিকে তাকালেন। না, সমুদ্র জলে আর দেখা যাচ্ছে না তাকে। হেরম্যান বললেন, 'সমুদ্র মধ্যে নেমে আসা এই গিরিশিরার মধ্যে একটা গুহা আছে দেখেছি। সম্ভবত ওর মধ্যেই প্রবেশ করল মৎস্যকন্যা। আমরা নিজের চোখে দেখলাম তাকে! এবার তো আর মৎস্যকন্যার উপস্থিতি অস্বীকার করা

যাবে না! ভোরের আলো ফুটলেই গুহাটাতে একবার ঢুকব। হয়তো ওখানেই সে থাকে। কাছ থেকে একবার তাকে দেখব। আর যদি ক-টা ছবি তুলতে পারা যায় তো কথাই নেই। ছবিগুলো আমাদের জীবনের অন্যতম সেরা সম্পদ হয়ে থাকবে।'

বাকি রাতটা পাড়ে উঠে ভোরের প্রতীক্ষাতে কাটিয়ে দিল সুদীপ্তরা। তারপর একসময় সূর্যদেব রং ছড়াতে শুরু করলেন সমুদ্রের বুকে। নতুন ভোরকে স্বাগত জানিয়ে হাঁকডাক শুরু করল পেঙ্গুইনের দল। জলে নামার আগে সুদীপ্ত একবার জানতে চাইল, 'ক্যাথলিনকে খোঁজার ব্যাপারটা কী হবে?'

হেরম্যান বললেন, 'নিশ্চয়ই তার খোঁজে বেরোতে হবে আমাদের। আগে গুহাটা দেখে আসি। হয়তো বা ততক্ষণে জাহাজ থেকে আমাদের খোঁজে লোকও চলে আসবে।'

সুদীপ্তরা জলে নেমে পড়ল। তারপর তটরেখার সমান্তরালে এগিয়ে উপস্থিত হল ঠিক সে জায়গাতে, যেখানে গিরিশিরার গুহামুখ সমুদ্রতে এসে মিশেছে। হাতকুড়ি চওড়া হবে গুহার মুখটা। উচ্চতাতে সুদীপ্তদের মাথা থেকে কিছুটা বেশি। সমুদ্রের জল তার ভিতরে প্রবেশ করছে। ভিতরটা এখনও প্রায় অন্ধকারই বলা চলে। সুদীপ্ত টর্চের আলো ফেলল গুহার ভিতর। গুহাটা বেশ গভীরই মনে হল তাদের। টানেলের মতো এগিয়েছে সেটা। সুদীপ্তরা প্রবেশ করল গুহার ভিতর। কোমরসমান জল ভেঙে তারা এগোতে লাগল সামনে। সুদীপ্ত মাঝে মাঝে দু-পাশের দেওয়ালের গায়েও আলো ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণ চলার পর অবশ্য অন্ধকার অনেকটাই কেটে গেল। বাইরে সূর্য উঠতে শুরু করেছে। গুহার মাথার ছাদের ফাটল দিয়ে আলো প্রবেশ করতে শুরু করেছে গুহার ভিতর। গুহাটা একমুখী, কোথাও বাঁক নেই। সোজা এগিয়েছে সামনের দিকে। দু-পাশের দেওয়ালের গায়ে তাকের মতো খাঁজ আছে। তাতে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে তারা হাঁটছিল দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। কারণ জলের ভিতর তাদের পায়ের নীচটা নুড়িপাথরে ভর্তি। হঠাৎই চলতে চলতে এক জায়গাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন হেরম্যান। সেখানে দেওয়ালের তাকে রাখা আছে বেশ কিছু শামুক-ঝিনুক। সেগুলো হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে হেরম্যান বেশ উৎফুল্লভাবে বললেন, 'আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি মনে হয়। এগুলো সমুদ্রের জলে ভেসে আসা শামুক-ঝিনুক নয়, অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করে এনে এখানে রাখা হয়েছে। এটা মানুষের কাজ। কিন্তু মানুষ এখানে আসবে কোথা থেকে? নিশ্চয়ই ওই মৎস্যকন্যা ওগুলো সংগ্রহ করে এখানে এনে রেখেছে।'

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে এগুলো মানুষের হাতে রাখা, থুড়ি মৎস্যকন্যার।'

দ্বিগুণ উৎসাহে এরপর তারা এগোতে শুরু করল। সুদীপ্তরা বুঝতে পারল গিরিশিরার অভ্যন্তরে গুহার ভিতর দিয়ে ক্রমশ দ্বীপের গভীরে তারা প্রবেশ করছে। সুদীপ্তরা যত এগোতে লাগল জলস্রোত যেন এরপর বাড়তে শুরু করল। সমুদ্রের জল আরও বেশি প্রবেশ করতে শুরু করেছে গুহাতে। স্রোত এগোচ্ছে সামনের দিকে। একটা সময় তারা দেখতে পেল গুহাটা শেষ হয়ে এসেছে। বাইরের সূর্যালোক দেখা যাচ্ছে। তারা এগোল সেদিকে। কিন্তু অপরপ্রান্তের গুহামুখের কাছাকাছি পৌঁছে নিজেদের আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারল না সুদীপ্তরা। এখানে জলের নীচের মাটিটা এত মসৃণ আর পিচ্ছিল যে তারা দুজনেই পা হড়কে পড়ে গেল। তারপর জলস্রোতের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে ছিটকে পড়ল একটা পুকুরের মতো জায়গাতে।

কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেয়ে ভেসে উঠল তারা। জায়গাটা বড় অদ্ভুত। তিনদিকে তিনটে গুহামুখ আছে। তার মধ্যে দুটো গুহামুখ থেকে জল এসে পুষ্ট করছে ছোট এই

জলাশয়টাকে। তৃতীয় গুহামুখ থেকে অবশ্য জল সিঞ্চন হচ্ছে না। আর চৌকোনা জলাশয়ের উন্মুক্ত জায়গাতে রয়েছে কিছু ঘর-বাড়ি। জলাশয়ের সে-পাড়ে অদ্ভুত চেহারার কিছু মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। লোকগুলো অস্ত্রধারী। হাতে তলোয়ার, বল্লম এ ধরনের অস্ত্র আছে। সুদীপ্তরা নিরুপায়। তারা এগোল পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে। পাড়ের কাছে পৌঁছোতেই লোকগুলো প্রায় হ্যাঁচকা মেরেই জল থেকে ডাঙায় তুলল সুদীপ্তদের। লোকগুলোর পরনে সম্ভবত সিলের চামড়ার তৈরি পোশাক, চামড়ার কান ঢাকা টুপি। তাদের গায়ের রং দেখে মনে হয় তারা ইওরোপীয় বংশোদ্ভূত। চুল-দাড়ির রং লালচে ধরনের। অস্ত্রগুলোও যেন সাবেক কালের। সুদীপ্ত আর হেরম্যানকে তারা ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চলল বাড়িঘরগুলোর দিকে। বাড়িগুলোও ছিরিছাঁদহীন। দেখে মনে হচ্ছে সেগুলো কোনো কোনোটা জাহাজের লোহা-কাঠ দিয়ে বানানো। সুদীপ্তদের নিয়ে তারা হাজির হল একটা বাড়ির সামনে। বাড়ির দরজাটার ঠিক সামনে একটা মাস্তুল পোঁতা আছে। তার সামনে একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে একটা দীর্ঘদেহী লাল দাড়িঅলা লোক। তার মাথায় প্রাচীনকালের নাবিকদের মতো বাঁকানো টুপি। পোশাকও আদ্যিকালের ভিক্টোরিয়া যুগের নাবিকদের মতো। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে একটা বাঁকানো তলোয়ার। তবে অন্য লোকদের থেকে এ লোকটার পোশাক কিছুটা জমকালো ধরনের। গলায় একছড়া মুক্তোর মালা আর কানে সোনার মাকড়িও আছে। তাকে ঘিরে আরও বেশ কয়েকজন লোকও দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপ্তদের বুঝতে অসুবিধা হল না যে লাল দাড়িঅলা লোকটাই দলপতি। মাঝবয়সি লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুদীপ্তদের পর্যবেক্ষণ করে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, 'তোমরা নিশ্চয়ই ওই তিমি-শিকারি জাহাজের নাবিক?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা ও জাহাজেই এসেছি। কিন্তু তোমরা কে?'

লোকটা প্রথমে জবাব দিল, 'আমি ক্যাপ্টেন শার্ক। এ দ্বীপের মালিক। পাঁচশো বছর ধরে আমরা আছি এখানে।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'পাঁচশো বছর মানে?'

শার্ক বলে লোকটা জবাব দিল, 'মানে সেই আমাদের বুকানির ফ্রান্সিস ড্রেকের সঙ্গে স্প্যানিশ আর্মাডার লড়াই বাঁধল যেসময়, আমাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন এ দ্বীপে।'

এ কথা বলার পর শার্ক নামের সেই স্বঘোষিত দ্বীপমালিক প্রশ্ন করল, 'তোমরা আমাদের মৎস্যকন্যাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? জাহাজে? মৎস্যকন্যা দেখলে জাহাজিরা ভয় পায়। তার মানে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছ তোমরা!'

হেরম্যান বললেন, 'তাকে তো আমরা লুকোইনি। আর কী ব্যাপার জানার কথা বলছেন আপনি?'

এরপর তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, 'মৎস্যকন্যাকে তো আমরা গতরাতে সমুদ্রতটেই দেখেছি।' কিন্তু তার আগেই শার্ক নামের লোকটা বলে উঠল, 'ওকে আমরা পালাতে দেব না। জাহাজ থেকে দরকার হলে ছিনিয়ে আনব। তারপর এই মাস্তুল থেকে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাব। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পাবে সে। আর তোমাদের উদ্দেশ্যও পূরণ হবে না।'

কাজেই মৎস্যকন্যা যে এই দ্বীপেই কোথাও আছে, তা লোকটাকে জানানো সমীচীন মনে করলেন না হেরম্যান। তবে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেও হেরম্যান আর সুদীপ্ত মনে মনে খুশি হল এই ভেবে যে তাহলে মৎস্যকন্যা সত্যিই আছে। তাকে দেখার ব্যাপারটা তাদের দৃষ্টিবিভ্রম ছিল না। তবে লোকটা কী উদ্দেশ্যর কথা বলছে, তা বুঝতে

পারল না তারা। শার্ক, সুদীপ্তদের চুপ থাকতে দেখে বলল, 'তবে তোমরা ব্যাপারটা স্বীকার করবে না?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'বলছি তো তার খবর আমাদের জানা নেই।'

লোকটা এবার অন্যপাশে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাছেও আমি শেষবারের মতো জানতে চাইছি, মৎস্যকন্যা কোথায়?'

শার্ক নামের অদ্ভুত লোকটা যেদিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল, সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। কিছুটা তফাতে একটা কাঠের পিপের গায়ে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে ক্যাথলিন! তার মানে সে আগেই ধরা পড়েছে এ লোকগুলোর হাতে। ক্যাথলিন জবাব দিল, 'আমি জানি না সে কোথায়। আমি তাকে দেখিনি।'

শার্কের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ক্যাথলিনের উদ্দেশে সে বলল, 'সামনের এই পুকুরটার নাম জানো? মারমেড পন্ড। এই পুকুরে তোমাকে মৎস্যকন্যা বানিয়ে তোমাকে ছাড়া হবে। বেশ আনন্দে তুমি ঘুরে বেড়াবে এই পুকুরে। মাঝে মাঝে তোমাকে সমুদ্রেও নিয়ে যাওয়া হবে।'

এ কথা বলার পর ক্যাপ্টেন শার্ক তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'আপাতত এ মেয়েটাকে ঘরে ঢোকা, আর এ লোক দুটোকে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধ। কাল এ দুটো লোককে সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়ে খুঁটির মাথায় ঝোলাব। পণবন্দি বানাব। যদি মৎস্যকন্যা জাহাজে থাকে তবে তার বিনিময়ে দুজনের মুক্তির কথা বলব। জাহাজে নিশ্চয়ই দূরবিন আছে। খুঁটিতে ঝোলালে জাহাজ থেকে নিশ্চয়ই দেখা যাবে ওদের।'

কথাটা শুনে পাশ থেকে একজন লোক বলল, 'কিন্তু ক্যাপ্টেন শার্ক। মৎস্যকন্যার বিনিময়ে এদের ছেড়ে দেওয়ার পর এরা যদি ফিরে এসে আমাদের আক্রমণ করে?'

শার্ক কথা শুনে হিংস্রভাবে হেসে উঠে বলল, 'কেউ ছাড়া পাবে না। মৎস্যকন্যাকে পেলেও পাবে না, না পেলেও পাবে না। যেদিন এই মেয়েটাকে মৎস্যকন্যা বানিয়ে পুকুরে ছাড়া হবে সেদিন এ লোক দুটোকে সমুদ্রদানবের কাছে উৎসর্গ করব।'

সুদীপ্ত এবার বলে উঠল, 'আপনারা কিন্তু অযথা আমাদের সন্দেহ করছেন। আমরা দ্বীপে বেড়াতে নেমেছিলাম।'

লোকটা বলল, 'তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছ? আমি প্রাইভেটিয়ার শার্কের বংশধর। আমাকে ধোঁকা দেওয়া অত সহজ নয়। বাঁধ, বেঁধে ফেল।' শেষ কথাটা তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

সুদীপ্তদের আর-কোনো কথা বলতে দেওয়া হল না। তাদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল মাটিতে পোঁতা জাহাজের মাস্তুলের কাছে। মাটিতে বসিয়ে তাদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হল মাস্তুলদণ্ডের সঙ্গে। একদল লোক ক্যাথলিনকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরবাড়িগুলোর আড়ালে। হিংস্র দৃষ্টিতে একবার সুদীপ্তদের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন শার্ক নামের লোকটা তার অস্ত্রধারী সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'চলো, এবার সমুদ্রের পাড়ে যাব। দেখতে হবে ওখানে কোথাও মৎস্যকন্যা লুকিয়ে আছে কি না। অথবা তিমি শিকারের জাহাজ থেকে ওদের কাছে কেউ এসেছে কি না।'

অবশিষ্ট লোকজনকে নিয়ে সে জায়গা ছেড়ে এরপর অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাপ্টেন শার্ক। নিস্তব্ধতা নেমে এল চারপাশে। এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে সুদীপ্তরা আগেও পড়েছে।

মাথা ঠান্ডা রাখাই এখন একমাত্র কাজ। তারা চলে যাবার পর সুদীপ্ত বলল, 'ক্যাপ্টেন শার্ক লোকটার সম্বন্ধে কী বুঝলেন বলুন তো?'

হেরম্যান বললেন, 'লোকটা জলদস্যুদের বংশধর। একসময় যেসব জলদস্যু যুদ্ধের সময় ইংরেজ নৌবাহিনীর হয়ে ভাড়া খাটত, তাদের 'প্রাইভেটিয়ার' বলা হত। আমি বইতে পড়েছি।'

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু ওরা এই দ্বীপে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রয়ে গেছে কেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই তার পিছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে। তবে দেখা যাক ওরা শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে কী করে। এমনও হতে পারে ক্যাপ্টেন হ্যামার এসে আমাদের উদ্ধার করল। জাহাজে বন্দুক আছে। এ লোকগুলোর কাছে বন্দুক নেই বলেই মনে হয়। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। আমার শুধু ভাবনা হচ্ছে ক্যাথলিনকে নিয়ে, সে বেচারি একা পড়ে গেল। তার তো আর আমাদের মতো এ ধরনের অভিজ্ঞতা নেই। তবে যাই হোক না কেন আমাদের এই অভিযান এক অর্থে সফল। আমরা দেখা পেয়েছি মৎস্যকন্যার।'

সুদীপ্ত বলল, 'ঠিক তাই। এ অভিযানে যদি আমাদের মৃত্যুও ঘটে, তবে মরার আগে সান্ত্বনা থাকবে যে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে।'

হেরম্যান বললেন, 'এবার ধীরে ধীরে দণ্ডটার গায়ে হাত ঘষতে থাকো। যদি দড়ি ছেঁড়া যায় কোনোভাবে।'

সময় এগিয়ে চলল। তবে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল যেভাবে তাদের বাঁধা হয়েছে তাতে ঘষে দড়ি ছেঁড়া সম্ভব নয়।

দুপুর হল একসময়। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল। একইভাবে দড়ি বাঁধা অবস্থায় বসে রইল তারা। অবশেষে সন্ধ্যা নামল। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল চারপাশে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা।

।। ৮ ।।

বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে কাটাল তারা দুজন। তারপর একসময় চাঁদ উঠতে শুরু করল আকাশে। আবছাভাবে সুদীপ্তদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল পুকুরটা। অন্ধকার গুহামুখগুলো। হেরম্যান বললেন, 'এভাবে ওরা যদি আমাদের এখানে সারারাত ফেলে রাখে, তবে আমাদের আর কষ্ট করে মারতে হবে না। ঠান্ডাতেই মারা পড়ব।'

তাঁর কথার জবাবে সুদীপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু একটা শব্দ শোনা গেল পুকুর থেকে। ভারী কিছু একটা যেন পুকুরে এসে পড়ল! কথা থামিয়ে তারা তাকিয়ে রইল পুকুরের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুকুর সাঁতরে পাড়ে উঠে এল একটা ছায়ামূর্তি। তার হাতে লম্বা লাঠির মতো কিছু একটা যেন আছে। লোকটার মুখ বোঝা না গেলেও সুদীপ্তদের মনে হল লোকটা যেন চারপাশে তাকাচ্ছে। সুদীপ্তরা যেখানে বসে আছে সেখানে সামনের বাড়িটা চাঁদের আলোকে আড়াল করে রাখায় লোকটা তাদের দেখতে পাচ্ছে না। চারপাশে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিয়ে ঘরবাড়িগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুদীপ্ত বলল, 'এ আবার কে?'

হেরম্যান বললেন, 'অন্ধকারের জন্য ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে আমরা যে পথে এসেছি, এও সম্ভবত সে পথেই পুকুরে এসে পড়েছে।'

ঠান্ডা আরও বাড়তে শুরু করেছে। হাড়ে যেন কাঁপন ধরে যাচ্ছে। তবুও তারই মধ্যে আরও কিছু চোখে পড়ে কি না তার জন্য সুদীপ্তরা অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সে লোকটাকে আর দেখা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার লোকজনের কথাবার্তার শব্দ যেন কানে এল তাদের। ক্রমশ সে শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল বাড়িঘরগুলোর পিছন থেকে। আর তার সঙ্গে মশালের আলো। ঘরবাড়িগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে সুদীপ্তদের সামনে দলবলসমেত আত্মপ্রকাশ করল ক্যাপ্টেন শার্ক। সুদীপ্তদের কাছে এসে ব্যঙ্গভরে সে জানতে চাইল, 'সারাদিন কেমন কাটল? ঠান্ডাটা আজ একটু বেশিই পড়েছে, তাই না?'

শার্ক সহ তার সঙ্গীদের প্রত্যেকের পরনে এখন অনেকটা লম্বা ঝুলের কোটের মতো চামড়ার তৈরি শীতের পোশাক।

হেরম্যান শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ঠান্ডা একটু পড়েছে বটে।'

শার্ক বলল, 'ভাবছি তোমাদের এখন একবার পুকুরের জলে চোবাব। ঠান্ডা কাকে বলে বুঝতে পারবে। আসল কথাটা বললেই সব সমস্যা মিটে যেত। মৎস্যকন্যা কোথায়? তোমরা কেনই বা দ্বীপে এসেছ?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম তার খবর আমরা জানি না। এ দ্বীপে আমরা বেড়াতে এসেছিলাম।'

হেরম্যানের কথা শুনে শার্ক বলে উঠল, 'চুপ করো মিথ্যাবাদী।' তারপর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডাক্তার স্ক্যাভেঞ্জার? স্ক্যাভেঞ্জার, এদিকে এসো।'

শার্কের আহ্বান শুনে একটা লোক শার্কের কাছে এসে দাঁড়াল। তার পরনে অত্যন্ত নোংরা একটা পোশাক। হাতে একটা কাঠের বাক্স ঝুলছে। লোকটা বুড়ো। একটু ঝুঁকেই দাঁড়িয়েছে সে।

শার্ক তাকে বলল, 'তোমার জিনিসপত্র সব ঠিক আছে তো? মরচে পড়েনি তো?'

প্রশ্ন শুনে লোকটা তার ক্ষয়াটে দাঁত বার করে হেসে বাক্সটা একটু ঝাঁকাল। বাক্সর ভিতর ধাতব কী সব যেন ঝনঝন করে উঠল।

'জড়ি-বুটি—ঘা শুকোবার ওষুধ?' আবারও প্রশ্ন করল শার্ক।

স্ক্যাভেঞ্জার নামের বুড়োটা বলল, 'সব আছে ক্যাপ্টেন।'

শার্ক বলল, 'তবে তুমি কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও। কাল পূর্ণিমা। চেষ্টা করবে যাতে তার পরের পূর্ণিমাতেই এই পুকুরে ছাড়া যায়। সাঁতার না জানলে অবশ্য আবার তাকে তা শেখাতে হবে।'

বুড়োটা বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

শার্ক এরপর তার সঙ্গীদের বলল, 'তোমাদের মধ্যে দুজন গিয়ে মেয়েটাকে আনো। তারপর স্ক্যাভেঞ্জারের সঙ্গে মেয়েটাকে তার ঘরে নিয়ে যাবে। যতদিন না আসল কাজ শেষ হয় ততদিন মেয়েটাকে তোমরা পাহারা দেবে।'

দুজন লোক চলে গেল ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পালন করতে। শার্ক এরপর সুদীপ্তদের প্রশ্ন করল, 'তোমাদের এই মেয়েটার নাম কী?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'ক্যাথলিন।'

শার্ক হেসে বলল, 'ক্যাথলিন মারমেড। বেশ সুন্দর নাম হবে।'

ব্যাপারটা যেন বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সুদীপ্তরা। ক্যাথলিনকে কীভাবে মারমেড বানাবে লোকগুলো? ক্যাপ্টেন শার্ক এরপর তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'আমার পূর্বপুরুষরা যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে বন্দিনী নারীর সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। এই পাঁচশো বছরে পুরুষের সংখ্যা যত কমেছে, নারীর সংখ্যা কমেছে তার পাঁচগুণ বেশি। আর তো মাত্র কয়েকজন নারী আছে গ্রামে। খুব চিন্তায় ছিলাম এরপর কী হবে? মারমেড পন্ড কি ফাঁকা থাকবে? তবে শয়তান আমাদের সহায়। এর আগেও সে একজনকে জুটিয়ে দিল, আর এবারও একজনকে।'

স্ক্যাভেঞ্জার হেসে বলল, 'আপনার পূর্বপুরুষকেও তো শুনেছি অনেকে শয়তান নামে ডাকত। তার আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে আমাদের ওপর। ক্যাপ্টেন উলফের আশীর্বাদ।'

শার্ক হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমার পূর্বপুরুষ ক্যাপ্টেন উলফের যোগ্য স্যাঙাত ছিল তোমার পূর্বপুরুষ ভালচার। সত্যিই শকুনের মতো ধূর্ত ছিল সে। মৎস্যকন্যার ব্যাপারটা তো প্রথম তার মাথা থেকেই আসে।'

শার্কের কথার জবাবে বুড়ো স্ক্যাভেঞ্জার কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় যে দুজন লোক ক্যাথলিনকে খুঁজতে গেছিল তারা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল। তাদের একজন বলল, 'মেয়েটা পালিয়েছে ক্যাপ্টেন। দড়িটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।'

কথাটা শুনেই শার্ক বলে উঠল, 'ওকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া যাবে না। কয়েকজন সমুদ্রের পাড়ে যাও। যেখানে ওই ফাঁকা সিন্দুকের পাশ থেকে ওকে আমরা ধরে এনেছিলাম। আর অন্যরা আশেপাশে খোঁজ চালাও।'

সুদীপ্তদের কাছে এবার স্পষ্ট হয়ে গেল ক্যাথলিন কীভাবে এদের হাতে ধরা পড়েছিল।

শার্ক এরপর তার সঙ্গীদের আরও কিছু নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। প্রথমে একবার, তারপর আরও একবার। সুদীপ্তরা শব্দটা চিনতে পারল। বন্দুকের গুলির শব্দ!

সে শব্দ চিনতে পারল দ্বীপবাসীরাও। চাঞ্চল্য দেখা গেল তাদের চোখেমুখেও। একজন বলল, 'জাহাজের লোকরা এদের খুঁজতে দ্বীপে নেমেছে। শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে পাড় ধরে আমাদের পুরোনো জাহাজটার দিকেই এগোচ্ছে!'

শার্ক বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। চলো লড়াই দিতে হবে। কেউ ভয় পাবে না। মনে রাখবে জলদস্যুর রক্ত আমাদের প্রত্যেকের শরীরে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ধ্বংস করেছিল স্প্যানিশ আর্মাডাকে, নৌবহরকে। এদেরও কচুকাটা করব আমরা। টুকরো টুকরো করে এদের দেহগুলো সিল মাছকে খাওয়াব।'

তার কথা শুনে একজন লোক বলল, 'এ লোক দুটোর কী হবে?'

শার্ক হিংস্রভাবে বলল, 'এ দুটোকে আপাতত সমুদ্রদানবের গুহায় ঢুকিয়ে দে। আমরা ফিরে আসার পর যদি এরা বেঁচে থাকে তবে দেখা যাবে।'—এই বলে শার্ক কোমর থেকে তলোয়ার খুলে সঙ্গীদের নিয়ে ছুটল লড়াইয়ের জন্য। চারজন লোক শুধু রয়ে গেল। তারা মাস্তুলের গা থেকে সুদীপ্তদের দড়ি খুলে তাদের ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চলল পুকুরের পাড় থেকে সামান্য ওপরে জলহীন যে অন্ধকার গুহামুখ আছে সেদিকে। তাদের সঙ্গে গুহাতে প্রবেশ করল তারা। গুহাটার দশ-পনেরো পা ভিতরে একটা লোহার দরজা

বা গরাদ বসানো আছে। দ্বীপবাসীদের একজনের হাতে ধরা মশালের আলোতে সেই গরাদটাকে দেখে সেটা জাহাজ থেকে খুলে আনা লোহার গরাদ বলেই মনে হল। আবারও বন্দুকের শব্দ ভেসে এল সমুদ্রের পাড় থেকে। যারা সুদীপ্তদের ধরে এনেছে এরপর তারা আর দেরি করল না। সুদীপ্তদের ধাক্কা দিয়ে গরাদের ওপাশে ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে ইস্পাতের পাত বসানো লোহার গরাদ বন্ধ করে ছুটল শার্ক ও তার সঙ্গীদের সাহায্য করার জন্য।

।।৯।।

অন্ধকার গুহার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। বাইরে থেকে আরও বেশ কয়েকবার বন্দুকধ্বনি কানে এল। হেরম্যান বললেন, 'ক্যাপ্টেন হ্যামাররা সম্ভবত বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করছেন আমাদের সংকেত দেবার জন্য। তবে একটু পর সত্যিই যুদ্ধ শুরু হবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'হয়তো বন্দুক আছে বলে শেষ পর্যন্ত হ্যামাররা জিতলেন, কিন্তু আমাদের সন্ধান তাঁরা নাও পেতে পারেন।'

হেরম্যান বললেন, 'ঠিক তাই।'—এ কথা বলে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে দরজাটা খোলা যায় কি না তার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইস্পাতের পাত বসানো দরজাটা ভিতর থেকে খোলার কোনো উপায় নেই। সুদীপ্ত বলল, 'আমরা এখন তবে কী করব?'

হেরম্যান বললেন, 'চুপচাপ এখানে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। অন্ধকার হাতড়ে চলো সামনের দিকে এগোই। দেখা যাক বাইরে বেরোবার কোনো সন্ধান মেলে কি না। তবে সাবধানে এগোতে হবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'ওরা এই গুহাটাকে বলছিল 'জলদানবের গুহা'।—এমনও হতে পারে কোনো হিংস্র প্রাণী এ গুহাতে বাস করে।'

হেরম্যান বললেন, 'তা হতেই পারে। কিন্তু এখানে বসে থেকেই বা লাভ কী? মৃত্যু যদি আমাদের কপালে লেখা থাকে তবে সেই জলদানব এখানে এসেই আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে। যদি বাইরে যাবার কোনো উপায় মেলে।'

হেরম্যানের কথা শুনে উঠে দাঁড়াল সুদীপ্ত। তারপর তারা দুজনে অন্ধকার হাতড়ে ধীরে ধীরে এগোল সামনের দিকে। কিছুটা এগোতেই গুহার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারটা একটু যেন কেটে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে লাগল সামনেটা। যে গিরিশিরার ভিতর এই গুহাটা, তার মাথার ওপর লম্বাটে একটা ফাটল আছে তা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে গুহাতে। এবার আর পথ চলতে অসুবিধা হল না তাদের। হেরম্যান চাপাস্বরে বললেন, 'অন্য গুহার মতো এ গুহাটাও সম্ভবত এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রতটে বা সমুদ্রতে গিয়ে নেমেছে।' তবে গুহার মেঝে সমুদ্রতল থেকে উঁচু হওয়াতে এখানে জল প্রবেশ করছে না। সন্তর্পণে এগোতে থাকল তারা। বেড়ে চলল রাত। বাইরে কী হচ্ছে তা তাদের জানা নেই। হয়তো বা এতক্ষণে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। গুহাটা সোজা এগোলেও মাঝে মাঝে দু-পাশের দেওয়ালের গা থেকে ছোটো সুড়ঙ্গর মতো পথ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সুদীপ্তরা এগোতে লাগল মূল সুড়ঙ্গ ধরেই। কখনও কখনও সামান্য কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম তারপর আবার চলা। বেশ কয়েক ঘণ্টা চলার পর একটা সময় গুহাটা ক্রমশ চওড়া হতে লাগল। মাথার ওপরের ফাটলটাও এদিকটাতে বেশ বড়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। মৃদু

আঁশটে গন্ধও যেন নাকে আসতে লাগল। হেরম্যান বললেন, 'আমরা সম্ভবত সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পড়েছি।' পাথুরে মাটিতে এখানে ছোট ছোট গর্ত আছে। তার থেকে সাবধানে পা বাঁচিয়ে সামনে চলল তারা। কিন্তু আর কিছুটা এগিয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাদের। প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু একটা বড় পাথর তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখে সুদীপ্ত বলল, 'এবার এগোব কীভাবে?'

হেরম্যান বললেন, 'পাথরটা আর দেওয়ালের মাঝখানে একচিলতে ফাঁক দেখছি। চলো, কাছে গিয়ে দেখি। ওখান দিয়ে গলে ওপাশে যাওয়া যায় কি না?' আঁশটে গন্ধটা বড্ড বেশি লাগছে। সম্ভবত পাথরটার ওপাশেই সমুদ্র। সুদীপ্তরা পা বাড়াল সেদিকে। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই তাদের অবাক করে দিয়ে পাথরটা হঠাৎ নড়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে পাক খেয়ে থেমে গেল। সুদীপ্তদের সামনে সেই পাথরের গা থেকে ছাদের দিকে মাথা তুলল একজন! একটা মাথা! আরে পাথর কোথায়? সুদীপ্ত আর হেরম্যান যাকে পাথরখণ্ড ভেবেছিল সেটা আসলে প্রায় ছোটখাটো হাতির মতো বিশাল সিন্ধুঘোটক! এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। এখন সুদীপ্তদের উপস্থিতি টের পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে। তীব্র আঁশটে গন্ধটা প্রাণীটার দেহ থেকে বেরুচ্ছে। এই সেই দ্বীপবাসীদের— সমুদ্রদানব! চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার থ্যাবড়ানো মুখে। কুতকুতে চোখে সে তাকিয়ে আছে সুদীপ্তদের দিকে। মুখের ভিতর থেকে দুদিকে নেমে আসা দাঁত দুটো অন্তত পাঁচ- ফুট করে লম্বা হবে। তলোয়ারের মতো ধবধবে সাদা দাঁত। সামনের দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশাল প্রাণীটা। থলথলে শরীরটা কাঁপছে। তার দিকে তাকিয়ে যেন সম্মোহিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ্তরা। দানবটার কাঁটার মতো গোঁফগুলো দুপাশে খাড়া হচ্ছে। মাথাটা একবার সে নামাল। তার দাঁত দুটো পাথুরে মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ঠকঠক শব্দ তুলল। এটাই মনে হয় তার শত্রু বা শিকারকে আক্রমণ করার আগে তাল ঠোকা। ঠিক যেমন অনেক প্রাণী আক্রমণের আগে মাটিতে খুর বা শিং ঠোকে। কারণ এরপরই প্রাণীটা তার অতবড় শরীরটা নিয়ে অবিশ্বাস্য ভাবে একটা লাফ দিয়ে সুদীপ্তদের কাছে চলে এল। এবার হুঁশ ফিরল সুদীপ্তদের। পালাতে হবে তাদের। প্রাণীটা ওই ভয়ংকর দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে তাদেরকে। অথবা পিষে মারবে তার শরীরের নীচে। তাদের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ফুটে উঠেছে সমুদ্রদানবের চোখে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল সুদীপ্তরা। কিন্তু কিছুটা এগোবার পরই হেরম্যান হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর পা ঢুকে গেছে একটা গর্তের মধ্যে। সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল হেরম্যানকে। কিন্তু গর্তের খাঁজে পা এমন আটকেছে যে কিছুতেই বেরোচ্ছে না। ওদিকে সমুদ্র দানবও লাফ দিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। একসময় একদম কাছে চলে এল সে। আর একটা মাত্র লাফের ব্যবধান তার সুদীপ্তদের ঘাড়ে এসে পড়ার জন্য। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে হেরম্যান চিৎকার করে উঠলেন, 'সুদীপ্ত তুমি পালাও। নইলে তুমিও বাঁচবে না।'

সুদীপ্তও বলে উঠল, 'না, কিছুতেই না। মরলে দুজনে একসঙ্গেই মরব।'

হেরম্যান আবারও বলে উঠলেন, 'না, কথা শোনো। পালাও, পালাও....'

কিন্তু পালাবার পরিবর্তে সুদীপ্ত ঝুঁকে পড়ে জাপটে ধরল হেরম্যানকে। মরলে একইসঙ্গে তারা মরবে।

শেষ লাফটা দেবার আগে প্রাণীটা একটু ঝুঁকে পড়ে তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। আর সামান্য কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। সমুদ্র- দানব ঝাঁপিয়ে পড়বে! দানবীয় সিন্ধুঘোটক সুদীপ্তদের লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই সুদীপ্তর মাথার ওপর দিয়ে কী যেন

একটা উড়ে গেল। সুদীপ্তরা দেখল ঝাঁপ দেবার পরিবর্তে দানবটার থলথলে দেহটা কাঁপতে শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর টাল খেয়ে সিন্ধুঘোটকটা হেলে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। চাঁদের আলোতে তার গলা থেকে রক্তর স্রোত নামতে থাকল। আর এরপরই কে যেন বলে উঠল, 'ভয় পাবেন না। ও শেষ। ছ'ফুট লম্বা 'হাত হারপুন'-টা পুরোটা বিঁধিয়ে দিতে পেরেছি ওর শরীরে।'

সেই কণ্ঠস্বরের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্তরা দেখল তাদের পিছনে কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে তিমি-শিকারি হারপুনবাজ সেই মরগ্যান স্মিথ বা হারপুন স্মিথ। আর ক্যাথলিন।

সুদীপ্ত তাদের দেখে অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'তোমরা এখানে কীভাবে এলে?'

হারপুন স্মিথ বলল, 'আপনাদের খুঁজতে সকালবেলা আমাকে দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন হ্যামার। সুড়ঙ্গপথে ঘুরতে ঘুরতে একটা সুড়ঙ্গপথ ধরে আমি পুকুরে পড়লাম। এখানকার সুড়ঙ্গগুলো একটা অন্য একটার সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত। তারপর পুকুর থেকে পাড়ে উঠে একটা বাড়ির সামনে বাঁধা অবস্থায় মিস ক্যাথলিনকে মুক্ত করলাম। তারপর অন্য একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে আপনাদের খুঁজতে খুঁজতে এখানে এলাম। ভাগ্যিস ঠিক সময় পৌঁছেছি। নইলে ভয়ংকর ঘটনা ঘটত!'

সুদীপ্তরা বুঝতে পারল তারা তবে এই হারপুন স্মিথকেই জল থেকে উঠে আসতে দেখেছিল। হারপুন স্মিথ এগিয়ে গেল দানবটার কাছে। সত্যি লোকটা সাহসী বটে! দানবীয় সিন্ধুঘোটকটা তখন স্থির হয়ে গেছে। একটু চেষ্টা করে স্মিথ একটা হ্যাঁচকা টানে সমুদ্রদানবের বুক থেকে হারপুনটা বের করে আনল। রক্ত এবার ফোয়ারার মতো বেরোতে থাকল সদ্য মৃত প্রাণীটার শরীর থেকে। কাজটা করে সুদীপ্ত- হেরম্যানের কাছে ফিরে এল সে। হেরম্যান এবার ধীরে ধীরে চেষ্টা করলেন তাঁর পা-টা বের করার। তাঁকে সাহায্য করল সুদীপ্ত আর হারপুন স্মিথ। অবশেষে একসময় গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল হেরম্যানের পা। উঠে দাঁড়ালেন হেরম্যান।

একটু ধাতস্থ হবার পর তিনি স্মিথ আর ক্যাথলিনের কাছে জানতে চাইলেন, 'এখান থেকে বাইরে বেরোবার রাস্তা তোমরা জানো? বাইরের খবর কি?'

ক্যাথলিন বলল, 'হ্যাঁ, কিছুটা এগোলেই সমুদ্রতট। আমরা উঁকি দিয়ে দেখেছি। বাইরে কিছুক্ষণ আগে অব্দি গোলাগুলি চলছিল।'

সুদীপ্ত বলল, 'তবে আমরা সে দিকে এগোই?'

স্মিথ বলল, 'ভোরের আলো ফুটলে আমরা পরিস্থিতি বুঝে বাইরে বেরোব। কিন্তু তার আগে মিস ক্যাথলিনের সঙ্গে আমাদের একটা সুড়ঙ্গে যেতে হবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'কেন?'

সুদীপ্ত আর হেরম্যানকে অবাক করে দিয়ে ক্যাথলিন বলল, 'একটা সিন্দুক বয়ে নিয়ে যেতে হবে সেখান থেকে। রাশি রাশি সোনার মোহর আছে তাতে। জলদস্যুদের গুপ্তধন। আপনারাও তার ভাগ পাবেন। ওই সম্পদের জন্যই দ্বীপবাসীরা বংশানুক্রমিক ভাবে এ দ্বীপে রয়ে গেছে।'

কথাটা শুনে সুদীপ্তরা বিস্মিত হলেও হেরম্যান একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'গুপ্তধনের লোভ আমাদের নেই। বরং মৎস্যকন্যার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের অনেক বেশি আগ্রহ। আমরা তাকে দূর থেকে দেখেছি। তার কোনো খবর জানো?'

ক্যাথলিন বলল, ‘সম্ভবত তার সাক্ষাৎ আমরা পাব। সেই তো আমাকে গুপ্তধনের খোঁজ দিল। সোনা বোঝাই বাক্সটা একা ঠেলে বার করতে পারছিলাম না। গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আপনাদের খোঁজ করতে যাচ্ছি, এমন সময় দ্বীপবাসীদের হাতে বন্দি হলাম। তারা অবশ্য জানে না যে আমি তাদের সিন্দুকের সন্ধান পেয়েছি। পরে সব কথা হবে। এখন চলুন।’

বিস্মিত সুদীপ্তরা আর কথা না বাড়িয়ে অনুসরণ করল ক্যাথলিনকে। দেওয়ালের গায়ের একটা ফাটলের সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে অন্য একটা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল তারা। এখানেও ছাদের দিকে অনেক ছিদ্র আছে। আবছা আলো ঢুকছে এখানেও। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলার পর তারা পৌঁছে গেল প্রাকৃতিক ঘরের মতো জায়গাতে। সেখানে রয়েছে বেশ লম্বাটে ধরনের অতি প্রাচীন একটা সিন্দুক। হেরম্যান, ক্যাথলিনকে বললেন, ‘তুমি সিন্দুকটা খুলে দেখেছ?’

ক্যাথলিন হেসে প্রথমে জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, দেখেছি।’ তারপর ঘরের উল্টোদিকের একটা সুড়ঙ্গ দেখিয়ে বলল, ‘ওটা দিয়ে একটু এগোলেই বাইরে বেরোবার রাস্তা।’

স্মিথ উৎসাহিত হয়ে বলল, ‘চলুন তবে সিন্দুকটা ধরাধরি করে বেরোবার মুখে নিয়ে যাই। দিনের আলো ফুটলে পরিস্থিতি বুঝে বাইরে যাব।’

সেই মতোই কাজ হল। সিন্দুকটা গুহামুখে টেনে নিয়ে গিয়ে আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সবাই।

একসময় ভোরের আলো ফুটে উঠল। বাইরে কোলাহলের শব্দ শোনা গেল। জাহাজের লোকজনের গলার শব্দ। তা শুনে সুদীপ্তরা বাইরে বেরিয়ে আসতেই ক্যাপ্টেন হ্যামার দলবল সমেত ছুটে এলেন তাদের কাছে।

।।১০।।

হেরম্যান সংক্ষেপে তাঁদের কথা ব্যক্ত করে জানতে চাইলেন, ‘দ্বীপবাসীদের কি হল? কাল রাতে লড়াই হয়েছিল?’

ক্যাপ্টেন বললেন, ‘হ্যাঁ, ওদিকে পুরোনো জাহাজটার কাছে ওরা আক্রমণ করতে এসেছিল আমাদের। দু-চারটে গুলির ঘায়ে আহত হতেই সবাই পালাল। সর্দারটাকে আমি প্রায় ধরে ফেলেছিলাম। কিন্তু অন্ধকারে হাত ফসকে পালাল।’

একথা বলার পর ক্যাপ্টেন একটু উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, ‘কেন যে আপনারা মৎস্যকন্যার খোঁজে এলেন! আপনাদের জন্য আমি ঝামেলায় জড়ালাম। তিমি শিকার বন্ধ আছে। এবার তাড়াতাড়ি জাহাজে চলুন। শিকারের কাজ শুরু করব।’

ক্যাথলিন বলল, ‘হ্যাঁ, চলুন। তবে গুহাতে একটা পুরোনো সিন্দুক আছে। সেটা জাহাজে নিয়ে যেতে হবে।’

‘সিন্দুক! কি আছে তাতে?’ জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

ক্যাথলিন হেসে জবাব দিল, ‘জাহাজে চলুন। তারপর অনেক কিছু জানতে পারবেন।’

ক্যাপ্টেন হ্যামার আর কিছু জানতে চাইলেন না। সিন্দুকটা বার করে সমুদ্রতট দিয়ে এগিয়ে জলে নেমে সেটা নৌকায় তোলা হল। সেটাতে চড়ে বসল ক্যাথলিন, সুদীপ্ত আর হেরম্যান। অন্য নৌকাগুলোতে ক্যাপ্টেন আর তাঁর সঙ্গীরা। পেঙ্গুইনের দল একসঙ্গে

ডেকে উঠল। সার বেঁধে ভাসমান বরফের ফাঁক বেয়ে নৌকাগুলো এগোল জাহাজের দিকে। চারপাশে জলের দিকে তাকাচ্ছে ক্যাথলিন। সে যেন কিছু দেখার চেষ্টা করছে। হেরম্যান দাঁড় টানতে টানতে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মৎস্যকন্যার দেখা মিলবে কখন?'

ক্যাথলিন জবাব দিল, 'সে যখন নৌকায় উঠে এল না, এখন হয়তো নির্দিষ্ট জায়গাতে আত্মগোপন করে আছে।'

'সেটা কোথায়?' প্রশ্ন করল সুদীপ্ত। কিন্তু ক্যাথলিন জবাব দিল না।

নৌকাগুলো জাহাজের গায়ে এসে ভিড়ল। সবাই উঠে পড়ল জাহাজে। সিন্দুকটাও ডেকে তোলা হল। ক্যাথলিন, ক্যাপ্টেন হ্যামারকে বলল, 'সিন্দুকটা যেন কেউ না খোলে। আপনি আমাদের সঙ্গে নীচে চলুন।'

ক্যাপ্টেন তার কথা শুনে বললেন, 'আমি কিন্তু অনুমান করতে পারছি সিন্দুকে কি আছে।' হয়তো বা তাঁকে ব্যাপারটা বলে দিয়ে থাকতে পারে হারপুন স্মিথ। যাই হোক এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন শিকারের কাজ শুরু করার জন্য। তারপর একজন নাবিককে সিন্দুক পাহারার দায়িত্ব দিয়ে সুদীপ্তদের সঙ্গে খোলে নামার জন্য এগিয়ে এলেন।

সবাইকে নিয়ে নিজের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাথলিন। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে ভিতর থেকে সেটা বন্ধ দেখে হাসি ফুটে উঠল ক্যাথলিনের মুখে। সে এবার বলল, 'মিস মার্গারেট। দরজা খুলুন। কোনো ভয় নেই। আমি এসেছি। দরজা খুলুন।'

কয়েক মুহূর্তর মধ্যে দরজা খুলে গেল। দরজা খুললেন অপরূপ সুন্দরী এক প্রৌঢ়া। একরাশ দীর্ঘ সোনালি চুল তাঁর। নীল চোখ, গায়ের রং দুধের মতো। বুক থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত পোশাক তাঁর পরনে। দরজা খুলে পা ঘষে ঘষে বিছানাতে গিয়ে বসলেন তিনি। সুদীপ্তরা কেবিনে প্রবেশ করল। অবাক দৃষ্টিতে তারা চেয়ে রইল ভদ্রমহিলার দিকে। ক্যাথলিন হেসে তাঁর উদ্দেশে বলল, 'আপনি এবার আপনার কথা বলুন এদেরকে।'

ভদ্রমহিলা মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমি মার্গারেট হক। ইতালীয় সমুদ্রবিজ্ঞানী। কুড়ি বছর আগে আমি এমনই এক তিমি-শিকারি জাহাজে এসেছিলাম এ জায়গার বরফ সমুদ্র দেখার জন্য। আমাকে ওই জাহাজ দ্বীপে ফেলে রেখে পালায়। দ্বীপবাসীরা আমাকে ধরে মৎস্যকন্যা বানিয়ে দিল। হাতের আঙুলগুলো আর হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অপারেশন করে জুড়ে দিল। আমাকে পরিয়ে দিল মাটিতে পড়ে থাকা কোমর থেকে পা পর্যন্ত নকল লেজসহ খোলসটা। এটা ওদের প্রাচীন নিষ্ঠুর প্রথা। আমি রয়ে গেলাম এখানে। যে জাহাজের কাছেই আমি আমার কথা বলতে এসেছি, সে জাহাজের নাবিকরাই আমার কথা না শুনে, আমাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছে বা মারতে উদ্যত হয়েছে। কাজেই এখানে রয়ে যেতে হয়েছে আমাকে।' কথা থামালেন মার্গারেট।

ক্যাথলিন এরপর বলল, 'দু-দিন আগে রাতের বেলাতে উনি একই কারণে জাহাজের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু ডেকের পাহারাদার ওনাকে দেখে ছুরি ছুড়ে মারল। ঘটনাচক্রে উনি প্রাণ বাঁচাতে ওই খোলা পোর্ট হোল দিয়ে আমার এই কেবিনে ঢুকে পড়লেন। আমিও প্রথমে ওনাকে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেছিলাম। তারপর সারারাত ধরে ওর কাহিনি শুনলাম। গুপ্তধনের কথাও শুনলাম। আমি ভাবলাম আগে সিন্দুকটা উদ্ধার করে

আনি তারপর ব্যাপারটা আপনাদের জানাব, ওনাকে জনসমক্ষে আনব। তাই ওকে এ ঘরের সিন্দুকটাতে ভরে আপনাদের সাহায্যে দ্বীপে নিয়ে গেলাম। আর তারপরের ঘটনা তো আপনাদের জানা। দূর থেকে দ্বীপবাসীদের আসতে দেখে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে ছিলেন উনি। আমি ধরা পড়ে গেলাম।'

মার্গারেট বললেন, 'গত রাতে যখন লড়াই চলছিল তখন সাঁতরে এসে ওই পোর্টহোল দিয়েই এ কেবিনে ঢুকে আসি। ক্যাথলিন পোর্টহোলটা খুলে রেখে গেছিল আমার জন্য।

হেরম্যান এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোনা থেকে কুড়িয়ে নিলেন মৎস্যকন্যার খোলসটা। সিল মাছের চামড়ার ওপর মাছের চকচকে আঁশ বসিয়ে জিনিসটা বানানো। সুদীপ্ত আর হেরম্যান জিনিসটা নেড়েচেড়ে আবার রেখে দিল।

ক্যাথলিন এরপর বলল, 'এবার সবাই ওপরে চলুন। তবে মিস মার্গারেটকে সাহায্য করতে হবে। পায়ের পাতা জোড়া হওয়ায় উনি হাঁটতে পারেন না।'

হেরম্যান, মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশা করি অপারেশনের মাধ্যমে আপনি হাত-পায়ের আগের অবস্থা ফিরে পাবেন।' তার কথা শুনে মার্গারেট হাসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্গারেটকে নিয়ে ওপরে উঠে এল সবাই।

তিমি শিকারের প্রস্তুতি তখন শুরু হয়ে গেছে। নাবিকরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সিন্দুকটাকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। সিন্দুক পাহারাদার লোকটা নিজের কাজে চলে যাবার পর ক্যাথলিন, মার্গারেটকে বলল, 'নিন, ডালাটা খুলুন। এ সিন্দুক তো আসলে এখন আপনারই।'

মার্গারেট বললেন শুধু আমার নয় তোমারও। তুমিই বরং ডালাটা খোলো।

ক্যাথলিন হেসে ডালাটা খুলে দিল। উপচে পড়া প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রাগুলো ঝলসে উঠল সূর্যের আলোতে। বেশ কয়েক মুহূর্ত সেই স্বর্ণমুদ্রার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল সুদীপ্ত-হেরম্যান আর ক্যাপ্টেন। এ যে সাত রাজার ধন! প্রাচীন জলদস্যুদের গুপ্তধন!

ক্যাথলিন এরপর বলল, 'বাক্সটা এবার বন্ধ করি। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। খোলে নামাতে হবে সিন্দুকটা।'

এ কথা বলে ঝুঁকে পড়ে সে সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা অকল্পনীয় ঘটনা ঘটল। হঠাৎ সিন্দুকের মোহরগুলো চারপাশে ছিটকে উঠল, আর মোহরের নিচে সিন্দুকের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়াল দ্বীপবাসীদের দলপতি সেই ক্যাপ্টেন শার্ক! সিন্দুক থেকে লাফিয়ে নেমে মার্গারেটকে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড ঘৃণা, আক্রোশে সে চেপে ধরল মার্গারেটের গলা! শার্কের হাত থেকে মার্গারেটকে মুক্ত করার জন্য শার্কের মুখে ঘুসি চালিয়ে দিল সুদীপ্ত। মাটিতে ছিটকে পড়ল লোকটা। ক্যাপ্টেন হ্যামার এগোলেন শার্কের দিকে তাকে কব্জা করার জন্য। এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয় বুঝে শার্ক স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে ডেকের কোনাকুনিভাবে ছুটল রেলিং টপকে জলে ঝাঁপ দেবার জন্য। ঠিক সেদিকেই যেখানে মাটিতে হারপুনের দড়ি পড়ে আছে। তবে সে রেলিং পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই হারপুন চালক একটা তিমিকে লক্ষ্য করে হারপুন চালিয়ে দিল। নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল সে। পিছনে কি ঘটছে তা সে খেয়াল করেনি। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলা দড়িতে শার্কের পা জড়িয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে উল্কার গতিতে সে ডেক ছেড়ে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল জাহাজের থেকে কিছুটা তফাতে পাথুরে বরফের ওপর। তারপর শার্কের দেহটা ডুবে গেল বরফ জলের গভীরে। সুদীপ্তরা

বুঝতে পারল সে আর উঠবে না। সুদীপ্তরা কেউই শার্কের মৃত্যু চায়নি। কিন্তু ভাগ্যর পরিহাসে নিজের কৃতকর্মের সাজা পেল দ্বীপবাসীদের দলপতি।

এ ঘটনার ফলে কিছুক্ষণের জন্য মৃদু গোলোযোগ সৃষ্টি হল ডেকে। মোহরগুলো আর মার্গারেটকে দেখে বেশ বিস্মিত নাবিকরা। ক্যাপ্টেন কড়া ধমকে তাদের কাজে পাঠালেন। তারা আবার প্রস্তুত হল তিমি শিকারের জন্য। মোহরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সিন্দুকে রেখে ডালা বন্ধ করা হয়। সুদীপ্তরা এরপর সিন্দুকটা ওঠাতে যাচ্ছিল নীচে ক্যাথলিনের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য। ক্যাপ্টেনও আপাতত তার নিজের কাজে ফিরতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় মার্গারেট হঠাৎ ক্যাপ্টেনকে বললেন, ‘এই সিন্দুকের মোহরের তিনভাগের একভাগ আমি আপনাকে দিতে পারি যদি আপনি আমার একটা শর্ত মানেন। এই পরিমাণ সম্পদ কিন্তু আপনি সারা জীবন রোজগার করতে পারতেন না।’

কথাটা শুনে ক্যাপ্টেন হ্যামার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘দেবেন? কী শর্ত?’

মার্গারেট বললেন, ‘আপনাকে কথা দিতে হবে তিমি শিকার আপনি ছেড়ে দেবেন। অনেকদিন একসঙ্গে আমি কয়েক মুহূর্ত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকে হ্যামার বললেন, ‘কাজটা আমি করতাম পেটের দায়ে। এ কাজ আর করব না।’

মার্গারেটকে এ কথা বলে তিনি নাবিকদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলেন, ‘হারপুন থামাও। আমরা ফিরে যাব।’ কথাটা শোনামাত্রই ক্যাথলিন আনন্দে জড়িয়ে ধরল মার্গারেটকে। মার্গারেট এরপর সুদীপ্ত আর হেরম্যানের দিকে তাকিয়ে তাদের গুপ্তধনের অংশ দেবার ব্যাপারে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা অনুমান করে তার আগেই হেরম্যান বললেন, ‘আমরা গুপ্তধন নেব না। তবে আপনার মৎস্যকন্যার পোশাকটা স্মৃতি হিসাবে সঙ্গে নিতে চাই।’

মার্গারেট হেসে বললেন, ‘আচ্ছা ওটা আপনারাই নেবেন।’

মুখ ফিরিয়ে বরফ জল কেটে শেষবারের মতো ফেরার পথ ধরল তিমি শিকারি জাহাজ।

—